সূচিপত্র
সমাজ সংস্কারক মুজাহিদে আযম
হযরত মাওলানা
শামছুল হক ফরিদপুরী [রহ.]-এর
জীবনী
মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

মুজাহিদে আযম সমাজ সংস্কারক

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী

(ছদর সাহেব রহ.)- এর জীবনী

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক (রহ.)
সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামায়াত

আল-আশরাফ প্রকাশনী
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৭৩৪২৭, ০১৭১১-৩৭৮৫৩৩

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

সূচিপত্র

মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর জীবনী আলোচনার প্রারম্ভেই দু'টি চার্টকে সম্মানিত পাঠক খেদমতে উপস্থাপন করতে চাই- (১) একটি মুজাহিদে আযমের পূর্ব পুরুষদের জামানার তথা মুসলিম বিশ্ব ও পাক-ভারতের সোনালী যুগের গৌরবময় ইতিকথা, (২) পাক-ভারতে ইংরেজ আগমনের পরবর্তী মুসলিম বিশ্ব ও পাক-ভারতের কালো অধ্যায়ের ইতিকথা। যার জের অদ্যবধি চলছে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অলি-গলিতে। অতি সংক্ষিপ্ত এ দু'টো বিবরণ স্মরণ রেখেই বর্তমান বিশ্বের পোড়া কপালে মুসলমানদের সামনের পথে অগ্রসর হতে হবে।

(ক) ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর স্বর্ণ যুগের শত কোটি ভাগের একভাগের সিন্ধু থেকে বিন্দুর মত মাত্র কয়েকটি ছিটেফোটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।

১। আফ্রিকার উত্তর পূর্বের শেষ প্রান্ত মরক্কো থেকে দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এবং উত্তরে ফ্রান্সের পিরেনিজ পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে ভারতের কলিকট ও দেবল বন্দর পর্যন্ত পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগে অর্ধ-চন্দ্রখচিত বিজয়ী মুসলিম নিশান পত্ পত্ করে উড়ছিল।

২। ভারত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর, জাপান মহাসাগর, ভূ-মধ্য সাগর, আরব সাগরে মুসলিম ব্যবসায়ী ও অভিযান কারীদের নৌযানগুলো সগর্ভে চলাচল করতো। দুনিয়ার কোন শক্তির বিশেষ করে পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় শক্তি বা ক্ষয়িষ্ণু রোমান শক্তি কারও ঐ সমস্ত সমুদ্রে একখানা ভাংগা তক্তাও ভাসানোর হিম্মত বা উদ্যোগ ছিল না।

(৩) অধিকাংশ স্থানে ইসলামের ন্যায় ও সাম্যের শাষণ প্রচলিত ছিল।

(৪) সমস্ত জনগন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে সুখে-শান্তিতে কালযাপন করছিল।

(৫) সর্বত্রই মুসলিম শাষকদের শাসন কায়েম থাকার কারণে অন্যান্য সমস্ত জাতি নিচয় এটাকে বিধাতার চরম পরম আশির্বাদ বলে মনে করতো। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগন মুসলমানদেরকে পিতৃতূল্য জ্ঞান করতো এবং তাদের রাজত্ব ও হায়াতের দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য প্রার্থনা ও কামণা করতো।

(৬)সম্পদ ও প্রাচুর্য্যের প্লাবন জারি ছিল, অভাব বলে কোন জিনিস আছে তা তাদের জানা ছিল না।

(৭) অন্যায় কাজের কোন বিচার হবে না। একথা কেউ বিশ্বাস করতো না। সবাই ন্যায় বিচার ও পরিপূর্ণ ইনছাফের ষোল আনা আশাবাদী ছিল। এজন্যই ভারত সম্রাট মুহাম্মদ বিন তোঘলোক সামান্য একজন হিন্দুর অভিযোগে কাজির চাবুকের আঘাতে মাথার মুকুট মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে। আর বাদশা তা নিজ হাতে কুড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে আদালত প্রাঙ্গন ত্যাগ করেছেন।

(৮) বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধিকারী ছিল। শাসক শাসিতকে সমান পাল্লায় মাপা হতো। কোন প্রকার ব্যবধান কোথাও খুজে পাওয়া যেতনা।

(৯) ধর্মের ব্যাপারে সবাই স্বাধীন ছিল। একই বাড়ীর দুইটি পরিবার দুই ধর্ম পালন করে একই মায়ের পেটের সন্তানের মত সুখে দুঃখে ভাইয়ের মত চলত।

(১০) জোর করে বা কৌশল করে ধর্ম প্রচার করা হতো না। কেউ স্বেচ্ছায় ইসলামের গুণে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হলে তাকে ভাইয়ের মর্যাদার উর্ধ্বে স্থান দান করা হতো।

(১১) মাতৃজাতির মর্যাদার স্থান সর্বোচ্চ রাখা হতো।

(১২) জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মহিলাগণ পরিপূর্ণ পর্দা পালন করতো, পুরুষেরা পর্দাকে মর্যাদার চোখে দেখত।

(১৩) চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি কোথাও খুজে পাওয়া যেত না।

(১৪) অশ্লীলতা ও বেহায়েমীকে সর্বস্তরের লোকে ঘৃণার চোখে দেখতো।

(১৫) আমানতদারী দেয়ানতদারী সর্বত্র বিরাজমান ছিল।

(১৬) অপরের মালের লালচ তো দূরের কথা পতিত বা প্রথিত মালের মালিকানা গ্রহণ করতে কেউ রাজি ছিল না। সবাই ঐ মালিকানাকে ঘৃণার চোখে দেখে দূরে সরে থাকত। প্রয়োজনে কাজির দরবারে হাজির হয়ে মামলা করে মালের মালিকানা অন্যকে দেওয়ার চেষ্টা করতো।

(১৮) নৈতিকতা, শালীনতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব প্রবল ছিল। একবার ঈমাম হাসান বসরী হাঁচি দিলে তার ভক্তগণ ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে তার উত্তর বাগদাদের লক্ষ লক্ষ লোকে ইয়াহদিকুমুল্লাহ বললে ভীষণ শোরগোল সৃষ্টি হলে বাদশাহ হারুনুর রশীদ শত্রুর হামলা মনে করে ভীত হয়ে পড়ে। তাহ্কীক করা হলে হাসান বসরীর হাঁচির সন্ধান পাওয়া যায়। বাদশার বেগম জোবায়দা হারুনকে ঠাট্টা করে বললো, তুমি কিরূপ বাদশাহ, প্রজার হাঁচির ভয়ে কম্পিত হও।' তখনকার আদর্শবান আধ্যাত্মিক শক্তির লোকের এতই প্রভাব ছিল।

(১৯) শিক্ষার সর্বত্র প্রচলন ছিল। সরকারী ব্যয়ে সমস্ত ধর্মের ও জাগতিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহণ করা হতো। দেশের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি শিক্ষার জন্য ওয়াকফ্ ছিল। দেবল শহরে দুই শত ইউনির্ভাসিটি ছিল। এক দিল্লীতে দশ হাজার আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। বাংলায় ছিল আশি হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২০। জ্ঞান চর্চার সম্মান উর্ধ্বে ছিল, দিল্লী, বাগদাদ, বোখারা, সমরখন্দ, গ্রানাডা, কর্দভার মান মন্দির ছিল।

(২১) ভূগোল খগোল, জ্যোতিষবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, ধাতব বিদ্যা, স্থাপত্য বিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা সর্ববিদ্যার গবেষণা সর্বত্র সরকারের উৎসাহে পরিচালিত হতো।

(২১) চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। ক্রুসেডের যুদ্ধে রাজা রিচার্ডসনের অসুস্থতায় শত্রুপক্ষ সুলতান ছালাহ উদ্দিন আইয়ূবী ছদ্মবেশে শত্রুর চিকিৎসা করে সুস্থ্য করেছিল।

(২২) জ্ঞান-বিজ্ঞান, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ঘড়ি তৈরীর বিজ্ঞান ইত্যাদি আবিষ্কার হয়েছিল।

(২৩) জ্ঞানের মশাল জ্বেলে মূর্খ ইউরোপিয়াদের জাগরণ সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিশ্ব মুসলিম উস্তাদের আসনে বসে বিশ্বের মূর্খ জাতিদের ভিতর জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছিল।

(২৪) বিশ্ব বিখ্যাত লাইব্রেরী কায়েম করে দুনিয়ার জ্ঞান সমৃদ্ধ পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছিল। মোঘল বাদশাহ হুমায়ন লাইব্রেরীর সিড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করে।

(২৫) বিভিন্ন জাতির জ্ঞানী গুণীদের রাষ্ট্রের বড় বড় পদ দেওয়া হতো। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ এবং আওরঙ্গজেবের প্রাধান্য খাজাঞ্জী হিন্দু ছিল।

(২৬) টৌডর মল্ল আকবরের অর্থমন্ত্রী ছিল। সর্বস্তরের গুণী লোকদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিয়োগ করা হত।

(২৭) মিল কারখানা করে মুসলিমরা বিশ্ব বিখ্যাত ছিল, জাহাজ নির্মাণ, কাপড় তৈরী, অস্ত্র তৈরী সবার মধ্যে জারী ছিল।

(২৮) দিল্লীর মুসলিম ১২ হাত শাড়ী একটি গুপারীর খোসায় স্বচ্ছন্দে রাখা যেত। আজ বিজ্ঞানের যুগে তা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

(২৯) বিদেশ থেকে একটি মাল জিনিসও আমদানী করা হতো না। মুসলিমগণ বিশ্বের সমস্ত জিনিস রপ্তানি করতো।

(৩০) শিক্ষা, কারিগরী বিদ্যা, ভদ্রতা, নম্রতা উদারতা সত্যবাদিতা বিশ্বের সর্বত্র রপ্তানি করা হতো ওয়াফদের মাধ্যমে।

(৩১) পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় বাদশাহী যুগেও সমস্ত দেশে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ লাভ করেছিল।

(৩২) সমস্ত জনগণ শাসন কার্যে সমানভাবে শরীক ছিল।

(৩৩) জীবন যাপনের মান উন্নত ছিল। সারাদেশে অভুক্ত লোক, অভাবী লোক খুজে পাওয়া যেত না।

(৩৪) দিল্লীর বাদশাহ নাসিরুদ্দীনের খাদ্য পাকানোর খাদেম ছিল না। নিজ হাতে পাক করে খেয়েছেন।

(৩৫) বাদশাহ আলমগীর, নাছির উদ্দিন, কুতুবদ্দীন, কুরআন শরীফ লিখে তার আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।

(৩৬) সরকারী কোষাগার জনগনের জন্য রিজার্ভ ছিল।

(৩৭) মাল-আসবাব খাদ্য-দ্রব্যের নামমাত্র মূল্য ছিল।

(৩৮) টাকায় ৮ মন বিশ মন পর্যন্ত চাউল গম মিলতো। একটি পাঁচ সের দুধের গাভী আট আনা পঞ্চাশ পয়সায় পাওয়া যেত। ঘি বিশ সের এক টাকায় পাওয়া যেত। সমস্থ খাদ্য-দ্রব্য নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হতো। দূর্ভিক্ষ ছিল না।

(৩৯) মিথ্যা, ধোকা, ফাকি, চুরি, রাহাজানি, ভেজাল, চালাকিকে সমস্ত লোকে জঘন্যতম পাপ মনে করতো। সারাদেশে একটা মিথ্যাবাদী খুজে পাওয়া যেতনা।

(৪০) মানবতার চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল, মানব প্রেম, জীব প্রেমে সমাজে সর্বদা শান্তি বিরাজ করছিল। এই অবস্থা ছিল মুজাহিদে আযমের পূর্ব পুরুষদের সোনালী জামানার অবস্থা। বিস্তারিত লেখা লক্ষ পৃষ্ঠায়ও শেষ হবে না। তাই ৪০ নম্বরে ক্ষান্ত হলাম।

অপরদিকে ইংরেজ আগমণের একশত বছরের মধ্যে শুধু পাক-ভারত বাংলাদেশ-বার্মা নয়, সমস্ত মুসলিম বিশ্বে যে অমানিশার কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন অভিশাপ নিপতিত হয় তার কিছু লক্ষ ভাগের একভাগের সামান্য দুর্গন্ধের কিছু ইঙ্গিত নিম্নে প্রদত্ত হলো। যা মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরীর ধরাধামে আগমণের পূর্ব মুহূর্তে বিরাজমান ছিল।

(১) ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আচরণে এদেশবাসী সর্বপ্রথম মিথ্যা কথা বলতে শিখল।

(২) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত লোকগুলো ছিলো চোর, ডাকাত ও লুচ্চা-বদমায়েশ ও বাটপার ফাকীবাজদের দ্বারা গঠিত।

(৩) ইংল্যান্ড সরকার কোম্পানীতে কিছু সৎ লোকের প্রস্তাব করলে কোম্পানী সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকী দেয়।

(৪)১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পরে আস্তে আস্তে সমস্ত ভারত থেকে মুসলিম শাসন উৎখাত হয়ে সারা ভারত পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে যায়।

(৫) সমস্ত দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়া হয়।

(৬) শিক্ষা পরিচালনার সমস্ত সম্পত্তি আয়েম্মা, লাক্ষেরাজ, চেরাগী মসজিদ মাদ্রাসার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

(৭) রাষ্ট্র ভাষা পরিবর্তন করে অফিস-আদালত থেকে মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করা হয়।

(৮) সমস্ত জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে হিন্দু বেনিয়া ও বাটপার, চোর, ধোকাবাজ, মিথ্যাবাদী, মীরজাফর, রায়দুর্লভ উঁমি চাদ, জগৎশেটদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়।

(৯) রাজ্যহারা, জমিদারীহারা, শিক্ষাহারা করে মুসলমানদের রাস্তার ভিক্ষুকে পরিণত করা হয়।

(১০) চোর, মিথ্যাবাদী, ডাকাত, বদমায়েশদের চাকুরী জমিদারী দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।

(১১) মা-বোন মাতৃজাতির পর্দাকে হরণ করে উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় নামতে বাধ্য করে।

(১২) বেশ্যা প্রথা চালু করে যুব সমাজের চরিত্র হনন করা হয়।

(১৩) গুন্ডা সৃষ্টি করে সম্ভ্রান্ত লোকদের ইজ্জত-সম্মান হরণ করা ও জ্ঞানী গুনীদেরকে হত্যা করা হয়।

(১৪) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আশি হাজার শিক্ষিত নেতা, আলেম ও রাজ-পুরুষদের হত্যা করা হয়। ৪৫ হাজার আলেমকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হয়।

(১৫) হাজার হাজার আলেম মোহাদ্দেছকে গরুর চামড়া ও শুকরের চামড়ায় ভর্তি করে মারা হয়।

(১৬) লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়।

(১৭) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সীমান্ত ও পাঞ্জাব থেকে বাংলা পর্যন্ত গ্রান্ড ট্রাংক রোড ও অন্যান্য রোডে হাজার হাজার আলেমে দ্বীন হক্কানী পীর মাশায়েখ, মুফতী, মোহাদ্দেছ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ফাসীতে ঝুলিয়ে দিনের পর দিন টানিয়ে রাখা হয়।

(১৭) লক্ষ লক্ষ মণ সোনা-রূপা, ধন ভাণ্ডার গোপনে লুট করে ইংল্যান্ডে পাচার করা হয়।

(১৮) বাড়ী-ঘর জায়গা জমি থেকে উৎখাত করে সেখানে নীলের চাষের ব্যবস্থা করা হয়।

(১৯) বড় বড় হাদীছ বিশারদ উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দকে জেলখানায় প্রেরণ করা হয়।

(২০) হাজার হাজার বিপ্লবী মহামানবকে কালা পানির দ্বীপান্তর মাল্টা সাইপ্রাস আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাবৎ জীবন কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

(২১) সুদক্ষ কারিগর মুসলিম কাপড়ের প্রস্তুতকারী মহান ব্যক্তিবর্গের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং ডান হাত কেটে দেওয়া হয়।

(২২) ধর্মের নামে ধোকা দেয়ার জন্য নকল মাদ্রাসা গড়ে সেখানের প্রিন্সিপ্যাল ইংরেজকে বসান হয়। আমাদের উলামারা কৌশলে সেখানে ঢুকে সেখানে দ্বীনের চর্চার ব্যবস্থা করার চেষ্টা চালায়।

(২৩) সমস্ত শিল্প কারখানা বন্ধ করে বিলেতী মাল অধিক মূল্যে পচামাল আমদানী করার ব্যবস্থা করে।

(২৪) হিন্দুদের কিছু সুযোগ দিয়ে হিন্দুদের লেলিয়ে দিয়ে হিন্দু মুসমানের গোলমাল সৃষ্টি করে দেয়।

(২৫) দলাদলি ফেরকাবন্দী সৃষ্টি করে ডিভাইড এন্ড রুল নীতি জারি করে।

(২৬) মুসলমানদের চিরতরে সমূলে ধ্বংস করার জন্য শিয়া সুন্নী, ওহাবী, বেদাতী, কেয়াম লা-কেয়ামের মাসয়ালা বাহির করে, টাকা দিয়ে লোক তৈরী করে মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে উৎখ্যাত করার ষড়যন্ত্র কায়েম করা হয়।

(২৭) হাদীছ অস্বীকারকারী, ভন্ড মিথ্যা নবী টাকা দিয়ে কিনে মুসলমানদের ধর্মকে বিনষ্ট করার পরিকল্পনা করে।

(২৮) ওলামা, ছোলাহা, কাজি জাষ্টিসদের পোষাক দারোয়ান, আরদালী, চৌকিদার, দফাদার ও খানসামা বাবুর্চিদের পরিয়ে দিয়ে ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করা হয়।

(২৯) অর্থনীতিকে ধ্বংস করে, কৃষি কাজকে বন্ধ করে নীলের চাষের ব্যবস্থা করা হয়।

(৩০) মিথ্যা-জালিয়াতি, বাটপারীর উৎসাহ দান করে জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করা হয়। এভাবে ছলে বলে কলে কৌশলে সমস্ত ভারতকে কব্জা করে মুসলিম বিশ্বের দিকে কালো হাত প্রসারিত করতে শুরু করে।

(৩১) আফগানিস্তান ও তুরস্কের কিছু অংশ বাদে সমস্ত মুসলিম বিশ্ব একে একে দখল করে দুষ্টু লোককে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে।

(৩২) ইরাক, ইরান, আরব, মিশর, জর্দান, লেবানন, আলজেরিয়া, টিউনিস, মরক্কো সহ সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলিম রাজ্যসমূহ দখল করে নেয়। ইউরোপের স্পেন, পর্তুগাল, বসনিয়া হারজেগোভিনিয়া দখল করে নেয়।

(৩৩) রাশিয়া এদের সাথে মিলে মধ্য এশিয়ার কাজাখিস্তান, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, তাশখন্দ, বোখারা, সমরকন্দ দখল করে নাস্তিক্যবাদ জারী করে।

(৩৪) ভারতের মত আরব আফ্রিকার রাজ্যসমূহ মধ্য এশিয়ার রাজ্যসমূহে ইসলামী শিক্ষাকে আইন করে, কৌশল করে বন্ধ করে দিয়ে মুসলমানদের কমর ভেঙ্গে দেয়।

(৩৪) ফিলিস্তিনী মুসলমানদের উৎখাত করে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া সব অপশক্তি বিচ্ছিন্ন ইয়াহুদীদের একত্রিত করে আরব বিশ্বকে পঙ্গু করার জন্য তাদের মাথার উপর ইসরাইল রাজ্যের সৃষ্টি করা হয়। মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

(৩৬) মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচার, শিক্ষা-দীক্ষা, তাহজীব-তমদ্দুন নষ্ট করে দালালদের মছনদে বসান হয়।

(৩৭) স্পেনের মুসলমানদের মসজিদে ভর্তি করে আগুন দিয়ে পোড়ান হয় এবং ষ্টীমারে ভর্তি করে সাগরে ডুবিয়ে মারা হয়।

(৩৮) জ্ঞান-গুণী চিন্তাশীল দরদী মানুষদের জেল, ফাসী ও দ্বীপান্তরে নিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়।

(৩৯) মুসলমানদের ইসলামকে, কুরআন, হাদীছকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে এবং বিলাসিতা মদ-নারী বিলাসিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে এবং পরস্পরে, ভাইয়ে ভাইয়ে দলাদলি, কোন্দল এবং মারামারিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে ভাগ্যাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে প্রায় দুইশত বছরের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

(৪০) মিশনারী পাদ্রীদের লাগিয়ে দিয়ে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করে চিরকাল পাশ্চাত্যের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়।

এমতাবস্থার মধ্য দিয়েই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রেঁনেসা আন্দোলনের অগ্রদূত, মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরীর (রহঃ) এ ধরাধামে আবির্ভাবের লগ্ন ঘনিয়ে আসতে থাকে।

হকের সূর্য্যের ধরাধামে আগমণের পূর্বাভাস

মানব সৃষ্টি দর্শন

বিশ্বপ্রভু, বিশ্বনিয়ন্তা, দয়ালু, দয়াময়, দয়ার সাগর, রহীম-রহমান আল্লাহ। সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা আল্লাহ। সবজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ দয়া করে, দয়ার সাগরে উত্তাল তরঙ্গের গতিধারা সৃষ্টি করে, প্রেমের চরম পরশ বুলিয়ে দেয়ার ইরাদায়, সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার মহান গুণাবলীর ঝলক বিকশিত করার ইচ্ছায়, আপন কুদরতের নিদর্শনের সামান্যতম প্রদর্শনীর অভিপ্রায়ে, সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার উপলব্ধি সৃষ্টির মানসে, বিশ্ব সৃষ্টির চরম পরম কল্যাণ সাধণার্থে, দয়াময় দয়াল আল্লাহ নিকৃষ্টতম পদার্থের দ্বারা উৎকৃষ্টতম শ্রেষ্ঠতম আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ সৃষ্টি করলেন।

মানবের পজিশন

সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থায়ই মানুষ সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতার পথ দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নূরের ফেরেশতা মানুষ সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য ও দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে অপারগ হয়ে এ মহান কল্যাণময় গতিধারাকে রুদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু কুদরতের কারিশমায় সে বাধা শুধু দূরীভূতই হয়নি, নূরের ফেরেশতাদের অতি উর্দ্ধে খলিফাতুল্লাহ মাটির মানুষের মসনদ সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জান্নাত থেকে ধরার বুকে

সৃষ্টির পরেই মহান প্রভু সাময়িকভাবে মানুষকে চির শান্তির নিকেতন অতিথি ভবন বেহেশ্‌তে স্থান দান করলেন। কিন্তু যে মানুষের সৃষ্টি চির সংগ্রাম ও সাধনার জন্য, চির শান্তির নিকেতন অতিথি ভবন বেহেশ্‌ত তাকে আটকিয়ে রাখতে পারলো না। বিনা ক্লান্তিতে বিশ্রাম, বিনা ক্ষুধায় খাদ্য, বিনা পিপাসায় পানীয়, বিনা ঘর্মাক্ত কলেবরে সুশীতল মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোল, এ যে অসহ্য। তাই বিভুর হুকুমে তার কৃতি সৃষ্টি প্রভুর মহিমা বিকাশের উন্মুক্ত সংগ্রাম সাধনার ক্ষেত্র বিশ্ব ধরাধামে পদার্পণ করলেন।

রাহবারে আজম

এই ধরাধামের মহা সংগ্রাম ও সাধনার ক্ষেত্রের যুদ্ধকে সঠিক ও সুন্দরতম উপায়ে, বিভুর কাংখিত পন্থায় পরিচালনার জন্য আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব রূপকার হিসাবে মহান প্রভু যাঁদেরকে নির্বাচন ও মনোনয়ন করলেন, সেই পরম সৌভাগ্যশালী মহাত্মাগণ হলেন হজরতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জামায়াত এবং এ জামায়াতের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে নির্বাচন করলেন নবীকুল

শিরোমনি, আশরাফুল আম্বিয়া, সায়্যেদুল মুরছালীন খাতেমুন্নাবীয়্যিন, ফখরে মওজুদাত হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা আহমদ মোজতাবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে।

রহমতে আলমের পরে আর কোন নবীর দরকার নেই

মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোন নবী-রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না, আসার প্রয়োজনও নেই। মোহাম্মাদ (ছাঃ)ই সমস্ত নবী রাসূল (ছাঃ)-এর মিশনের সারনির্যাস এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকার সমস্যা আসতে পারে, তার সুষ্ঠু ও বাস্তব সমাধানের মূল চাবিকাঠি আল্লাহর বিধান কুরআনে হাকীম এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদীছ শরীফ সুসংঘবদ্ধ এবং সু-সংরক্ষিত আকারে উজ্জ্বল সূর্যের মত আমানত রেখে গেছেন।

যাঁদের বলবো নায়েবে নবী

এই মহান আমানতের যিনি যতটুকু হেফাযত করবেন, বিধি নিষেধ পালন করবেন, রক্ষা করবেন, প্রচার প্রসার করবেন, তিনিই রাসূলের তত বড় প্রতিনিধি, নায়েবে নবী, অরাছাতুল আম্বিয়া, আল্লাহর ওলী, বুযুর্গ, পীর-মাশায়েখ হতে সক্ষম হবেন। তাঁদের দ্বারাই কেয়ামত পর্যন্ত আসমানী বিধান চালু থাকবে, দ্বীন হেফাযত হবে, দ্বীনের কাজ চালু থাকবে, প্রচার প্রসার হতে থাকবে। তাঁরাই হবেন নায়েবে নবী, আল্লাহর ওলী, পীর-মাশায়েখ বুযুর্গ। এই তরীকা ব্যতীত নায়েবে নবী, পীর, বুযুর্গ হওয়ার আর কোন রাস্তা নেই।

অরাছাতুল আম্বিয়ার কাজ

নায়েবে নবী, অরাছাতুল আম্বিয়া, ওলী-আল্লাহ বুযুর্গ, পীর-মুরশিদদের কাজ শুধুমাত্র একটাই। এ ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই তাঁদের। তাঁরা আল্লাহর পথে, আল্লাহর খেলাফতের কঠিনতম দায়িত্ব হিসাবে, আল্লাহ রাসূলের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের জান, মাল এবং ইজ্জতকে বাজী রেখে আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বাস্তবায়িত, ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কর্তৃক সুশৃংখলিত এবং ওলামায়ে হক্কানী কর্তৃক সংরক্ষিত মহান শরীয়তের আদর্শাবলীকে নিজেদের জীবনে এবং সমাজ জীবনে মানব জাতির মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

কোন্ রাস্তা ধরতে হবে

এ সংগ্রামে, এ সাধনায় তাঁরা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পথ, খাতামুন্নাবিয়্যীনের প্রদর্শিত রাস্তা অনুসরণ করে চলবেন; কোন রক্ত চক্ষুর পরওয়া তারা বিন্দুমাত্রও করবেন না। কোন প্রলোভনে তাঁরা ভুলবেন না। কোন পদের মোহ তাঁদের আকৃষ্ট করবে না। কোন ধন ভাণ্ডারের প্রতি তাঁরা ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত

করবেন না। কালজয়ী, দিকবিজয়ী মর্দেমুমিন হিসাবে তাঁদের অপ্রতিরোধ্য গতি সামনের দিকে এগিয়েই যাবে। আগুনে নিক্ষিপ্ত হলে তাঁদের খোদাপ্রেমের অগ্নি সে আগুনকে ফুল বাগিচায় রূপান্তরিত করে ছাড়বে। সাগরে পড়লে মৎসকুল তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে, জলদগম্ভীর স্বরে তাঁরা সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে বলবে, ভয়ের কিছু নেই আল্লাহর মদদ আমাদের সাথে আছে, তিনিই আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন, উদ্ধার করবেন, মুক্তিদান করবেন। এমনকি করাতে দ্বিখণ্ডিত হলেও ধৈর্যের চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে হাসতে হাসতে আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিবেন। মোটকথা, কোন বাঁধাই তাঁদের গতিধারাকে রোধ করতে সক্ষম হবে না।

পীর মাশায়েখের গুণের মাপকাঠি

সমস্ত নায়েবে নবী, অরাছাতুল আম্বিয়া ওলী আল্লাহ, পীর মাশায়েখ, উলামায়ে কেরাম হবেন বজ্রের ন্যায় কঠোর, কুসুমের ন্যায় কোমল, রেশমের ন্যায় শক্ত ও পাহাড়ের মত অটল অবিচল। আকাশের উদারতা, সাগরের বিশালতা, বায়ুর গতিময়তা এবং সূর্যের তেজস্বিতার মহান ব্রত নিয়ে এ মহামানবেরা স্বীয় লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলবেন অব্যাহত গতিতে।

যিন্দাদিল এসব মর্দেমুমিন মুজাহিদগণ স্রোতের অব্যাহত গতিধারাকে রুখে দাঁড়াবে। সাইক্লোন আর টর্নের্ডোর গতিবেগকে স্তব্ধ করে দিবে। মুর্দা দিলে যিন্দেগীর প্রাণউচ্ছ্বাস বইয়ে দিবে। বার্দ্ধক্যের অথর্বতা যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিবে। দুর্ভেদ্য হিমালয় সম বাঁধার প্রাচীর ফুৎকারে উড়িয়ে দিবে।

সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশের প্রচলিত সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-শোষণ, ধোকাবাজী-ফাকিবাজী, বেহায়েমী, অশ্লীলতা, নাস্তিকতা, খোদাদ্রোহীতা, শিরিক ও বেদায়াতের বিরুদ্ধে এরা চির বিদ্রোহের ঝংকার তুলবে, আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। আচারে-বিচারে, ব্যবহারে, চাল-চলনে, কথাবার্তায়, কাজ কর্মে, সততায় সত্যবাদিতায়, আমানতদারীতে দেয়ানতদারীতে, ত্যাগে-তিতিক্ষায়, সংগ্রাম সাধনায়, সরলতায়, উদারতায়, কর্ম প্রেরণায়, ক্ষিপ্রতায়, মহানুভবতায়, শালীনতায়, মধুরতায়, মাধুর্য্যশীলতায়, সহনশীলতায়, পরমত সহিষ্ণুতায়, দয়াদ্রতায়, দায়িত্বশীলতায় তারা হবেন চরম ও পরম আদর্শবান কষ্টি পাথর।

নায়েবে নবীর কাজ

যুগে যুগে মানব দরদী অলিয়ে কামেল নায়েবে নবী ওলামায়ে হক্কানীদের আবির্ভাবে চির শাশ্বত; চির উজ্জ্বল ইসলামের মাঝে মুসলমানদের মাঝে যেসব

খোদাদ্রোহী কার্যকলাপ আচার-অনুষ্ঠান এবং কু-সংস্কারের বেড়াজাল সৃষ্টি হয়েছে, যুগশ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেলগণ তা সমূলে উৎপাটন করে ইসলামের সঠিক সুন্দর চিরশাশ্বত রূপ আবার তারা পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোন জালেম সরকার, কোন বাতেল শক্তি, কোন পাদ্রী পুরোহিত, ধনিক বনিক স্বার্থান্বেষী মহল হাজার চেষ্টা তদবীর করেও দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালিয়েও এ চির সত্য ও চির শাশ্বত মিশনের গতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। মর্দেমুমিন ওলীয়ে কামেলদের পরশমনিতুল্য স্পর্শে নোংড়া সমাজ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে উজ্জ্বল স্বর্ণপিন্ডে রূপান্তরিত হয়েছে।

জন্মগ্রহণের পূর্বে এদেশের অবস্থা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়টা ছিল মুসলিম জাহানের জন্য তথা গোটা বিশ্বের জন্য চরম বিপর্যয়, বিধস্ততার সময়, চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। কারণ, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে মুসলিম ভাগ্যসূর্য অস্ত যাওয়ার পর আস্তে আস্তে সমগ্র ভারত ইংরেজ বেনিয়াদের অধিকারে চলে যায়। ভারতের রাজ্য হারানোর সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের উপরও অমানিশার অন্ধকার ছেয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকার রাজ্য সমূহও বিদ্যুৎগতিতে সাম্রাজ্যবাদীদের গোলামীর নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রাশিয়ার জালেম জারের পতনের পর তাদের চেয়েও অধিক জালেম,জানোয়ার সেদেশ দখল করে এবং মধ্য এশিয়ার সমৃদ্ধশালী মুসলিম রাজ্যসমূহও ঐ দানবদের যাতাকলে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মুসলিম ইউরোপ থেকে আফ্রিকা, মধ্যএশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ভারত সর্বত্র মুসলিম লাশকে জালেম লম্পট পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীরা এবং লাল সাম্রাজ্যবাদী নাস্তিক শকুনেরা কুড়ে কুড়ে খেতে থাকে।

ভারত উপমহাদেশের অবস্থা বিশেষ করে বাংলার জমিনের অবস্থা ছিল সবচেয়ে বিপর্যস্ত। বাংলায় ৮০ হাজার মাদ্রাসা ছিল, দিল্লী শহরে দশ হাজার মাদ্রাসা ছিল এবং ডেবল শহরে দুইশতের মত ইউনির্ভাসিটি পর্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সবই ইংরেজরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। জালেমরা রাজত্ব, জমিদারী, ব্যবসা, শিল্প শিক্ষা সব কব্জা করে নিয়েছিল। তারা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস করে দিয়ে মারামারি কাটাকাটি আত্মকলহে লাগিয়ে দিয়েছিল। সুদ প্রথা চালু করে হিন্দু উচ্চবর্ণের বেনিয়াদের দ্বারা মুসলমানদের সর্বস্ব আত্মসাৎ করেছিল। রাজ্যহারা ধর্মহারা মুসলমান শিরিক বেদয়াত হিন্দুয়ানী রছম রেওয়াজে লিপ্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছিল। ইসলামপ্রিয় কিছু মানুষ যারা কংকাল অবস্থায়ও দ্বীনের মশাল জ্বেলে রেখেছিলেন তাদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হকের সূর্য উদিত হলো

ঠিক এমনই কঠিন সময় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উজ্জ্বলতম সূর্য, এ জামানার হাদী, যুগ সংস্কারক, রেঁনেসা আন্দোলনের অগ্রদূত, মুজাহিদে আযম, আলেমে রব্বানী, আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার পাটগাতী ইউনিয়নের ঘোপেরডাঙ্গা নামক এক পাড়াগায়ের নিভৃত পল্লীতে বাংলা ১৩০২ ইংরেজী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসের ২ তারিখ শুক্রবার সুবহে সাদিকের পরক্ষণেই জন্মগ্রহণ করেন।

সুবহে সাদিকের মৃদু মন্দ হাওয়া যেমন সমস্ত দিনের গ্লানি ও রাতের কালিমা ধুয়ে মুছে নিষ্কলুষ, নির্মল ও স্নিগ্ধ করে দেয়, মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানার আবির্ভাব যেন তদ্রুপ সমস্ত ইসলামদ্রোহী কাজ, অনাচার-অত্যাচারের কালিমাকে মুছে দেওয়ার পূর্বাভাসের সোনালী ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, বাতিলের বিরুদ্ধে হকের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য ও সুন্দরের এক শাশ্বত চ্যালেঞ্জ নিয়ে তিনি ধরাধামে পদার্পণ করলেন। তাঁর সুন্দর পবিত্রতম নির্মল চেহারা যেন এ কথা বলে দিল, অন্যায় অসত্যকে আমি বরদাশ্‌ত করবো না। আব্বা আম্মার দেওয়া শামছুল হক নামটি যেন এ কথাই বহন করে আনলো যে, সত্য সমাগত মিথ্যা দূরীভূত হয়েই যাবে।

পিতা মাতার নামের বরকত

তখনকার বাংলার বিশেষ করে মুজাহিদে আযমের জন্মভূমির আশপাশে দক্ষিন-পশ্চিম বাংলার নিম্নভূমির সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে হুযুর (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের সময়ে আরবের জাহেলিয়্যাতের যামানার কথাই মনে করিয়ে দেয়। আব্বার নাম মরহুম মুন্সি মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ছাহেব এবং আম্মার নাম সৌভাগ্যক্রমে মরহুমা আমেনা খাতুন হওয়ার কারণে এ বরকতের ফল্গুধারা এবং আশার আলোকমালা যেন বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। মনে হয় যেন পরম করুণাময় রহমান রহীম তাঁর করুণার ধারার অমীয় আলোকচ্ছটার দ্বারা এতদাঞ্চলের জাহেলিয়্যাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে ঈমানের আলোকে এ দেশকে সৌন্দর্য্যমন্ডিত করার ইচ্ছায়ই তাঁর প্রিয় হাবীবের আব্বা আম্মার নামের বরকতের দিক-দর্শনের মাধ্যমেই তাঁরই প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-এর সাচ্চা নায়েব, খালেছ আশেক মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে এদেশে পাঠালেন।

বংশ পরিচয়

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর পূর্বপুরুষগণ এদেশী ছিলেন না। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে তাঁদের

আগমন। আরব বা তার পার্শ্ববর্তী কোন দেশ থেকে দ্বীনের তাবলীগ করতে করতে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং যশোর জেলায় বসতি স্থাপন করেন। যশোর থেকে হুযুরের পূর্বপুরুষগণ দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে ফরিদপুর আগমন করতেন। একটি বিশ্বস্ত সূত্রমতে পাওয়া যায়, হুযুরের পূর্বপুরুষ প্রথমে যিনি এদেশে পদার্পণ করেন, তিনি ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ী সতের জন সৈন্যের একজন সৈনিক। বখতিয়ার খিলজী যখন লক্ষণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী আক্রমন করেন তখন তাঁর সাথের সতের জন সৈন্য, যাদের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশ জয় করেন। বিজয়ের পর ঐ সতের জন সৈন্যের অনেকেই এদেশে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন মুজাহিদ যশোরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে লিপ্ত হন। তিনিই হুযুরের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তিনি দাওয়াতের কাজে আরব থেকে ভারতে আসেন এবং বখতিয়ারের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্রগণও দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় গমন করতেন। হুযুরের বংশধরদের মধ্যে সূত্রপরম্পরায় যে কথাটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেটা হলো হুযুরের পূর্বপুরুষের প্রথম ব্যক্তিটি বখতিয়ার খিলজীর সেনাবাহিনীর কেউ ছিলেন কি না তা সঠিকভাবে প্রমাণিত না হলেও তিনি যে আরব তথা পশ্চিম দেশ থেকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে এসেছেন এবং যশোরে বসতি স্থাপন করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন– এ কথা সকলেরই জানা। কারণ, যশোর থেকে আমাদের ফরিদপুরে যিনি ধর্মপ্রচারের জন্য এদেশে আসতেন, তাঁর নাম মরহুম হযরত মাওলানা আউয়াল গাজী ছাহেব। আউয়াল গাজী ছাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র জনাব হযরত মাওলানা চাঁদ গাজী ছাহেব পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। দাওয়াতের কাজ করতে করতে তিনি ফরিদপুরের দক্ষিণ সীমানায় গওহরডাঙ্গা এলাকায় এসে পিতার ভক্ত অনুরক্ত অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই ভক্ত অনুরক্তদের মধ্যে আমাদের মরহুম হযরত মাওলানা ইদ্রিস ছাহেব (রহঃ) ওরফে বড় মাওলানা ছাহেবের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন। হযরত বড় মাওলানা ছাহেব মরহুমের পূর্বপুরুষদের ঐকান্তিক বাসনা ও চেষ্টায় মরহুম হযরত মাওলানা চাঁদ গাজী ছাহেব এদেশে বড় মাওলানা ছাহেবের বংশেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং পরে আস্তে আস্তে এদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শ্বশুর বংশের প্রচেষ্টায় এদেশে বসতি স্থাপন করেন এবং স্থায়ীভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। জনাব চাঁদ গাজী ছাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র জনাব মাওলানা চেরাগ আলী গাজী ছাহেব তিনি দাওয়াতের কাজের সাথে সাথে ইংরেজ বিরোধী জেহাদের তৎপরতাও চালাতেন এবং মানুষকে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতেও উৎসাহিত করতেন। বালাকোটের শহীদ

সৈয়দ আহমদ বেরলবীর জেহাদী কাফেলার দাওয়াত যখন বাংলাদেশে পৌঁছল, তখন চাঁদ গাজী ছাহেব বিশিষ্ট শিষ্য-শাগরেদ সহ ঐ কাফেলায় যোগদান করে সৈয়দ সাহেবের সাক্ষাতে হাজির হলেন এবং পূর্বের ইংরেজ বিরোধী জেহাদী জযবা আরো শত গুণে বেড়ে যায় এবং কঠোর ট্রেনিং-এ যোগদান করে সৈয়দ ছাহেবের সাথে জেহাদী কাফেলায় সময় অতিবাহিত করতে লাগলেন। সৈয়দ ছাহেব বালাকোটে শাহাদাত বরণ করার পর চাঁদ গাজী ছাহেব জীবিত কয়েকজন সাথীদের সাথে কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের পর দীর্ঘদিন পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুরব্বীগণের নির্দেশে দেশে দাওয়াতের কাজে লেগে যান।

এই চেরাগ আলী গাজী ছাহেবের স্বনামধন্য পুত্রই মরহুম মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ছাহেব। তিনি একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান আলেম ছিলেন এবং মুন্সি খেতাবে ভূষিত ছিলেন। এই মরহুম মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ছাহেবেরই ঔরশে জন্মলাভ করেন ইসলামের গৌরব, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রেনেঁসা আন্দোলনের অগ্রদূত মুজাহিদে আযম আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)।

বংশীয় লোকের ঈমানী গায়রাত

হুযুরের চাচাত ভাই মোস্তাইনের আব্বা আঃ ওয়াজেদ মুন্সীর নিকট শুনেছি তিনি বলেন, "একবার আমাদের মুরব্বীগণ জানতে পারলেন যশোর থেকে আমাদের বংশের এক বুযুর্গ আমাদের দেখতে আসছেন। এই খবর পেয়ে মুরব্বীরা বাড়ীতে কৃষি কাজের লাঙ্গল-জোয়াল, কাস্তে-কোদাল বাগানের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল। ঐ বুযুর্গ যখন বাড়ীতে তাশরীফ আনলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করে চতুর্দিকে ঘুরে দেখলেন যে এরা কৃষিকাজে পাকাপোক্তভাবে লেগে গেছে, তখন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আফছোছ করে বললেন, "হায় বংশের লোকের কি ভীষণ অবনতি। এরা দাওয়াতের কাজ করতে এসে এখন সে কাজ না করে কৃষি কাজে মত্ত হয়ে পড়েছে, আল্লাহ এদেরকে ছহীহ্ বুঝ দান করুন।" অতঃপর জলদি জলদি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন, "তোমরা যেহেতু বাপ-দাদার ধর্মীয় কাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজে লেগে গেছ কাজেই তোমাদের পরিচয় আর আমরা দিব না এবং এখানে আর কোনদিন আসবও না।" সত্যিই আর কোনদিন তিনি সেখানে আসেননি।

মায়ের কোলে হকের সূর্য

যে বৃক্ষটি বড় হবে দুই পাতা গজালেই তা চেনা যায়, জানা যায়। তদ্রুপ যে মানুষটি জগতের একজন আদর্শ মানব হবেন, আগত কালের জন্য তিনি স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকবেন, মাতৃকোলের প্রতিভাবান চেহারা দেখেই তা দিবালোকের

মত প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সদ্য জ ন্মগ্রহণ করেছেন, সব যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জন্মগত কোন আবিলতার চিহ্নমাত্র নেই। ক্লান্ত শ্রান্ত মা শত কষ্টের সাথে শিশুটির দিকে চাইলেন। শিশুটিকে দেখেই যেন মায়ের অনেক কষ্ট দূর হয়ে গেল, কোলে তুলে নিলেন, আদর করে চুমু খেলেন। কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেল। যত্নের সাথে মুখে দুধ দিলেন। শিশুটি নির্লিপ্তভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন মায়ের শত কষ্ট ক্লান্ত চেহারার কারণে শিশুরও কষ্ট হচ্ছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর দুধে মুখ দিলেন; যেন কোন ব্যস্ততা নেই ধীরে ধীরে দুধ পান করলেন, আবার মায়ের মুখের দিকে তাকালেন। আব্বা মুন্সি আব্দুল্লাহ ছাহেব ঘরে এসে, শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোলে তুলে নিলেন, চুমু খেলেন, এক অজানা মায়ায় যেন হৃদয় ভরে উঠল। চোখে পানি এসে গেল। এ মায়াবী শিশু যেন বাবার হৃদয়ের সবটুকু দখল করে নিল। শিশু বড় হতে লাগল। প্রত্যেক দিনই যেন নতুন চেহারা, নবসচেতনতা। আত্মীয়-স্বজন আসলেন, পাড়া-প্রতিবেশীরা আসলেন, সকলেই যেন মুগ্ধ-মোহিত। এ কেমন শিশু; কান্না নেই। নির্লিপ্ত চেয়ে থাকে শুধু, ডাগর ডাগর চক্ষু, উন্নত ললাট, লম্বা লম্বা হাত-পা, জোড়া ভূরু। এ যেন এক ভুবন মাতানো আকর্ষণীয় চেহারা নিয়ে আব্দুল্লাহ মুন্সি ছাহেবের ঘরে এক মহামূল্যবান রত্ন এসেছে।

পিতা শিশুর ডান কানে আযান এবং বাম কানে একামতের ধ্বনি শুনিয়ে দিলেন। এ যেন মহামন্ত্র দান। কেননা পিতা শিশুকে জানিয়ে দিলেন– এটা দুনিয়া, এখানে তুমি মেহমান হিসাবে আল্লাহর কাছ থেকে আমার কাছে এসেছো। আল্লাহই তোমার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা, তিনি সর্বোপরি মালিক মোক্তার, আমাদের সেই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। পলে পলে তিলে তিলে জীবনের যাবতীয় হিসাব নিকাশ তার দরবারে দিতে হবে। এখানে থাকা যাবে না। এখানকার জীবন বড় কঠিন, খেল তামাশার যায়গা এটা নয়। এখানে থাকতে হলে মানুষের মত বাঁচতে হলে আল্লাহকে, আল্লাহর হুকুমকে সর্বাবস্থায় মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহকে মানার ও পাওয়ার একমাত্র রাস্তা মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর রাস্তা, নীতি আদর্শ এবং সুন্নাত। রাসূলের সেই নিয়ম সুন্নাত মোতাবেকই জীবনকে গঠন করতে হবে, নিজে চলতে হবে, জগতকে পরিচালিত করতে হবে, বিশ্বকে জানাতে হবে, এক আল্লাহর হুকুম এবং রাসূলের অনুসৃত পথ ছাড়া আর সব শয়তানী, অসভ্যতা, অভদ্রতা, অমানবিক। এখন থেকে এ কথা অন্তরে গেথে নাও, ভবিষ্যতে যা করণীয়। আযান, একামতের তালক্বীন করে হুযুরের পিতা যেন এ কথাই ছেলেকে বলে দিলেন।

মায়াবী জান্নাতি শিশু

এ কোন মায়াবী শিশু। প্রতিভাবান চেহারা, মুখ দেখলেই আদর করতে মনে চায়, ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, কোলে তুলে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়, বুকে জড়িয়ে রাখতে মনে চায়, ফুটফুটে সুন্দর নয় মোটেই বরং উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের মার্জিত প্রতিভাধর চেহারা, বেশী কাঁদে না, আবার হাসেও না, গভীরভাবে চেয়ে থাকে, মাঝে মধ্যে একটু মুচকি হাসে, সে সামান্যই, ক্ষণিকের জন্য, আবার গভীর হয়ে যায়। যখন একটু হাসে যেন বিদ্যুতের খেলা খেলে যায়। শুধু মা বাবাই নয় পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, আপন পর সকলেই যেন ছেলেটিকে আপন করে নিল। যে মানব-দরদী, অনাগতকালে সমস্ত মানুষকে আপন করে ভালবাসবেন, শিশুকালে যেন স্বাভাবিবভাবে তাঁর সে আকর্ষণে সবাই তাঁকে আপন করে নিল। অনেকে কোলে তুলে আদর করে কিন্তু শিশুটির সেদিকে খেয়াল নেই। তার গাম্ভীর্যপূর্ণভাব-প্রকৃতি, নির্লিপ্ত চাহনি দেখে অনেকে কোলে করতে সাহস পায় না। শিশুটি সবার কোলে যেতে আগ্রহীও নয়। মা বাবা কাউকে নিষেধ করে না কোলে নিতে। কিন্তু শিশুর হাবভাবেই যেন সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। এ ছেলে যেন অনাগতকালের গৌরব হবে। এ শুধু মুন্সি বাড়ী ও গাজী কুলেরই গৌরব হবে না, এ শিশু যেন সমগ্র জগতের গৌরব হবে। দিন যায় রাত আসে, আবার রাত যায় দিন আসে। শশি কলার মত বাড়তে আরম্ভ করলো। বয়স যখন সাতদিন হলো পিতা অনেক ভাবনা চিন্তা করে নাম রাখলেন শামছুল হক। সবাই যেন নাম শুনে খুশী হয়ে গেল। পিতা শিশুর মাথা মুন্ডন করে চুলের সম পরিমাণ সোনা-রূপা ওজন করে গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। খোরমা চিবিয়ে মুখে দিলেন, কিছু মাথায় মেখে দিলেন।

নাম করণের স্বার্থকতা

কে জানত ভাবীকালে এ শিশুটি হবে জগত বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল, আদর্শ নেতা, কালেমার আওয়াজ বুলন্দকারী, যুগসংস্কারক। কিন্তু যিনি তাঁর পিতা ছিলেন তিনি অসাধারণ বাহাদুর মানুষ ছিলেন। অন্যায় বরদাশত করতেন না কখনও। গাজীর রক্তের অধিকারী, তাই তিনি ছিলেন বৃটিশ বেনিয়াদের চরম শত্রু। তিনি চাইতেন শক্তি থাকলে এক মিনিটে এই-বেনিয়া শয়তানের জাতিকে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে তাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু সে শক্তি কোথায়? এ জন্য তিনি সর্বদা গভীরভাবে চিন্তিত থাকতেন। সাধারণ মানুষ সহজে তার কাছে যেত না। সেই পিতা সন্তানের মুখ দেখে খুশী হলেন, হয়ত চিন্তা করলেন, নিজেরা তো পারলাম না পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত হতে, যদি এই ছেলেটিকে মানুষের মত মানুষ

করে গড়ে তুলতে পারি তবে হয়ত এর দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে। হয়ত ভেবেছিলেন সূর্য যেমন রাতের অন্ধকারকে দূর করে দিয়ে জগতকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে, আমার এ সন্তান বড় হয়েও সেইরূপ গোলামী এবং কুফর-শেরেকীর অন্ধকারকে দূর করতে সক্ষম হবে। এ জন্যই ছেলের নাম রাখলেন শামছুল হক অর্থাৎ আল্লাহর সূর্য। অনাগতকালে এ মহাপুরুষ সত্যিই পিতার স্বপ্নকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করে শুধু পিতার মুখই নয় সমগ্র জাতির মুখই উজ্জ্বল করে দিয়েছিলেন। তিনি যেখানেই পদার্পণ করেছেন হকের বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন।

প্রথম ছবক – বায়াতনামা

শিশুটি দিন দিন বড় হচ্ছেন। বুকে হাটা শিখলেন কিন্তু সে মাত্র কয়েক দিন। এটা যেন শিশু পছন্দই করতেন না, উপুড় করে দিলেই আবার বসে পড়তেন। আস্তে আস্তে এক পা দুপা করে হাটতে শুরু করলেন এবং একটা দুটো কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আম্মা আব্বা বলতে চেষ্টা করতেন। মা আমিনা খাতুন সাথে সাথেই শিশুকে পড়িয়ে দিলেন আল্লাহু আল্লাহু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ! আল্লাহ!! কয়েক দিনের মধ্যেই শিশু শামছুল হক আল্লাহ আল্লাহ বলা শিখে ফেললেন। এখন শিশু শামছুল হকের মুখে শুধু আল্লাহ আল্লাহ। এ যেন প্রাণের বাণী, অন্তরের কথা। আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে তিনি মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। এখন আর বলে দেওয়া লাগে না। নিজে নিজেই মাঝে মাঝে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ মুখ দিয়ে বের হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই কালেমা শিখে নিলেন। এখন তার জল্পনাই আল্লাহ, আল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এভাবেই মায়ের আদর-যত্নে জীবনের প্রথম ছবক বাইয়াতনামা রপ্ত হয়ে গেল।

স্বভাব প্রকৃতি

শিশুকাল থেকেই হযরতের স্বভাব গম্ভীর প্রকৃতির ছিল, চাল-চলন ছিল ধীর-স্থির। বেশী কথা বলতেন না। কি যেন ভাবেন, চিন্তা করেন। কে কি করছে সেদিকে মোটেই খেয়াল দিতেন না। আপন ভাবনারাজ্যে চিন্তায় বিভোর থাকতেন। বাল্যকালে অন্য শিশুদের মত তিনি চঞ্চল ছিলেন না। শিশু সুলভ বাচালতা কোন দিনই তার মাঝে দেখা যায়নি বরং এ সিংহ পুরুষটি যেন সর্বদা আপন স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে চলতেন। খেলাধুলায় তেমন মন ছিল না। অবসর সময় গম্ভীরভাবে বসে থাকতেন এবং চিন্তা করতেন। একা একা চলতে পছন্দ করতেন। আকাশের দিকে, বৃক্ষলতার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, খেতেন, ঘুমাতেন কিন্তু নোংড়ামী কোনদিন করতেন না। সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। কেউ

আদর করে চুমু দিলে মুখে হাত দিয়ে মুখ মুছে ফেলতেন। বিছানায়, মায়ের কোলে পেশাব পায়খানা খুব কমই করেছেন। সময় হলে খুব নড়াচড়া করতেন। এজন্য আব্বা আম্মা এবং অন্য সকলে শিশুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন এবং তারা আদর করে তাঁকে কোলে তুলে নিতেন। সাথীদের সাথে কোনদিন তিনি ঝগড়া-ফাসাদ করেননি বরং কেউ মারামারি বা ঝগড়া ফাসাদ করলে তিনি মিটিয়ে দিতেন, মিটানো সম্ভব না হলে দূরে সরে আসতেন।

প্রাথমিক পাঠ

চার বৎসর বয়সেই মুজাহিদে আযমের মায়ের কাছে 'আলিফ' 'বা' এর পাঠ শুরু হয়। মা আমিনা ছেলেকে যত্নের সাথে পড়াতেন। কালেমা পড়াতেন, আল্লাহ, আল্লাহর তালীম দিতেন। পিতা বাহাদুর মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহও মাতব্বরী, ইমামতী, শালিসী, ব্যবসা-বাণিজ্যের ফাঁকে ফাঁকে ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে চুমু খেতেন এবং আলিফ, বা, আল্লাহ, আল্লাহ এবং কালেমার তালীম দিতেন। এভাবেই শিশু শামছুল হকের প্রাথমিক পাঠ বা হাতে খড়ি শুরু হলো।

চার পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তিনি বাড়ীতেই যা কিছু পড়েছেন। বাড়ীতে থাকা অবস্থায় ভাবী ছাহেবের কাছে সূরা শিখতেন। নামাযের প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ ছিল এবং বাড়ীতে আব্বা সকলকে নামাযের জন্য শাসাতেন এবং নামায না পড়লে তার খানা বন্ধ করে দিতেন। হুযুর চার পাঁচ বৎসর বয়সেই টুপী মাথায় দিয়ে মসজিদে গমন করতেন এবং মুসল্লীদের দেখাদেখি তাদের সাথে রুকু সিজদা করতেন, নামায পড়তেন। বাড়ীতেই মসজিদ ছিল এবং হুযুরের আব্বা মরহুম মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ছাহেবই ঐ মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি পিতার সাথেই মসজিদে গমন করতেন এবং নামায পড়তেন।

নামাযের জন্য রোদন

পাঁচ বৎসর বয়সেই হুযুর বাড়ীর মসজিদে নামাযের জামায়াতে শরীক হতেন। আম্মাকে বলে রাখতেন ফজরের সময় যেন তাঁকে উঠিয়ে দেন, যাতে নামায কাযা না হয়। একদিন তার আম্মা ইচ্ছা করেই ফজরের সময় এ বাচ্চা মানুষটিকে নামাযের জন্য ডেকে উঠাননি। ফলে বিলম্বে জাগ্রত হওয়ার কারণে নামায পড়তে যেতে পারেননি। ঘুম থেকে উঠে আম্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, নামায হয়ে গেছে কি না? আম্মা জবাবে বললেন অনেক আগেই জামাতে নামায শেষ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে বাচ্চা শামছুল হক অঝোরে কান্না শুরু করে দিলেন। সে কি মর্মস্পর্শী কান্না! অনেক বুঝিয়েও কেউ তাঁকে থামাতে সক্ষম হলেন না। কেন তাঁকে ডাকা হয়নি- একথা বলে বার বার শুধু কাঁদতেই থাকলেন। সেদিন খানা খেলেন না এবং মুখ বুজে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে রইলেন। তাঁর আম্মা যেন ভীষণ অপরাধী

সেজে গেলেন। অনেক অনুরোধ করেও যখন খানা খাওয়াতে এবং কান্না থামাতে সক্ষম হলেন না তখন বললেন "ঠিক আছে বাবা আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আগামীতে আর ভুল হবে না, তোমাকে ঠিকমত ফজরের নামাযের সময় অবশ্যই উঠিয়ে দিব। এখন খানা খাও।" এরপর তিনি খানা খেলেন। অতঃপর আর কোন দিনই হুযুরের আম্মা ভুল করেননি। ফজরের সময় ঠিকমত ডেকে দিতেন এবং হুযুর আব্বার সাথে সাথে মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতেন। এত ছোট বয়সেও নামাযের প্রতি কি অসাধারণ টান এবং মহব্বত ছিল, আমাদের তা ভাবতেও কষ্ট হয়। আমরাও যদি নামাযের প্রতি এতটুকু মহব্বত সৃষ্টি করতে সক্ষম হতাম এবং আমাদের ছেলে মেয়েদেরও সকালে ফজরের সময় নামাযের জন্য উঠিয়ে দিতাম তবে কতই না ভাল হতো! আল্লাহপাক আমাদেরকে নামাযের প্রতি এরূপ মহব্বত দান করুন।

আদর্শ অনুকরণ ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

মুজাহিদে আযমের বাড়ীর সংলগ্ন জামে মসজিদ ছিল। বর্তমানে মাদ্রাসার মসজিদে জুমার নামায হয় এবং বাড়ীর মসজিদে ওয়াক্তিয়া নামায এবং মক্তবের কাজ চলে। মাদ্রাসার দুই একজন তালেবে এলেমও ঐ মসজিদে থাকে। এই মসজিদে নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময়ও হুযুর চুপে চুপে গমন করতেন এবং পিতা যেভাবে ইমামতী করতেন এবং খুতবা দান করতেন, ঐভাবে মিম্বরে খুতবা নিয়ে বসতেন। পাছে লোকে দেখে ফেলে এজন্য হুযুর খুব সতর্ক হয়ে ইমামতীর অনুকরণ করতেন। কোন লোকজন আগমনের আভাস পেলেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতেন। পড়ার প্রতি দারুণ আগ্রহ ছিল। এজন্য ঐ ছোট বয়সেই বাড়ীতে তাঁর এক ভাবী ছাহেব খুব ভাল কুরআন পড়তে পারতেন। আব্বা টের না পায়, এভাবে অতি গোপনে ঐ ভাবী ছাহেবার নিকট আলিফ, বা এবং কায়দায়ে বোগদাদী খতম করেন এবং কয়েকটি সূরা ও আত্তাহিয়্যাতু, দোয়ায়ে কুনুত এবং অন্যান্য দোয়া দরূদ মুখস্ত করে ফেলেন পিতার অগোচরেই। এরপর বাড়ীতে নিকটবর্তী তাঁর এক ভগ্নিপতি ভাল আলেম ছিলেন। তাঁর নাম মুন্সি আরশাদ আলী সাহেব। তিনি হুযুরকে খুব ভালবাসতেন। আরশাদ আলী মুন্সী সাহেবের কাছে তিনি গোপনে আমপারা পড়া শুরু করেন। এভাবে তিনি পিতার অজান্তেই এলমে দ্বীনের পিপাসা মিটাতে থাকেন।

দেবতার আঙ্গিনায় হকের সূর্যের পদার্পণ

বয়স তখন ৬ কিংবা সাত বছর। হুযুর অন্যান্য ছেলেদের থেকে একটু ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। শারীরিক বলিষ্ঠতা এবং শরীরের গঠনও উন্নতমানেরই

ছিল। পিতার স্বাস্থ্যও দেখার মত ছিল। বিশাল শক্তিশালী দেহ, চেহারাও খুব সুন্দর। পিতার সন্তান হিসাবে হুযুরের শারীরিক গঠন এবং স্বাস্থ্য খুবই সুন্দর ছিল। সাত বছরের ছেলেকে নয় বছরের মনে হতো। হুযুরের পিতা ছেলেকে পড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ঐ সময় এদেশে বিশেষ করে গোপালগঞ্জে বা আশেপাশে না ছিল কোন স্কুল বা মাদ্রাসা। এজন্য পিতা মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব হুযুরের পড়াশুনার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে অনেক চিন্তা ভাবনার পর পাটগাতী টুঙ্গীপাড়ার মিলন স্থানের মন্ডপে হিন্দুপন্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন।

কে জানত এমনটি হবে। যার ভাবমূর্তি দেখে সবাই অবাক বিস্মিত। যার চাল-চলন, গতি-প্রকৃতি দেখে লোকে মনে করত এ বালক অনাগতকালে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হবেন। অনাগতকালে এ ছেলে দেশ, জাতি ও বংশের মুখ উজ্জ্বল করবেন বলে লোকে ধারণা করতো। কিন্তু আল্লাহর কি মর্জি কিছুই বুবার উপায় নেই। যিনি হবেন মুসলিম জগতের শিরোমনি, বিংশ শতাব্দীর ওলামা সমাজের গৌরবের কেন্দ্রবিন্দু, জাতির দিক দিশারী। যার প্রচেষ্টায় শিরক, বিদয়াত সমূলে উৎপাটিত হবে। সমস্ত শিরকের বেড়াজাল থেকে যিনি জাতিকে দিবেন মুক্তি। না জানি কোন মহাপুরুষের পবিত্র হাতে, কত বড় মহান মর্যাদাবান মজলিসে তার লেখাপড়া আরম্ভ হবে বলে মানুষ যে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে ছিল। কিন্তু না এই জগত বিখ্যাত মানুষটির, তৌহিদের ঝান্ডা বহনকারী মর্দেমুজাহিদের ঐ কাংখিত নিয়মে প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়নি। যিনি হাজার হাজার মানুষের পড়াশুনা শুভ সূচনা পরিপূর্ণ সুন্নাত মোতাবেক শুরু করার বাস্তব ব্যবস্থা করেছেন, সেই মহা মানবটির প্রাথমিক পাঠ কোন ইসলামী কায়দায় শুরু হয়নি, কোন মহৎ লোকের দ্বারাও শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে মন্ডপের জনৈক হিন্দু পন্ডিতের মাধ্যমে ওঁম দেবতার নাম উচ্চারণ করে। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল প্রথমে তাঁকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। কিন্তু সে যামানায় ইংরেজদের চক্রান্তের ফলে মুসলমানদের লক্ষ লক্ষ সর্বাঙ্গীন সুন্দর শিক্ষাকেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজদের চক্রান্তে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞানের সমন্বয়কারী মাদ্রাসা শিক্ষার রূপ আস্তে আস্তে মানুষ ভুলতে থাকে এবং ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত নৈতিকতা বিবর্জিত তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে কিছু নমূনা প্রতিষ্ঠান প্রায়ই হিন্দু এলাকায় তাদের তত্ত্বাবধানে চালু হয়। কাজেই মুজাহিদে আযমের সম্মানিত পিতা নানা চিন্তা-ভাবনার পর কোথাও আধুনিক ভাল শিক্ষাকেন্দ্র না পেয়ে আপাততঃ প্রাথমিক পর্যায়ে টুংগিপাড়া পাটগাতি গ্রামের মিলনকেন্দ্রে মুজাহিদে আযমের গ্রাম সংলগ্ন এই হিন্দু মন্ডপে জনৈক হিন্দু পন্ডিতের কাছে ভর্তি করতে বাধ্য হন।

পন্ডিত বাবু তাঁকে উক্ত মন্ডপে বসিয়ে মন্দিরের বড় বড় মূর্তির সামনে আজি অর্থাৎ ওঁম দেবতার নাম উচ্চারণ করে হুযুরকে অ আ ক খ প্রথম পাঠ পড়িয়ে দিলেন। এইভাবে একজন জগত বিখ্যাত যুগ সংস্কারকের প্রাথমিক পাঠ একজন পাক্কা মুশরিক হিন্দু পন্ডিতের হাতে শিরকের পরিপূর্ণ আসবাব পত্রের মধ্যেই শুরু হলো। কে জানত যে এই মানুষটিই একদিন সমস্ত শিরিক বিদয়াতকে ধুয়ে মুছে তৌহীদের নূরানী তরীকা জগতের দিকে দিকে বিস্তার করবেন।

পাটগাতি মন্ডপে পড়াকালে হুযুরের হালাত

এ পাঠশালায় ভর্তি হয়ে মুজাহিদে আযম এক অপার আনন্দ অনুভব করলেন। নিয়মমত ঠিক সময় পাঠশালায় হাজির হতে হয়, শিক্ষকের নিকট পাঠ শুনাতে হয়, নতুন পাঠ গ্রহণ করতে হয়। এ যেন তার কাঙ্খিত জিনিসের বাস্তব রূপায়ন। খুশীতে হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কয়েকজন সাথী এক সংগে পাঠ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষককে পরের দিন পাঠ শুনান, প্রতিযোগিতা হয় তাদের মাঝে– এটা তার নিকট খুবই আনন্দের কাজ বলে মনে হতে লাগলো। কে সুন্দরভাবে একেবারে শুদ্ধভাবে, অবিকল ওস্তাদের মত ওস্তাদকে পাঠ শুনাতে পারবে। এ যে অপার আনন্দ। যে সুন্দরভাবে পড়া শিক্ষককে পন্ডিত মশায়কে শুনাতে পারবে, পন্ডিত মশায় তাকে সাবাস ধন্যবাদ দিতেন, ভালবাসতেন এযে দারুণ খুশীর কাজ। ওস্তাদকে ভক্তি করা, মান্য করা, ভদ্রতা, নম্রতা, শালীনতার সাথে চলা, ঠিকমত শিক্ষককে পড়া শুনান, নিয়মিত পাঠশালায় উপস্থিত হওয়া এ সবকাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ওস্তাদের হৃদয়ে স্থায়ী ভালবাসার আসন গেড়ে বসলেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব বালক শামছু মুন্সি ছাহেবের ছেলে।

শিক্ষক ও সাথীদের প্রাণঢালা ভালবাসার মধ্য দিয়ে বর্ণমালা শেষ

পন্ডিতমশায় হুযুরকে ছেলের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। কি এক অলৌকিকভাব তিনি এ ছেলের মধ্যে দেখতে পেতেন। একে কেন যেন ভাল না বেসে পারা যায় না। কেন যেন এ ছেলেটি আপন বানিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়। কেন যেন এ ছেলের মোহময় মায়াবী চাহনীকে ভোলা যায় না বরং হৃদয়ের মনিকোঠায় গিয়ে যেন এ ছেলে আসন গেড়ে বসতে চায়। সবার চেয়ে ভাল ছেলে হওয়া সত্ত্বেও কারো প্রতি তাঁর কোন হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই সবাইকে ভালবাসে, সম্মান করে, স্নেহ করে। সবাই তাকে ভালবাসে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এইরূপে সাথীদের শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং শিক্ষকের অপরিসীম স্নেহের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই পন্ডিতবাবুর কাছে পড়া শেষ করলেন। বর্ণমালা প্রথম পাঠ– প্রথম শ্রেণীর পড়া যোগ্যতার সাথে শেষ হলো। বর্ণমালা পড়েই হুযুর মিলিয়ে মিলিয়ে অক্ষর সংযোজন করে পত্র

লিখতে পারতেন। ক্লাশে তিনি সবসময় প্রথম হতেন। এটা যেন তার জন্য রিজার্ভ ছিল। এজন্য উস্তাদের স্নেহ দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। সবসময় ফার্ষ্ট হওয়ার কারণে সাথীদের অনেকেরই অহেতুক তাঁর প্রতি ঈর্ষা হতো এবং মাঝে মধ্যে কিছু উল্টা পাল্টা ব্যবহার করে হুযুরকে তারা কষ্ট দিতো। কিন্তু তিনি কোন দিন এর প্রতিবাদ প্রতিকার তো দূরের কথা উস্তাদের কাছেও কোন দিন নালিশ করেননি বা মনে কোন প্রকার দুঃখ নেননি। মনে করতেন এরা বুঝে না এজন্যই উল্টা পাল্টা কিছু করে থাকে। এজন্য কিছুই বলতেন না।

দুষ্টু সহপাঠিদের ব্যবহারের একটি ঘটনা

পন্ডিতবাবুর মন্ডপে পড়া অবস্থায়ই প্রায় সকল সহপাঠিই তাঁকে পন্ডিতবাবুর মত ভক্তি করতো এবং মাঝে মধ্যে পন্ডিতবাবুর কাছে পড়া দেয়ার পূর্বে হুযুরের কাছে পাঠ বাতিয়ে নিত। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু দুষ্টু সহপাঠিরা তাঁর প্রতি ঈর্ষা ও হাছাদ করতো। তারা পরামর্শ করে বলাবলি করতো শামছু সব পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয় আমরা হতে পারি না, এটা হতে পারে না। আমরা ফার্ষ্ট হবো, আগামী পরীক্ষায় তাকে কিছুতেই ফার্ষ্ট হতে দিব না। এইরূপ পরামর্শ করে ঐ দুষ্টু ছেলেরা একবার পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে হুযুরের সমস্ত বইগুলো চুরি করে লুকিয়ে রাখলো যাতে তিনি পরীক্ষার সময় পড়তেও না পারেন এবং ফার্ষ্টও হতে না পারেন। হুযুর বই চুরির কথা কারও নিকট প্রকাশ করলেন না এবং কাউকে কিছুই বললেন না। তাদের অনেকে তামাশা করে জিজ্ঞাসা করতো তোমার বই নেই কেন? তিনি বলতেন কয়েক দিন হয় বইগুলো হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না। কয়েকদিন পর যথারীতি পরীক্ষা হয়ে গেল। ফল প্রকাশ পেলে দেখা গেল সবাইকে অবাক করে দিয়ে শামছুল হক প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সবাই মনে করতো বই নেই কাজেই এইবার শামছুল হক ফেল করবে, কিন্তু তাদের সে আশার গুড়ে বালি পড়ে গেল। পরীক্ষার ফল বের হবার কিছু দিন পরে ঐ দুষ্টু ছেলেগুলো হুযুরের বইগুলো ফেরৎ দিয়ে দিল। হুযুর বইগুলো চুরি হয়েছে, এ চুরি শব্দটি পর্যন্ত মুখে আনেননি বরং বলেছেন পাচ্ছিনা। উস্তাদের কাছেও জানাননি বা কারও কাছে প্রকাশ করেননি। কারণ তিনি জানতেন তার সাথীরা কি জন্য বই লুকিয়ে রেখেছে। এজন্য কিছুই বলেননি। কতবড় মহৎ হৃদয়।

পাটগাতি পূর্ণচন্দ্র বাবুর পাঠশালায়

অল্পদিনে পন্ডিতবাবুর মন্ডপে প্রথম শ্রেণীর পড়া শেষ করে পাটগাতির P.c.c পূর্ণ চন্দ্র বাবুর পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। P.c.c বাবুর টোলে প্রথম শ্রেণীর উপরের দিকের বিষয়াবলী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত বই পুস্তক পড়ানো হতো। হুযুর অসাধারণ মেধা এবং ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। একবার

যা পড়তেন বা পড়িয়ে দেয়া হতো সাথে সাথে কণ্ঠস্থ করে নিতেন। কাজেই এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত বই পুস্তক পড়ে শেষ করলেন, শুধু শেষ নয়, একদম মুখস্ত কণ্ঠস্থ করে নিলেন। পূর্ণচন্দ্র বাবু অবাক হয়ে গেলেন। এ রকম মেধাবী ছাত্র তিনি জীবনে কোন দিন পাননি। শুধু পড়াশুনাই নয়, আদব-কায়দা, ভদ্রতা-নম্রতা, নিয়মানুবর্তিতার এমন একনিষ্ঠ সাধব ছাত্রের তিনি কোনদিন সাক্ষৎ পাননি। ছাত্রের মেধা, বিনয় ও ভদ্রতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পন্ডিত বাবু এ রকম ছাত্র পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। মুন্সি আব্দুল্লাহ ছাহেবকে খবর দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। এ রকম সোনা চাঁদের উস্তাদ, গুরু হওয়া বা পিতা হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বলে ব্যক্ত করলেন। পি, সি, সি বাবুর টোলের পাঠ কৃতিত্বের সাথে সমাপণ করে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য হুযুরের পিতা বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলেন।

টুঙ্গীপাড়া ছোট শেখদের বাড়ীর পাঠশালা

পি, সি, সি, বাবুর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে হুযুর টুঙ্গীপাড়া ছোট শেখদের বাড়ী মুন্সি আজিজুল হক ছাহেবের পাঠশালায় ভর্তি হলেন। মুন্সি আজিজুল হক ছাহেবের ডাক নাম ছিল কালা মুন্সি ছাহেব। মুন্সি আজিজুল হক ছাহেব খুব যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। মেধাবী ছাত্রের কদর তিনি জানতেন। পি, সি, সি বাবুর কাছে যখন হুযুর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন সে সময় মুন্সি ছাহেব পি, সি, সি বাবুর কাছে হুযুরের অনেক গুণগান শুনেছেন। মনে মনে আকাংখা ছিল শামছুল হকের মত একজন ছাত্র পেলে তিনি প্রাণ ঢেলে পড়াবেন। ভাগ্যের কি খেলা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য হুযুরের পিতা মুন্সি আজিজুল হক ছাহেবকেই নির্বাচন করলেন। হুযুরকে ছাত্র হিসাবে পেয়ে মুন্সি আজিজুল হক ছাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াতে আরম্ভ করলেন। তিনি হুযুরের মেধার যে প্রশংসা শুনেছিলেন বাস্তবে তার চেয়ে বহুগুণে উন্নত হুযুরকে পেলেন। অল্পদিনের মধ্যে মুন্সি আজিজুল হক ছাহেবের চেষ্টায় সেখানকার সর্বশেষ তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত পাঠ যোগ্যতার সাথে সমাপ্ত করলেন। সবাই হুযুরের কৃতিত্ব এবং শিক্ষক আজিজুল হক ছাহেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। দেশবাসী হুযুরকে এবং হুযুরের আব্বাজানকে বাহবা করতে লাগলেন। ঐ সমস্ত পাঠশালায় হুযুরের সহপাঠি ছাত্র ছিলেন জনাব মাষ্টার ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তিনি প্রাথমিক তিন বছর হুযুরের সাথী ছিলেন।

সাক্ষাৎ দেবতা

হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের পাঠ্য জীবনের তিন বছরের সাথী বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের পাটগাতি বাজার সংলগ পূর্ব পার্শ্বে বাড়ী ছিল। তিনি বর্তমান নারায়ন

মিস্তিরীর পিতা ছিলেন। আমরা যখন ১৯৫৮ সালে গওহরডাঙ্গা প্রাইমারীর শিক্ষক ঐ সময় ব্রজেন বাবু পাটগাতি প্রাইমারীর প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় এসে পৌছেছিলেন।

তিনি পাঠ্যজীবনে মুজাহিদে আযমের সহপাঠি ছিলেন এবং আজীবন হুযুরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন এবং অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমাদের কাছে অনেক সময় অত্যন্ত আবেগের সাথে বলতেন, "এ দেবতাতুল্য মানুষটির সাথে আমি ৭/৮ বছর বয়সে পাঠশালার জীবন থেকেই দেবতার মত চাল-চলন দেখে আসছি, একটুও পরিবর্তন দেখিনি। সেই ছোট বয়সে যেমন শান্ত-শিষ্ঠ, নম্র-ভদ্র, উদার, অমায়িক, মহৎপ্রাণ দেবতার মত ছিলেন, দেখলেই ভক্তিতে মাথানত হয়ে আসত, আজ সত্তর বছর বয়সের সময়ও আমি সেই একই রকম দেবতাতুল্য দেখছি। কত বয়স হয়েছে, কত বড় হয়েছেন, কত সুনাম, প্রতিভা, খ্যাতি কিন্তু একই রকম সর্বদা। জীবনে তাঁর আচরণে-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, চাল-চলনে মুগ্ধ হয়েছি, আভিভূত হয়েছি। তাঁর প্রতিটি ব্যবহারে আমি স্বর্গীয় স্বাদ অনুভব করেছি, অমৃত বৎ স্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি।" তিনি বলেন, মাওলানা সাহেবের বাড়ীতে আগমনের সংবাদ পেলেই বাড়ী হতে আমি তাঁর সান্নিধ্যে হাজির হয়েছি এবং এই মহাপুরুষ দেবতাটিকে প্রাণ ভরে দেখেছি। হাজার দেখেও তাকে দেখার স্বাদ মিটে নাই, তৃপ্তি হয়নি, তাঁর কাছ থেকে উঠে আসতে মন চায়নি। আর তিনি সেই পূর্বের মতই বরং তার চেয়েও বেশী সম্মানের সাথে, আদরের সাথে আমার কুশলাদী খুটে খুটে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং যত্নের সাথে নিজের বিছানার একেবারে কাছে ডেকে আদর করে বসিয়েছেন এবং অমৃতময় মধুমাখা বাণীর দ্বারা প্রাণ ঠান্ডা করে দিয়েছেন।" তিনি বলেন, "আমি হিন্দু মানুষ, কিন্তু এ লোকটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অন্য সমস্ত হিন্দুদের প্রতি, বড়দের প্রতি যতটুকু ছিল তার চেয়ে সহস্র গুণে এ লোকটির প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল যদিও বাল্যকালে তিন বছর একসাথে পড়েছি। তিনি যখন বাড়ীতে আসতেন বড় বড় মাওলানা পীর এবং লীডারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। কিন্তু আমরা যখন সামনে উপস্থিত হয়ে নমস্কার জানাতাম, তখন তিনি হাত তুলে প্রতি উত্তর জানিয়ে আসুন আসুন বলে একেবারে নিজের কাছে, নিজের খাছ বিছানায় নিয়ে বসাতেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আপন আত্মীয়ের মত কুশলাদি, দেশের অবস্থা, জনগণের অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি আমার একেবারে ছোটকালের সাথী শামছু, শামছু, কালু মিয়া, কালুমিয়া বলে আমরা ডাকতাম। কিন্তু এখন আমার একথা বলতে একটুও সঙ্কোচ বা দ্বিধা নেই যে, আমার এই ছোটবেলার সাথীটিকে আমি আমার আরাধ্য দেবতার আসনে বসাতে একটুও সঙ্কোচবোধ করি না বা আত্মমর্যাদা হানিকর বলে মনে করি না বরং তাকে যত বেশী সম্মান করতে

পারতাম ততই যেন অধিক তৃপ্তি পেতাম। এমন লোক বেশী বেশী সমাজে দেশে থাকলে আমরা সত্যিই সৌভাগ্যশালী হতে পারতাম।"

বরিশালের পথে স্বদেশ ত্যাগ

তৃতীয় শ্রেণী পড়া সমাপ্ত করে হুযুর চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াশুনার চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। নিকটে কোথাও চতুর্থ শ্রেণীর ভাল স্কুল না থাকায় হুযুরের পিতা বরিশাল জিলার নাজিরপুর থানাধীন সুটিয়াকাঠি স্কুলে হুযুরকে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলে পড়াশুনা ভাল হতো। ভাগ্যক্রমে নিকটে একটা লজিংও মিলে গেল। তিনি ভালভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। শিক্ষকদের দৃষ্টি হুযুরের প্রতি নিবদ্ধ হলো। এত মনোযোগী শান্ত-শিষ্ট ব্রেইনী তারা কোনদিন দেখেননি। সবাই আদর করতে লাগলেন, পরীক্ষা একটা হয়ে গেল, হুযুর পরীক্ষা পূর্ণ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করলেন। জয় জয়াকার পড়ে গেল।

এদিকে হুযুরের মনে আরবী পড়ার তীব্র আকাংখা পূর্ব থেকেই ছিল। বাড়ীতে থেকে আম্মা ভাবী ছাহেবা এবং ভগ্নিপতি আরশাদ মুন্সির কাছে কায়দায়ে বাগদাদী আমপারা এবং দোয়া দরূদ সব মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। নিজের চেষ্টায় খুতবা মিলিয়ে পড়তে চেষ্টা করতেন কিন্তু পারতেন না। সুটিয়াকাঠি স্কুলে এসে পিতার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে নিরিবিলি আবার আরবী পড়ায় মনোযোগ দিলেন। লজিং বাড়ীতেই মসজিদ ছিল, সেখানে নিয়মিত জামায়াতে নামায আদায় করতে লাগলেন। স্কুলের পড়া স্কুলেই মুখস্ত হয়ে যেত। লজিং এ অবসর সময় চিন্তা করতেন। কিভাবে কুরআন হাদীছ পড়া যায়। নিরিবিলি সময় মসজিদে ঢুকতেন এবং খুতবাটি নিয়ে ইমাম ছাহেবের জায়গায় বসে খুতবা মিলাতে চেষ্টা করতেন। কারণ বাড়ীতে আব্বার খুতবা শুনে শুনে প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অক্ষর মিলাতে কষ্ট হতো। বাড়ী কায়দা, আমপারা পড়েছেন কিন্তু খুতবার ছাপা অক্ষর আঁকা বাঁকা এজন্য কষ্ট হতো তাই কাঁদতেন এবং আরবী পড়ার চিন্তা-ভাবনা করতেন, মানুষের কাছে আরবী পড়ার কথা বলতেন।

ডুংকইর বাগানে কুরআন বুকে

সুটিয়াকাঠি পড়া অবস্থায় মাঝে মাঝে কুরআন শরীফ গলায় বেঁধে ডুংকইর বাগানে চলে যেতেন। বাগানের মাঝখানে নির্জন জায়গায় কুরআন শরীফকে চুমু খেতেন এবং বুকে লাগিয়ে অঝোরে কাঁদতেন এবং আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলতেন "আল্লাহ তোমার এই মহান পবিত্র কালামে পাক আমাকে বুঝতে দাও, জানতে দাও এবং ভালভাবে পড়ার সুযোগ দাও।" মাঝে মধ্যে কুরআন মজিদ বুকে জড়িয়ে ধরে, জমিনের উপর ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়তেন এবং প্রাণ খুলে

—৩

চিৎকার করে কাঁদতেন। মাঝে মধ্যে লোকে শুনে ফেলে নাকি এ জন্য চুপ করে যেতেন, আবার কান্না শুরু করতেন, সে কি করুণ কান্না! বিনীতভাবে কাকুতি মিনতির সাথে বুকে কুরআন নিয়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "আল্লাহ! দয়াময় তুমি আমাকে এলমে দ্বীন শিক্ষার সুযোগ করে দাও। তোমার এ পবিত্র কালাম আমাকে বুঝতে দাও, পড়তে দাও, জানতে দাও। এ কালামের অর্থ আমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে তাওফিক দাও। কুরআনের ভিতর যে মধুময় বাণী রয়েছে, তা আমাকে বুঝতে দাও, মানতে দাও। আমার আব্বা আমাকে আরবী পড়তে দিতে চায় না, তাকে বুঝ দাও। মাওলা, আমাকে তোমার কালামে পাকের অভিজ্ঞ করো।" এভাবে অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে, ক্লান্ত হয়ে আবার উঠে বসতেন এবং কুরআন পাককে গলায় ঝুলিয়ে লজিং বাড়িতে ফিরে আসতেন। সুটিয়াকাঠিতে কয়েক জনের কাছে একটু একটু কুরআন মাজীদ পড়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু কিভাবে যেন বিচক্ষণ পিতা জানতে পেরে আরবী পড়তে পত্রের মাধ্যমে নিষেধ করে, ধমকিয়ে সাবধান করে দিলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত

সুটিয়াকাঠি স্কুলে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত করলেন। চতুর্থ শ্রেণীর পড়া শেষ হয়ে শেষ ফাইনাল পরীক্ষাও হয়ে গেল। প্রতিটি পরীক্ষায় হুযুর অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে প্রথম হতেন। শেষ ফাইনাল পরীক্ষায়ও সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ নম্বর পেয়ে শিক্ষকদের চমৎকৃত করে দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। সবাই প্রশংসা করতে লাগলেন। হুযুর পিতার নিকট পত্র দ্বারা সংবাদ দিলেন পরীক্ষার ফল কেমন হয়েছে। কিন্তু তিনি পিতাকে জানালেন বরিশালের এই এলাকার পানি অত্যন্ত লবনাক্ত এজন্য এখানে আমার স্বাস্থ্য টিকে না। কাজেই পরবর্তী পড়াশুনার জন্য অন্য কোথাও গেলে ভাল হয়। হুযুরের পিতা ছেলেকে সুটিয়াকাঠি থেকে বাড়ীতে নিয়ে আসলেন এবং কয়েক দিন বাড়ীতে থেকে শরীর ঠিক করার ব্যবস্থা করলেন।

জ্যামিতি ও ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন

বাড়ীতে অবস্থানকালে হুযুরের পিতা দাউদকান্দির (শ্রীরামকান্দির) প্রবীণ শিক্ষাবিদ শরীফ শামছুদ্দিন ছাহেবের কাছে গিমাডাঙ্গা স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসলেন। শরীফ ছাহেব গিমাডাঙ্গায় পড়াতেন। শরীফ ছাহেবের কাছে হুযুর প্রাইভেটভাবে পড়াশুনা শুরু করেন এবং তার কাছে জিওমেট্রি ও ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন করতে লেগে যান। অল্পদিনের মধ্যে হুযুর এ দুটি বিষয়ে যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু শরীফ ছাহেব হঠাৎ গিমাডাঙ্গা স্কুল থেকে চলে গেলেন। সাথে সাথে হুযুরের পড়াশুনাও বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ীতে বসে চিন্তা ভাবনা করতে

লাগলেন কিভাবে কোথায় কার কাছে সামনের পড়াশুনা করা যায়। হুযুরের পিতাও ছেলের পড়ার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি করবেন, কোথায় পড়াবেন চিন্তা করতে লাগলেন। শরীফ শামছুদ্দিন ছাহেব গিমাডাঙ্গা স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে কলিকাতা যাবেন স্থির করলেন। হুযুরের পিতা শরীফ ছাহেবের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, শরীফ ছাহেব কলিকাতা যাওয়ার সময় শামছুল হককে সাথে করে নিয়ে যাবেন এবং পথে নোয়াপাড়ায় কোন ভাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিয়ে যাবেন। কথামত হুযুর শরীফ ছাহেবের সাথে রওয়ানা দিলেন এবং সাথে নোয়াপাড়ার সবচেয়ে ভাল স্কুল ভাগুটিয়ায় শরীফ ছাহেব হুযুরকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিয়ে কলিকাতা চলে গেলেন।

আরেফ বিল্লাহর ভূমিকায়

(১) তখন গিমাডাঙ্গায় শরীফ শামছুদ্দীন ছাহেবের কাছে পড়েন। হুযুর সবেমাত্র চতুর্থ শ্রেণীতে পাশ করে বেরিয়েছেন। এ সময় হযরত ছদর ছাহেব রিয়াজাত মুজাহাদা এবং রাত্র জাগরণ করে ইবাদত-বন্দেগী এবং যিকির-আযকার ও রোনাজারী-কান্নাকাটি করতেন। এ দেখেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল এ মানুষটি যে সে মানুষ নয়, এযে আল্লাহর পাগল, আল্লাহর আশেক আরিফ বিল্লাহ। ঐ সময় তিনি জনাব মরহুম মাওলানা ইদ্রিস ছাহেব বড় মাওলানা ছাহেবদের নিরিবিলি কাচারীতে রাত্র যাপন করে পড়াশুনা এবং রিয়াজাত মুজাহাদা ইবাদত বন্দেগী করতেন। ঐ সময় বড় আলেম এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে বড় মাওলানা ছাহেবের তুলনা ছিল না। বড় মাওলানা ছাহেব হুযুরকে খুব ভালবাসতেন এবং সাথে সাথে রাখতে ভালবাসতেন। এজন্য হুযুর এই বুযুর্গের কাচারীতে তাঁর ছুহবতে থাকতেন। গভীর রাত্র পর্যন্ত পড়াশুনা করে সামান্য কিছু সময় ঘুমিয়ে উঠে যেতেন এবং সারারাত্র নামায ও যিকির-আযকারে কাটিয়ে দিতেন। আশেপাশের এবং বাড়ীর লোকজন এ রকম ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার এবং কান্নাকাটি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত এবং সবাই পঞ্চমুখে হুযুরের প্রশংসা করত। বড় মাওলানা ছাহেব গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন এবং আল্লাহর দরবারে হুযুরের জন্য দোয়া করতেন কিন্তু বাহিরে কিছুই বলতেন না বা প্রকাশ করতেন না। মনে মনে ভাবতেন এত ছোট মাছুম বাচ্চা আল্লাহর গায়েবী মদদ এবং ইশারা ছাড়া এরকম ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, কান্নাকাটি সাধারণ মানুষের জন্য সম্ভব নয়। একদিন বড় মাওলানা ছাহেবের জনৈক বৃদ্ধ ভাই রাত্রে উঠে হুযুরকে কান্নাকাটি করতে দেখে প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং পরে রশিকতা করে হুযুরকে উদ্দেশ্য করে বলল, ও মিয়া আব্দুল্লাহ মুন্সি সাহেবের পুত্র, মিয়া এখন একটু ঘুমাও তোমার ডাক শুনার জন্য তো আল্লাহর খেয়ে কাজ নেই, তোমার ডাক শুনার জন্য আল্লাহ

তো কাচারীর দরজায় এসে হাজির হয়ে যাবে। যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী করেছেন তাই ভাল, বাবা আর ডাকার কাজ নেই। এখন রাত্র দুটো বাজে এখন একটু ঘুমিয়ে নাও। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। হুযুরের এদিকে মোটেই লক্ষ্য নেই, তিনি আল্লাহর কাছে রোনাজারী করে কেঁদে চলেছেন তো চলেছেনই। অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নেই, মাওলার পাগল, মাওলার ধ্যানে গভীরভাবে মগ্ন রয়েছেন। সকাল বেলা অন্য লোকের থেকে ভাইয়ের এই রশিকতার কথা বড় মাওলানা ছাহেবের গোচরীভূত হলে ক্রোধে ঐ ভাইয়ের উপর গর্জে উঠলেন এবং তাকে ডাকায়ে কঠোরভাবে ভৎর্সনা করে তওবা ইস্তেগফার করার হুকুম দিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কঠোরভাবে ঐরূপ গোনাহের কাজ না করার জন্য সাবধান করে দিলেন। হুযুর এসব ব্যাপারে কোন খবরই রাখলেন না। আরিফ বিল্লাহ আপন কাজে ব্যাপৃত থাকলেন। কে কি বলে সেদিকে কোন খেয়াল করলেন না।

(২) খাদেমুল ইনছান

ঐ সময়কার আর একটি ঘটনা। হুযুর নিজ মুখে আমাদের কাছে বলেছেন। তিনি বলেন, "ছোটকালে একবার আমাদের গ্রামে বর্ষাকালে একজন অচল প্রায় ভিক্ষুক একটা ভাংগা নৌকায় ভিক্ষা করতে এসেছিল। তার নৌকাটি পুকুরের পার্শ্বে রেখে গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়েছিল। এদিকে দুষ্টু ছেলেরা গোসল করার সময় ভিক্ষুকের নৌকাটা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল, কোথায় ডুবিয়েছিল তাও ভিক্ষুক বেচারার জানা ছিল না। সন্ধ্যা বেলা ভিক্ষা করে পুকুর ঘাটে এসে দেখেন যে, তার নৌকাটি নেই। তখন ঐ বৃদ্ধ ভিক্ষুকটিও অঝোরে কাদছিল। হুযুর বলেন, আমি তখন ছোট ছিলাম তবুও পানিতে নেমে অনেক খোজাখুজি করে ভিক্ষুককে নৌকাটি উঠিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ ভিক্ষুকটিও আমার মাথায় হাত রেখে অনেক দোয়া দিয়েছিল। আমার মনে হয়, ঐ ভিক্ষুকের দোয়াও আল্লাহ কবুল করেছিলেন।

পিতা-পুত্রের আজব জিহাদ

মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এবং তাঁর সম্মানিত আব্বাজান মরহুম মুন্সি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ছাহেব। পিতা-পুত্র দু'জনের শরীরেই জেহাদী রক্তধারা প্রবাহিত। উভয়ই স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী। উভয়ই আল্লাহর জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ। দুজনের চিন্তাধারাই ইংরেজ বিরোধী। উভয়ই চাইতেন জীবনের বিনিময় হলেও ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াতে হবে, স্বাধীন ইসলামিক ষ্টেট এদেশে কায়েম করতে হবে। কিন্তু পিতা-পুত্রের চিন্তাধারায় বিভিন্নতা কেন? আসলে মৌলিকভাবে চিন্তাধারায় কোন পার্থক্য ছিল না। চিন্তাধারায় শুধু ব্যবধান বা জিহাদ বা সংগ্রাম ছিল শুধু একটি জায়গায়। আর

এজন্যই অনেকে ভুলবশতঃ হুযুরের মরহুম পিতাকে হুযুরের ইসলামী শিক্ষার বিরোধী বলে মনে করে থাকেন এবং বলে থাকেন যে, হুযুরের মরহুম আব্বাজান হুযুরকে ইসলামী শিক্ষা দিতে চাননি। আসলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টা ছিল। কারণ হুযুরের পিতা এবং তাঁর পূর্ব পুরুষরা চিরকাল ইসলামের দাওয়াতের কাজ চালিয়ে এসেছেন এবং তিনি সর্বদাই এ কাজে লিপ্ত ছিলেন। কাজেই তিনি কিছুতেই ইসলামী শিক্ষার বিরোধীতা করতে পারেন না, কোনদিন বিরোধীতা করেননি। তিনি শুধু এতটুকু চিন্তা করতেন যে, আমরা ইসলামের মুজাহিদ, ইসলাম, কুরআন, হাদীছ আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে এবং এদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে ইংরেজ এদেশে মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। কাজেই তাদের আখড়া সমূলে ধ্বংস করতে হলে প্রথমে ইংরেজী বিদ্যা শিখে ইংরেজদের হাড়ে-নাড়ের সন্ধান নিয়ে তাদের সাথে যথেষ্ট ফাইট করে তাদেরকে পরাজিত করতে হবে। এজন্য প্রথমে ইংরেজী তথা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে তাদের সাথে সংগ্রামে যোগ্যতা অর্জন করে পরে ঘরের দৌলত ইসলামতো আছে, সেটাকে শিখে ইংরেজ তাড়িয়ে এদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে হবে। এজন্য আগে ইংরেজী বিদ্যা শিখতে হবে তা না হলে ইংরেজদের সংগে যুদ্ধ করে পারবো না। এজন্য নিজের ছেলেকে প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা ভালভাবে দিতে চেয়েছেন। এই শিক্ষার ক্ষতি হলে জেহাদের যোগ্যতা কমে যাবে। এজন্য এই পড়ার সময় অন্য কোন শিক্ষা তিনি পুত্রকে দিতে নারাজ ছিলেন এবং পরে ঘরের দৌলত ইসলামী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, ইসলামী শিক্ষার বিরোধী তিনি কোনদিনই ছিলেন না বরং তার এবং বংশের লোকের জীবনই ত ইসলামী শিক্ষার জন্য উৎসর্গকৃত, শুধু আগে পরের ব্যবধান। এটাই ছিল তার চিন্তাধারা। এটা যে একেবারে ভুল ছিল এ কথা কিছুতেই, কোন প্রকারেই বলা যায় না।

অন্যদিকে হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের চিন্তাধারা ছিল, সর্ব প্রথমেই আমার কুরআন, হাদীছের গভীর জ্ঞান জীবনের বিনিময়ে হলেও শিখতে হবে। পরে প্রয়োজনীয় বিদ্যা যা দরকার হয় শিখা যাবে। এজন্য তিনি সর্বদা পিতার অগোচরে সেদিকে ধাবিত হতেন। এটা পিতা-পুত্রের চিন্তাধারার পার্থক্যের ফল, এখতেলাফও নয়, মতবিরোধও নয়, বিরোধ তো নয়ই। এজন্য আমরা এ মতপার্থক্যটা ইজতেহাদী জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছি। অবশ্য এই মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হুযুর কোনদিন পিতার হুকুম অমান্য করে নিজের রায়ের উপর চলেননি। সর্বদা পিতা যে হুকুম করেছেন তাই পালন করেছেন, সাথে সাথে প্রাইভেটভাবে গোপনে কুরআন, হাদীছের শিক্ষা পাকাভাবে শিখতে চেয়েছেন। কারণ তিনি মনে করতেন পিতার হুকুম পালন করতে করতে যদি তার মৃত এসে

যায় তবে এলমে দ্বীন শিক্ষা করা যে আল্লাহর হুকুম তা লংঘন হবে এবং আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন। এজন্য গোপনে সে ফরয হুকুমটাও পালন করতে চাইতেন। এতটুকুই পিতা-পুত্রের জিহাদের মূল কথা। অনেকে ভুল বুঝাবুঝির স্বীকার হতে পারে এজন্যই কয়টি কথা লিখে দিলাম।

ভাগুটিয়া হাই স্কুলের দু'টি বছর

এবার আমরা আবার হুযুরের শিক্ষা জীবনের আলোচনায় ফিরে আসছি। চতুর্থ শ্রেণী এবং এর সাথে শরীফ শামছুদ্দীন ছাহেবের কাছে ফার্সী ও জিওমেট্রী শিক্ষার পর শরীফ ছাহেব কলিকাতা যাওয়ার পথে নোয়াপাড়ার সু-প্রসিদ্ধ ভাগুটিয়া হাইস্কুলে হুযুরকে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিয়ে কলিকাতা গমন করেন। এদিকে হুযুর ভাগুটি হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন। লজিংও একটা মিলে গেল।

ভাগুটিয়া হাই স্কুলটি খুব নামকরা ছিল। ৫/৬ শত ছাত্র এবং ২০/২৫ জন যোগ্য শিক্ষক ছিলেন। মনোরম জায়গায় স্কুলটির অবস্থান ছিল। কিন্তু আশেপাশে কোন মুসলমান বসতি ছিল না। এজন্য অনেক কষ্ট করে লজিং ঠিক করতে হয়েছে। স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে সবই হিন্দু ছিল শুধুমাত্র শমসের আলী নামে আর একজন ছাত্রই মুসলমান ছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষকই মুসলমান ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শামছুল হক ছাহেব ব্যতীত সমস্ত স্কুলের মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষক এবং একজন ছাত্রই কেবলমাত্র মুসলমান ছিল। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ঐ ছাত্রটি না পুরা ছাত্র ছিল না মুসলমান। শমসের আলী পড়াশুনাতো করতই না, ধর্ম কর্মতেও তার কোনই মনোযোগ ছিল না। আর যিনি মুসলমান শিক্ষক ছিলেন তিনি শমসের আলীর থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না। কোনদিন তিনি নামায কালামে ভুলেও যোগদান করতেন না। যিনি অন্য ছেলেকে ভাল হতে, নামায পড়তে বলবেন তা না করে ছদর ছাহেব অনেক সময় তাকে ধর্মের কথা, নামাযের কথা বললে বিরক্তি বোধ করতেন, শমসের ঐ শিক্ষকের যোগ্য ছাত্র ছিল। অধিকন্তু শিক্ষক ছাহেব তো পড়াশুনা মোটামুটি জানতেন কিন্তু ছাত্র শমসের আলী পড়াশুনার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন ছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় খুব উঁচু দরজার শিক্ষিত এবং মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছদর ছাহেব হুযুরকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হন এবং সন্তান বৎ স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। হুযুর নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। প্রথম পরীক্ষায়ই হুযুর ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বরসহ সমস্ত স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করেন। শিক্ষক ছাত্রগণ সবার দৃষ্টি হুযুরের প্রতি পতিত হয়। সবাই হুযুরকে বেশ সমীহ করে চলতেন। শিক্ষকগণ সবাই হুযুরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। হুযুর নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন। টিফিনের সময় হিন্দু

শিক্ষকগণ হুযুরকে নামাযের কথা মনে করিয়ে দিতেন এবং নামায পড়তে যেতে বলতেন। কিন্তু মুসলমান শিক্ষকটি কোন দিন নামাযের কথা বলেননি বরং হুযুর বললে তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। একে একে মাস দিন অতিবাহিত হয়ে বছর শেষ হলো, ফাইনাল পরীক্ষা হলো, হুযুর পূর্ববৎ প্রথম স্থান অধিকার করে স্কুলের মধ্যেও সবচেয়ে বেশী নম্বর পেলেন। দ্বিতীয় বছর হুযুর ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠলেন দ্বিতীয় বছরের শেষ পরীক্ষা হুযুর পূর্ববৎ কৃতকার্য হলেন।

জাতীয় ইউনিফর্মের জীবন্ত প্রদর্শনী

ষষ্ঠ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা যখন নিকটবর্তী তখন তিনি একদিন বসে বসে চিন্তা করলেন যে, আমিতো মুসলমান আর এ স্কুলের সমস্ত ছাত্র শিক্ষক হিন্দু। তারা তাদের জাতীয় পোষাক ধুতি পরিধান করে স্কুলে আসে, আমি কেন ধুতি পরিধান করবো? আমারও তো জাতীয় পোষাক রয়েছে। কাজেই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে, পরীক্ষার পর ১৯১৬ সনের পহেলা জানুয়ারী থেকে আমি আমার মুসলিম জাতীয় ইউনিফর্ম, জাতীয় পোষাক পরিধান করে স্কুলে যাব। অন্য কোন জাতীর পোযাক আর পরিধান করবো না। হুযুরের কাছে তখন পোষাক হিসেবে ধুতি ও কোট ছিল। কাজেই প্রতিজ্ঞা মোতাবেক ১লা জানুয়ারী তিনি ধুতিটি দু'ভাজ করে লুঙ্গি বানিয়ে পরিধান করলেন এবং কোটটিকে গায়ে দিয়ে নিজের হাতের সেলাই করা টুপি মাথায় দিয়ে নুতন বেশে স্কুলে হাজির হলেন। স্কুলের ছাত্র শিক্ষকগণ হুযুরের এই নুতন বেশ দেখে হাসিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ প্রকাশ্যে কিছুই বলতে সাহস পেল না। ভাল ছাত্র হওয়ার কারণে ছাত্র শিক্ষক সবাই হুযুরকে একটু সমীহ করে চলতো এবং সম্মান দিত। সেদিন থেকে হুযুর জীবনে আর কোনদিন বিজাতীয় পোষাক পরিধান করেননি। লোকে কি বলবে এদিকে তিনি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করতেন না। জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখতে তিনি সব ধরনের কষ্টকে হাসি মুখে বরদাশ্ত করে নিতেন। জাতীয় স্বাতন্ত্রতা বোধ যে জাতির মধ্যে জাগ্রত নেই সে জাতি মিটে যায়, জগতের বুক থেকে মিটে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জাতীয় ইউনিফর্ম, কৃষ্টি, কালচার, তাহজীব-তমদ্দুন জাতীকে বাঁচিয়ে রাখে। হুযুরের বয়স তখন সবেমাত্র দশ বছর। এত ছোট বয়সে শত শত হিন্দু ভাইদের মাঝে একা একা জাতীয় ইউনিফর্মের নির্ভীক প্রদর্শনী বড় বুকের পাটায় জোর থাকলে দশ বছরের বালকের দ্বারাও সম্ভব একথা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা করা দরকার। একেই বলে ঈমান।

বিশ্বস্ততায় আল আমিনী অনুকরণ

ভাগুটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই বছরের মধ্যে হুযুরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্র, শিক্ষক, এলাকার মানুষ সবাই হুযুরকে

অত্যন্ত সম্মান ও সমীহ করে চলতো। অনেক জ্ঞানী, হিন্দু গার্জীয়ান ছাত্রদের কাছে হুযুরের প্রশংসা শুনে নিজেরাই এ সোনা চাঁদ রত্নটিকে এক নজর দেখার জন্য স্কুলে হাজির হতেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকও হিন্দু ছিলেন। কিন্তু ছাত্র শামছুল হকের অমায়িক উদার নৈতিকতায় ভরপুর, স্বর্গীয় ব্যবহারে এবং নিয়মানুবর্তিতা, একনিষ্ঠতা, গুরুমান্যতা এবং মার্জিত রুচীসম্পন্ন আচরণে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ছাত্র শিক্ষকদের সমাবেশে সবসময় তিনি হুযুরের উদাহরণ পেশ করে সকলকে তাঁর মত হতে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী হুযুরকে ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন এবং গুরুজনের মত সমীহ করতেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার কিছু দিন পূর্বে ছাত্র শিক্ষকদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "আমি আমার শামছুল হককে এত অধিক বিশ্বাস করি এবং তার উপর এত অগাধ আস্থা রাখি যে, পরীক্ষার এক সপ্তাহ পূর্বে আমি সমস্ত প্রশ্নপত্র শামছুল হকের কাছে দিয়ে দিতে পারি এবং আমার তাঁর উপর এ বিশ্বাস আছে যে, সে ভুলেও কোন সময় ঐ প্রশ্ন দেখবে না। তাঁর প্রতি আমার এতই বিশ্বাস।" বিজাতীয় শিক্ষকের এ মহান সাক্ষ্য যে, বিশ্ব আলামীন, বিশ্বনবী (ছাঃ)–এর যোগ্য উম্মতেরই যোগ্য অনুসরণের জলন্ত সাক্ষ্য বহন করে।

ভাগুটিয়ার জঙ্গলে হেরার জ্যোতির প্রভাব

ভাগুটিয়া স্কুলে অবস্থানকালে মুজাহিদে আযম, আল্লাহর প্রেমিক মাঝে মধ্যে কুরআন মজিদ গলায় বেঁধে নিকটবর্তী জঙ্গলে চলে যেতেন এবং নিরিবিলি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতেন। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর, আল্লাহ আমাকে সৎ পথের সন্ধান দাও! দয়াময়, আমার ইহলৌকিক-পরলৌকিক উন্নতি দান কর, তোমার মহব্বত আমার অন্তরে ঢেলে দাও। কুরআন মজিদ বুকে আকড়ে ধরে, চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকতেন, তার করুণা ভিক্ষা করতেন। অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে দিশেহারা, বিহ্বল হয়ে পড়তেন। কেঁদে কেঁদে বলতেন "দয়াল মাবুদ! এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় থেকে তোমাকে যেন না ভুলি। তোমার এই পবিত্র কালাম আমাকে পড়তে দাও, জানতে দাও, বুঝতে দাও। এ কুরআনের মর্মবাণী আমাকে হৃদয়ঙ্গম করার তাওফীক দাও। কুরআনের ভালবাসা আমাকে দান করো। কুরআন মত যেন আমি জীবন গঠন করতে পারি। আমার উপর তোমার করুণা বর্ষণ করো, রহমত দান কর, এ কুরআন প্রচার করতে আমাকে তাওফিক দাও, শক্তি দাও, হিম্মত দাও।" এইভাবে অনেক কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসতেন এবং ধীরে ধীরে লজিং এর পথে পা বাড়াতেন। এই অবস্থা প্রায়ই ঘটত। সর্বদা কুরআন পড়ার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। স্কুলের পড়াতো সাথে সাথেই মুখস্থ হয়ে যেত বাকী সময়ে ইসলামী শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা এবং চেষ্টায় রত থাকতেন।

গোপনে আরবী পড়ায় লিপ্ত হলেন

নোয়াপাড়া ভাগুটিয়া স্কুলে পড়ার সময় হুযুর খুব নিরিবিলি শান্তিতে সময় অতিবাহিত করছিলেন। লজিংও ভাল ছিল। লজিং-এ থেকে স্কুলের পড়াশুনা ঠিকমত করতেন। এজন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো না। অবসর সময় আরবী পড়ার চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং লজিং বাড়ী থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে নোয়াপাড়ার বিখ্যাত আলেম বুযুর্গ মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম ছাহেবের নিকট আরবী পড়ার ব্যবস্থা করে নিলেন। তাঁর কাছে হুযুর মিযান ও অন্যান্য কিতাব পড়া শুরু করলেন। পড়াশুনার দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। স্কুল থেকে ছুটির পরে লজিং-এ এসেই কিছু খেয়ে সাড়ে তিন মাইল দূরে মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ছাহেবের কাছে চলে যেতেন এবং পড়াশুনা করতেন। লজিং বাড়ীতে কোনদিন খানা পাক হতে দেরী হলে হুযুর না খেয়েই মাওলানা মোহাম্মাদ কাছেম ছাহেবের কাছে চলে যেতেন, খানার জন্য দেরী করতেন না। মাওলানা কাছেম ছাহেবকে হুযুর খুব ভক্তি করতেন এবং সর্বদা তাঁর খেদমত করতেন। ছবক শেষ করে তিনি হুযুরের পানি এনে দিতেন, কাপড় ধুইয়ে দিতেন। জমি কুপিয়ে মরিচ, বেগুনের গাছ লাগিয়ে দিতেন, গাছে পানি দিতেন। এভাবে উস্তাদের সার্বিক খেদমত করে উস্তাদের মন জয় করেন। মাওলানা কাছেম ছাহেবও হুযুরের জেহেন-জাকাওত, বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্মমেধা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হুযুরকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন, দোয়া করতেন এবং গভীর আগ্রহের সাথে পড়াতেন। পড়ার উন্নতি হতে লাগল। অল্পদিনে মিযান ও অন্যান্য কিতাব প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেল। রাত-দিন হুযুর কিতাবের ফিকিরেই কাটাতেন এবং কিভাবে আলেম হওয়া যায়, কুরআন হাদীছ পড়া যায় সে চিন্তা করতে লাগলেন। এ সময়টাকে তিনি গণিমত মনে করে চেষ্টা করতে লেগে গেলেন। এদিকে বিধি বুঝি বাম হলো। হুযুরের আরবী পড়ার খবর হুযুরের বিশিষ্ট হিতাকাংখী মৌলবী ইসমাঈল ছাহেবের কাছে হুযুরের আব্বা জানতে পারলেন। ইসমাইল ছাহেব বাড়ীতে গিয়ে হুযুরের পিতার কাছে বললেন যে, আপনিতো শামছুল হককে ইংরেজী পড়াতে ব্যস্ত, আর সে দেখি ওদিকে নোয়াপাড়ার মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ছাহেবের নিকট আরবী পড়তে আরম্ভ করেছে। একথা শোনার পর হুযুরের পিতা রাগে আর স্থির থাকতে পারলেন না। সাথে সাথে মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ছাহেবের কাছে পত্র লিখে হুযুরকে আরবী পড়াতে নিষেধ করে দিলেন এবং হুযুরকে লিখে জানালেন "তাড়াতাড়ি আরবী পড়া বন্ধ করে ভালভাবে ইংরেজী পড়ায় মন দাও।" বারবার তোমাকে আরবী পড়তে নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন আবার আরবী পড়তে লেগেছো। এটা তোমার মহা অপরাধ। আমার পত্র পাঠ করে আরবী পড়া বন্ধ না করলে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব এবং প্রয়োজন হলে তোমাকে ত্যাজ্য পুত্রও করতে পারি। কাজেই

এখন থেকে সাবধান হয়ে যা পড়তে বলি তা ঠিকভাবে পড়তে লেগে যাও। এ পত্র পাওয়ার পর জনাব মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ছাহেব হুযুরকে দুঃখের সাথে পড়াতে অস্বীকার করলেন এবং বলে দিলেন, "বাবা তোমার আব্বা যখন পড়াতে নিষেধ করে আমাকে পত্র দিয়েছেন, কাজেই এখন আর আমি তোমাকে পড়াতে পারি না।" একথা শুনে হুযুর মনে বড় ব্যথা পেলেন, মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কি করবেন, একদিকে দূর্দান্ত পিতা যা বলবেন তাই করবেন, অন্যদিকে এলমে দ্বীন কি করা যায়? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে লজিং-এ গেলেন। এদিকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার ফলও প্রকাশ হলো। হুযুর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফার্স্ট হলেন এবং সমস্ত স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেলেন। অবশেষে নানা চিন্তা-ভাবনা করে কলিকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন।

কলিকাতার পথে মুজাহিদে আযম

পিতার হুশিয়ারী চিঠি, উস্তাদের আরবী পড়াতে অস্বীকৃতি ইত্যাদি কারণে অবশেষে হুযুর কলিকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মনে মনে খেয়াল প্রথমে শরীফ শামছুদ্দীন ছাহেবের বাসায় যাবেন। যদি বাসা খুঁজে না পান, কলিকাতায় কোথাও আরবী পড়তে শুরু করবেন। এই চিন্তা করে সামান্য আসবাবপত্র নিয়ে অজানা পথে ট্রেনে উঠলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ অতি সামান্য, তদুপরি প্রবল অর্থ কষ্ট, নানা চিন্তা-ভাবনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক অজানা পথে ছুটে চললেন। বাহ্যিক চিন্তা, পেরেশানী এবং অর্থাভাব থাকলেও অন্তরে ছিল এক গভীর প্রশান্তি, অনাবিল সুখ। সবকিছুই যেন তার কাছে সহজ বলে মনে হচ্ছিল। যথা সময় ট্রেন শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে থামল। তিনি ট্রেন থেকে অবতরণ করলেন। এখন কোথায় যাবেন? কোন দিকে রওয়ানা হবেন? কি করবেন? সবকিছুই যে অজানা অচেনা। স্থির করলেন সর্ব প্রথমে শরীফ ছাহেবের বাসায় যাবেন। কিন্তু কোথায় শরীফ ছাহেবের বাসা? তার মুখে শুনেছেন ৭নং হায়াত খান লেনে। কিন্তু কোথায় সেই ৭নং হায়াত খাঁন লেন? কলিকাতা বিশাল শহর। সারিবদ্ধভাবে বড় বড় ৫/৬ তলা বিল্ডিং। সব একই রকম দেখতে, হাজার হাজার লোক পথ ধরে চলছে, কত শত গাড়ী বাস, রিকসা, মোটর কার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন- ৭নং হায়াত খান লেন কোন এলাকায়? কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। নানা রকম চিন্তা বিজড়িত থেকেও মনের মধ্যে কোন প্রকার ভয় বা পেরেশানী নেই। চলছেন তো সামনের দিকে চলেছেনই। হঠাৎ করে সামনের দিকে নজর ফেলতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলেন হায়াত খান লেন। খুশীতে মনটা ভরে গেল। অকুলে যেন কুল পেলেন। সামনে আরও অগ্রসর হতে লাগলেন। বেশী দূর আর অগ্রসর হতে হলো না। সামনেই শরীফ শামছুদ্দীন ছাহেবের সাথে দেখা হয়ে গেল। সাথে বড়বাড়ীয়া

নিবাসী মৌঃ মোহাম্মদ আব্দুল করীম ছাহেবকে দেখতে পেলেন। মনটা আশ্বস্ত হলো।

তাঁরা দু'জনই বিস্মিত কণ্ঠে এক সংগে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোত্থেকে এসেছ তুমি? পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো? উত্তরে তিনি বললেন, না পথে কোন অসুবিধা হয়নি, আজ আমি নোয়াপাড়া থেকে এসেছি। ভাগুটিয়া স্কুলে আর পড়বো না বলে চলে এলাম। তাঁরা বললেন, তবে কোথায় পড়বে? জওয়াবে হুযুর বললেন, "আপনারা এখন যেখানে আমার জন্য ভাল মনে করবেন, আমি সেখানেই পড়বো।" অতঃপর দুজনেই অত্যন্ত আদরের সাথে হুযুরকে বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে কয়েক দিন নির্বিঘ্নে অবস্থান করার পর অনেক পরামর্শ করে তারা হুযুরকে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থাও আপাততঃ হয়ে গেল।

পড়াশুনার এক নুতন দিগন্ত

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্শিয়ান বিভাগ অত্যন্ত রিজার্ভ। সাধারণ ছেলেদের এখানে ভর্তি করা হয় না। সমস্ত বিষয় ইংরেজীর মাধ্যমে পড়তে হয়। বড় বড় ওছীলার মাধ্যমেও এখানে ভর্তি হওয়া যায় না। জাদরেল প্রিন্সিপ্যাল। নিজেই ভর্তির ইন্টারভিউ পরীক্ষা নেন। কারো সুপারিশ এ্যালাউ করেন না। হুযুর একাকীই ইন্টারভিউর জন্য প্রিন্সিপ্যালের কক্ষে হাজির হলেন। বুকের মধ্যে দুরু দুরু করছে, না জানি কি সব প্রশ্ন করেন। কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে কোনভাবেই হউক ভর্তি তার হতে হবে। যা কিছু প্রশ্ন করুক মানুষতো, কাজেই ভয় করলে চলবে না, মনে মনে এ হিম্মত বেঁধে প্রিন্সিপ্যালের সামনে দাঁড়ালেন। কিন্ত এ কি! প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব তার দিকে গভীরভাবে কয়েকবার তাকিয়ে যেন কি দেখলেন? সামান্য দুই একটি প্রশ্ন করেই ভর্তির হুকুম দিয়ে দিলেন। যেন এক অলৌকিক প্রভাবে সব কাজ হয়ে গেল। কোন প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি হলো না। পড়াশুনা রীতিমত শুরু হয়ে গেল। এখানে হুযুরের প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা ছিল। কারণ সমস্ত সাবজেক্টগুলোই ইংরেজীর মাধ্যমে পড়ানো হতো। শিক্ষকগণও সবাই ইংরেজীতে লেকচার দিতেন, বাংলা এক শব্দও ব্যবহার করতেন না, শুধু বাংলা সাহিত্য ব্যতীত। প্রথম দিক কিছুদিন একটু অসুবিধা হলেও সেটা সাময়িক। গভীর মনোযোগের সাথে শিক্ষকদের লেকচার শ্রবণ করে কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হয়ে গেল। হুযুর খুব উৎসাহের সাথে পড়াশুনা করতে লাগলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত শিক্ষকদের সু-দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন। প্রথম সাময়িকী পরীক্ষা হয়ে গেল। হুযুর সব শিক্ষকদের অবাক করে দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করলেন যা বাংলা ভাষাভাষী

ছাত্রদের জন্য দুর্লভ বস্তু ছিল। কারণ তখন ঐ বিভাগে শুধুমাত্র অপর একজন বাংগালী ছাত্র ছিলেন। উক্ত ছাত্রটির নাম ছিল জনাব আব্দুল জব্বার ছাহেব, কুমিল্লা জেলায় বাড়ী। তিনি অষ্টম শ্রেণীতে হুযুরের সাথী ছিলেন। আঃ জব্বার ছাহেব হুযুরের সাথী এই সংবাদ পেয়ে আমি ১৩/১০/৭৯ ইং ২১শে জিলকদ ২৬ শে আশ্বিন সকাল ১১ ঘটিকায় তার ছেলের বাসা মিটফোর্ট হসপিটালে যাই এবং তাঁর কাছে হুযুরের ঐ জামানার অনেক কথা জানতে পারি। তার বয়স ঐ সময় ৮৫ বছর। কথা খুব স্পষ্ট ছিল না। বাধো বাধো ভাবে তিনি যে কয়টি কথা বলেছিলেন নিম্নে অবিকল তা উদ্ধৃত করা হলো-

সাথী আব্দুল জব্বার ছাহেবের রিপোর্ট

হুযুরের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর কলিকাতার এ্যাংলে পার্শিয়ান বিভাগের সাথী কুমিল্লা নিবাসী জনাব আব্দুর জব্বার ছাহেব। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজেও হুযুরের সাথে ভর্তি হন এবং পাশ করে বড় চাকুরী করতেন। পাকিস্তান আমলে রিটায়ার্ড করেন। বর্তমানে ছেলের মিটফোর্টের বাসায় বসবাস করছেন। তাঁর ছেলে ডাঃ দোহা ছাহেব, ঐ সময় ৭৯ সালে মিটফোর্টের আর, পি, ছিলেন। জনাব আব্দুল জব্বার ছাহেব বলেনঃ "আমি জীবনে হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের মত ধীর গম্ভীর, শান্ত, চিন্তাশীল মানুষের সাক্ষাৎ পাইনি। আমি যে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলে পার্শিয়ান বিভাগের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র, ঐ সময় অন্য কোন বাংগালী ছাত্র ঐ বিভাগে ছিল না এবং বাংগালীদের সাধারণতঃ ঐ বিভাগে ভর্তির সুযোগও দেয়া হতো না। অনেক যোগ্যতা এবং ওছীলার প্রয়োজন হতো। ঐ সময় কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন H. H. Harley sahib এইচ, এইচ, হার্লি ছাহেব। মাওলানা শামছুল হক ছাহেব যখন ভর্তির জন্য প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য একাকী অগ্রসর হলেন, তখন দারোয়ান তাকে ভিতরে ঢুকতে বাঁধা দান করে। আমি তখন অগ্রসর হয়ে তাঁকে নিয়ে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করি। ভর্তির কথা বললে প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে প্রায় বিনা ইন্টারভিউতে তাঁকে ভর্তি করে নেন। জনাব আব্দুল জব্বার ছাহেব বলেন, "মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের চেহারায় কি এক আকর্ষণ ছিল জানি না। কিন্তু তাকে কোন কাজে কেউ বাধা প্রদান করতে সাহসী হতো না। তিনি বলেন, আমার সংগে আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গেলাম। আমার বড় ভাই আব্দুস সামাদ হোসাইন ছাহেব তাঁকে দেখে এবং তাঁর কথাবার্তা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে হোষ্টেল থেকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে জোর করে লজিং রেখেছিলেন এবং বললেন, "এ নিষ্পাপ ওলী আল্লাহকে ছাড়া উচিৎ নয়।" এরপর বরাবরই তিনি আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। তিনি ক্লাসে

সবসময় প্রথম হতেন এবং ২০ বিশ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন এবং ৮ম শ্রেণীতে সমস্ত বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করেছিলেন।"

তিনি বলেন, একবারকার এক ঘটনা। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমরা দু'জনই একই সময় ভর্তি হই। অতঃপর একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর জনাব আব্দুল খালেক সাহেব মাওলানা শামছুল হক ছাহেব ও আমাকে নিয়ে গড়ের মাঠে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। মাগরিবের নামাযের সময় প্রফেসর আব্দুল খালেক সাহেব শামছুল হক সাহেবকে জোর করে ধরে ইমামতিতে খাড়া করে দিলেন এবং বললেন- "এইরূপ ওলী আল্লাহ উপস্থিত থাকতে অন্য কেউ ইমামতি করতে পারে না।" জনাব আব্দুল জব্বার ছাহেবের বড় ভাই জনাব আব্দুস সামাদ সাহেব শিয়ালদহ কোর্টে পেশকারের কার্য করতেন। জনাব আব্দুল জব্বার সাহেব খুব দুর্বল ছিলেন বিধায় তার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমরা তার কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত কথা বলে বিদায় নিলাম।

সৌভাগ্যের দ্বার খুলতে শুরু করলো কিন্তু

অষ্টম শ্রেণীর প্রথম পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় সবাই হুযুরের উপর খুশী হয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হোষ্টেল ফ্রি করে দিলেন। অনেক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে জনাব আব্দুল জব্বার সাহেবদের বাড়ীতে তার ভাই জোর করে লজিং দিয়ে নিয়ে গেল। এতে আরও সুবিধা হলো, পড়াশুনার সুযোগ হলো। কিন্তু দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কিসের? হুযুর সুযোগ পেলেন, কিন্তু সুযোগ পেয়েও আপন দায়িত্ব কর্তব্য এবং পড়াশুনার আগ্রহের কারণে অনেক কষ্ট স্বেচ্ছায়ই বরণ করে নিলেন। তাঁর নিজের ছোট ভাই তৈয়্যেবুর রহমান কলিকাতায় পড়তেন, তার সমস্ত খরচ হুযুর নিজে বহন করতেন। হোষ্টেলে প্রথম প্রথম যতদিন ফ্রি হয়নি শরীফ সাহেব খরচ বহন করতেন এটা হুযুরের বিবেকে বাঁধতো। এদিকে ভাই তৈয়্যেবের যাবতীয় খরচ এজন্য তিনি টিউশনীর চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং শরীফ সাহেবের সাথে পরামর্শ করলেন, শরীফ সাহেব চিন্তা করে দেখলেন পড়াশুনার সময় এমনিই পয়সার দরকার হয়। সাথে সাথে ছোট ভাইয়ের খরচ, বাড়ী থেকে টাকা পয়সা পাঠায় না। এজন্য শরীফ সাহেবও সম্মত হলেন। বেশ কয়েকদিন চেষ্টার পর মারকুইস লেনে একটা টিউশনীর ব্যবস্থা হয়ে গেল কিন্তু এখানেও প্রথম প্রথম অসুবিধায় পড়তে হলো। এজন্য যে, যাদেরকে তিনি পড়াতেন তাদের মাতৃভাষা ছিল উর্দু তাদেরকে উর্দুতে বুঝাতে হতো। এ অসুবিধার জন্য তিনি টিউশনী ছাড়লেন না বরং উর্দু শেখার এটা একটা সুযোগ মনে করে নিলেন। হোষ্টেল ফ্রি, জায়গীরের সুযোগ ছিল তবুও স্বাধীনভাবে চলার জন্য তিনি একটা হোষ্টেলে মাসহারা হিসেবে খানা

খেতেন। হোষ্টেলে যাওয়ার সময় একজন উর্দূ ভাষীর নিকট থেকে পাঁচ মিনিট করে উর্দূ ভাষা শিখতেন। এইভাবে শিখে অল্পদিনের মধ্যে উর্দূ ভাষা আয়ত্ব করে নিলেন। মারকুইস লেনে যাদেরকে তিনি পড়াতেন তারা জানত না যে তাদের শিক্ষক উর্দূভাষী নন। কারণ, তাদের কাছে শুনেই তিনি তাদের পড়িয়ে দিতেন। তারা কিছুই টের পেত না। এদিকে হোষ্টেলে যেতে যেতে উর্দূ শিখেও ফেললেন কাজেই কোন অসুবিধা হলো না। আস্তে আস্তে চেষ্টা করে হুযুর আরও দু তিনটি টিউশনীর ব্যবস্থা করে নিলেন। চার পাঁচ জায়গায় টিউশনী করে হুযুর মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা রোজগার করতেন। এর দ্বারা ছোট ভাই তৈয়্যেবুর রহমানকে নিয়ে কোন মতে খরচ চলতো।

এদিকে মুজাহিদে আযম নিজের পড়াশুনা করে এবং চার পাঁচ জায়গায় টিউশনী করে সময় বেশী একটা বাঁচতো না অথচ কলিকাতায় আসার আসল উদ্দেশ্যই ছিল এখানে এসে আরবী পড়বেন। এত দিনে সে সুযোগই হয়ে উঠলো না। এজন্য চিন্তা করলেন, ঘুমের সময়টা বাঁচিয়ে ঐ সময় কোথাও আরবী পড়বেন। চিন্তা মাফিক খুজতে শুরু করলেন- কোথায় কার কাছে পড়ার সুযোগ করা যায়। অনেক চেষ্টা করে কলিকাতার চুনা গলিতে জনাব মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী নামে একজন আলেমের সন্ধান পেলেন। তিনি মাওলানা ছাহেবের কাছে নিজের আরবী পড়ার আকাংখার কথা বললেন। দানাপুরী সাহেব হুযুর আকাংখা শুনে পড়াতে রাজী হয়ে গেলেন। হুযুর তখন মাওলানার কাছে এল্‌মে তীবের একখানা কিতাব পড়া শুরু করলেন। পরে আরও খোজ করে মুরগীহাটা মসজিদের ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করলে তিনিও পড়াতে সম্মত হয়ে যান। ইমাম সাহেবের নিকট তিনি ফেকাহ শাস্ত্রের শরহে বেকায়া কিতাবটি পড়া শুরু করলেন। এমনিভাবে লোয়ার চিৎপুর রোডে অন্য একজন মাওলানা সাহেবের কাছে তিনি মেরকাত তর্কশাস্ত্রের একটি কিতাব পড়া শুরু করেন এবং চাটগামের একজন মাওলানা সাহেবের নিকট কোলিন রোডে কুদুরী পড়তে শুরু করেন। এভাবে প্রত্যেক দিন চার জায়গায় টিউশনী এবং চার জায়গায় প্রাইভেট পড়ার জন্য প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পথ হাটতে হতো। পঞ্চাশ মাইলের কম হলে তিনি সেখানে পায়ে হেটেই গমন করতেন। এদিকে টিউশনী করে যে টাকা পেতেন সে টাকা থেকে যে সব উস্তাদদের কাছে পড়তেন তাদেরকে মাঝে মধ্যে হাদিয়াও দিতেন। অভাবে কষ্ট করেও সপ্তম শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং অষ্টম শ্রেণীতে উঠেন।

অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর তার মাথায় দ্বিবিধ চিন্তা হাজির হলো। প্রথমতঃ এখানে এসে এতো দিনে কষ্ট করে যদিও বা আরবী ও উর্দূ ভাষা আয়ত্ব করে ফেলেছেন তথাপি কুরআন, হাদীছ বুঝার কোন উপায় ইচ্ছামত করতে পারছিলেন না। একদিকে যেমন এই চিন্তা, অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা

বৃত্তিমূলক পরীক্ষা, এটা না দিলেও নয়। আবার যদি না ইংরেজী পড়েন তবে বাড়ীতে তার পিতা ভীষণ গোস্বা হবেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো রাগের মাথায় ত্যাজ্য পুত্রও করে দিতে পারেন। এই ধরনের নানান চিন্তা-ভাবনার পর আরও কিছুদিন এখানে থাকার সিদ্ধান্ত করলেন। যদিও বা থাকলেন কিন্তু ক্লাশের পড়ার চাইতে আরবী পড়াতেই সময় বেশী ব্যয় হতে লাগল।

একদিনের ঘটনা। তিনি যে সমস্ত জায়গায় টিউশনী করতেন তার এক জায়গায় একদিন ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছেন এমন সময় কামরার সামনে একজন মৌলবী সাহেব একবার এদিক আবার ওদিক এভাবে হাটা-চলা করতে লাগলেন। তাঁর এইভাবে হাটা-চলা দেখে হুযুর মনে মনে খুব গোস্বা হচ্ছিলেন। মাঝে মধ্যে তিনি লোকটির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে তার ভাবটা লক্ষ্য করছিলেন। মনে হচ্ছিল, সে যেন কিছু বলতে এসেছে। কিন্তু তিনি তাকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছিলেন না। এভাবে প্রায় অর্ধ ঘন্টা কেটে গেল তথাপি তিনি আগের মতই পায়চারী করতে ছিলেন। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর মৌলভী সাহেব কামরায় ঢুকে পড়লেন এবং মুজাহিদে আযমকে ছালাম দিলেন। মুজাহিদে আযম ছালামের জবাব দিয়ে এভাবে হঠাৎ কামরায় ঢুকে পড়ায় একটু কর্কশ স্বরেই বসতে বললেন এবং তার মনের অনেকগুলো প্রশ্ন এক সংগে ছুড়ে মারলেন। এতে মৌলবী সাহেব বিচলিত না হয়ে বরং শান্ত ভাবেই এক এক করে সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিলেন। জওয়াব শুনে মুজাহিদে আযম বুঝতে পারলেন যে, লোকটি বেশ শিক্ষিত এবং মনে মনে কর্কশ ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হলেন। এইভাবে প্রায় আধা ঘন্টার মত আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে তিনি মুজাহিদে আযমকে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনি উর্দূ জানেন? উত্তরে মুজাহিদে আযম মাথা নেড়ে 'হু' বলে সায় দিতেই তিনি একটি উর্দূ কিতাব মুজাহিদে আযমের হাতে দিয়ে বললেন– কিতাবটি দেখবেন, কিতাবটির নাম "সীরাতে নোমান"। কিতাবখানা মুজাহিদে আযম হাতে নিলে মৌলবী সাহেব আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন। এদিকে মুজাহিদে আযম কিতাবখানা হাতে নিলেন বটে কিন্তু যেভাবে হাতে নিলেন ঐভাবেই রেখে দিলেন, খুলেও দেখলেন না। এক সপ্তাহ বাদে ঐ মৌলবী সাহেব আবার আসলেন এবং মুজাহিদে আযমকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কিতাবটি দেখেছেন কি না? এইভাবে যে মৌলবী সাহেব আসবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন মুজাহিদে আযমের এ খেয়ালই ছিল না। এজন্য সহজভাবেই জবাব দিলেন যে, না, তিনি দেখেননি। এমনি না সূচক জবাব শুনে মৌলবী সাহেব আবারও সময় দিয়ে কিতাবটি পড়তে বলে চলে গেলেন। এবার মুজাহিদে আযম চিন্তা করলেন অন্তত পাতা উল্টায়ে দেখলেও কিতাবখানা দেখা

দরকার তা না হলে লোকটি মনে কষ্ট পাবেন। এজন্য তিনি কিতাবখানা মাঝে কিছু কিছু দেখে পাতা উল্টায়ে শেষ করে দিলেন। পরের সপ্তাহে ঐ মৌলবী ছাহেব এসে কিতাবখানা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি হা-সূচক জবাব দিলেন। উত্তর শুনে মৌলবী সাহেব খুশী হয়ে ঐ কিতাবটি নিয়ে আর একটি উর্দূ কিতাব পড়ার জন্য দিয়ে গেলেন। এ কিতাবটির নাম 'জেমানুল ফেরদাউস"। মুজাহিদে আযম এবার চিন্তা করলেন যে, একজন অজানা অচেনা মানুষ তারই উপকারের জন্য অযাচিতভাবে এইরূপ চেষ্টা করছেন। কাজেই এ কিতাবটি আদ্যোপান্ত ভালভাবে দেখা দরকার। কিতাবটি খুব ধ্যানের সাথে আগাগোড়া পড়ে ফেললেন এবং যে জায়গা বুঝে না আসত মাদ্রাসার ছেলেদের নিকট জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতেন। পড়াশুনার মর্ম উপলব্ধি করে তাঁর খুব খুশী লাগলো এবং আরও কয়েকবার ভালভাবে বুঝে পড়ে কিতাবটির অনুবাদ করে ফেললেন এবং নাম রাখলেন "ফেরদাউসের পথে। এটাই হুযুরের জীবনের প্রথম লেখা এবং প্রথম অনুবাদ। কিতাবটি অনুবাদ করার পর সেটার প্রতি মহব্বত আরও বেড়ে গেল এবং কিতাবের লেখককে দেখার জন্যও আগ্রহ বেড়ে গেল কিন্তু কোন সন্ধান করতে পারলেন না।

তিনি স্কুল জীবন থেকেই কিছু কিছু লেখার অভ্যাস করেছিলেন। কোন সময় কবিতা, কোন সময় ছড়া ইত্যাদি লিখতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে ঐ সব লেখা তিনি সংরক্ষণ করতে পারেননি। কারণ, বিভিন্ন জায়গায় ছুটাছুটি, ও জায়গার সংকীর্ণতা ইত্যাদি নানান সমস্যার কারণে মাওলানার ছোটকালের লেখাগুলোর কোন হদিছ পাওয়া যায়নি।

দেখতে দেখতে অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল। বৃত্তি পাওয়ার আশায় তিনি বই পুস্তক ভালভাবে দেখাশুনা করলেন। পরীক্ষার দিন হাজির হলো। মুজাহিদে আযম এক এক করে সবগুলো পরীক্ষা ঠিকমতো দিলেন। পরীক্ষা ভালই হলো কিন্তু মুজাহিদে আযম চিন্তা করলেন তিনি হয়ত বৃত্তিও পাবেন না বা ভাল ডিভিশনও না পেতে পারেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, সে জামানার সমস্ত শিক্ষক ছিল হিন্দু বা ইংরেজ। মুসলমান শিক্ষক ছিলই না। মুসলমান শিক্ষক শুধু আরবী ফার্সীর ছিল কিন্তু এ বিষয়ের কোন গুরুত্ব ছিল না। পরীক্ষায় কোন ছেলে মুসলমানী শব্দ লিখলে সে কোন দিন বৃত্তি তো দুরের কথা ভাল ডিভিশনও পেতে না। মাওলানা অবশ্য খুব সতর্ক হয়ে হিন্দুয়ানী ও সংস্কৃত শব্দই লিখেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি আরবী উর্দূ জানতেন এবং পছন্দ করতেন, এজন্য ভুলে হয়ত আরবী উর্দূ শব্দ ভুলে এসে যেতে পারে এজন্য চিন্তা করলেন হয়ত বৃত্তি বা ভাল ডিভিশন পাবেন না। কারণ, তখনকার জামানায় যদি পরীক্ষক

বুঝতে পারতেন ছেলেটি মুসলমান, তাহলে তার জন্য সাধারণ পাশও কঠিন হয়ে পড়তো। এই ছিল সে জামানার অবস্থা।

ব্যতিক্রম ধর্মীয় প্রতিভার রেকর্ড স্বর্ণ পদকেও দুঃখিত

ধীরে ধীরে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন ঘনিয়ে এল। ফল বের হলে দেখা গেল মুজাহিদে আযম ফার্ষ্ট ডিভিশনে ফার্ষ্ট হয়েছেন। সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। সাথে হোষ্টেল এবং স্কুলের যাবতীয় সুবিধা লাভের অধিকারী হয়েছেন। সব কিছু তাঁর জন্য ফ্রি হয়ে গেল। তিনি ভয়ে শিহরিয়ে উঠলেন। কারণ, স্বর্ণপদক লাভের খবর পিতার কর্ণগোচর হলে তিনি আর ইংরেজী ছাড়তে দিবেন না, এজন্য তাঁর চিন্তা। নিয়মিত এখন থেকে হোষ্টেলে থেকে পড়ার কাজ চালিয়ে নবম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন এবং দশম শ্রেণীতে পদার্পণ করলেন। সারা স্কুলে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এত সুনাম অর্জন করেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কারণ, তিনি সবসময় চিন্তা করতেন কিভাবে কুরআন হাদীছের জ্ঞান লাভ করা যায়, এই ভাবনায়ই তিনি সর্বদা চিন্তান্বিত থাকতেন। কুরআন হাদীছের জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত তিনি স্থির থাকতে পারছিলেন না এবং ইংরেজী পড়া শুধু পিতার শাসনের ভয়ে এবং যাতে তিনি কষ্ট না পান এজন্যই। নচেৎ ইংরেজী পড়ার প্রতি তিনি মোটেই মনযোগী ছিলেন না।

দেখতে দেখতে দশম শ্রেণীর দুটো পরীক্ষা হয়ে শেষ ফাইনালের টেষ্ট হয়ে গেল। মুজাহিদে আযম সমস্ত পরীক্ষায়ই (First) পজিশন পেলেন অর্থাৎ প্রথম স্থান অধিকার করলেন। সবাইই তাঁকে বাহবা দিল কিন্তু তিনি এতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর চিন্তা কিভাবে কুরআন হাদীছ শিখবেন, অন্য কোন খেয়াল তাঁর নেই।

পরশমণির সান্নিধ্যে

এই সময় তিনি খবর পেলেন জেমানুল ফেরদাউসের লেখক তার কাংখিত মানব মুজাহিদে জামান হাকীমুল উম্মৎ পাক ভারতের শ্রেষ্ঠতম আলেমে দ্বীন রেঙ্গুন যাবার পথে কলিকাতা আসছেন। তিনি কয়েক দিন কলিকাতা অবস্থানও করবেন। এই খবর পেয়ে মুজাহিদে আযম পুলকিত হয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে খবর নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তিনি কবে, কোন তারিখে, কয়টার সময় কিভাবে আসবেন এবং কোথায় অবস্থান করবেন ইত্যাদি জানার জন্য। তিনি আলেমদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন এবং মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ হলে কি বলবেন এই চিন্তায় লেগে গেলেন। কয়েকজন আলেমের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, তাঁর সাথে দেখা হলে সালাম ও মোছাফাহা খুব আদবের সাথে করতে হবে এবং বলতে

হবে "হযরত দোয়া কিজিয়ে কে খোদা মুঝে ছীরাতে মুস্তাকীম পর কায়েম রাখ্যে" অর্থাৎ হযরত আমার জন্য দোয়া করুন- আল্লাহ্ যেন আমাকে সরল সঠিক পথে কায়েম রাখেন।

মোলাকাত করার সিদ্ধান্ত এবং তাঁর কাছে কি বলবেন, তা যখন পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে গেল- তখন চিন্তা ভাবনা থেকে তিনি অনেকখানি মুক্ত হলেন।

যথাসময় হযরত থানভী (রহঃ) কলিকাতায় তাশরীফ আনলেন। হুযুর আগে থেকেই যথাস্থানে হাজির হলেন। গিয়ে দেখেন তার মত দর্শনপ্রার্থী আরও শত শত লোক সেখানে অধীর আগ্রহে আরও অনেক আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছেন এবং কাতারবন্দী হয়ে দাড়িয়ে আছেন। মুজাহিদে আযমও লাইনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বেশ কিছু লোকের সাথে সাক্ষাতের পর হুযুরের পালা এলো। আবেগাপ্লুত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সালাম ও মোছাফাহা করে বললেন, হযরত মুঝে দোয়া কি যিয়ে, কে খোদা ছীরাতে মুস্তাকীম পর কায়েম রাখ্যে অর্থাৎ এত সংক্ষিপ্তভাবে এত সুন্দর কথা শুনে হযরত থানভী (রহঃ) হুযুরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোম কিয়া পড়তে হো? হুযুর উত্তরে বললেন, ইংরেজী। থানভী (রহঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোম ইলমে দ্বীন কিউ নেহি পড়তে হো? অর্থাৎ হুযুর কাঁদ কাঁদ অবস্থায় বললেন, "মায় তো ইলমে দ্বীন পড়নে কে লিয়ে তৈয়ার হোঁ মাগার মেরে আব্বা নেহী দিতা" এই বাক্যটিও কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে হুযুর বাইরের দিকে আসতে আসতে শুনতে পেলেন হযরত থানভী (রহঃ) লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে দুঃখের সাথে বললেন, "হায় আফছোছ! এমন জামানা এসে গেছে যে, ছেলে ইলমে দ্বীন পড়তে আগ্রহী কিন্তু পিতা ইল্‌মে দ্বীন পড়তে দিতে চায় না।" বাক্যটি হুযুরের কর্ণকুহরে প্রবেশের সাথে সাথে হুযুর বেঁহুশ হয়ে গেলেন, কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে টলতে টলতে হোষ্টেলে ফিরে গেলেন।

আজব প্রতিজ্ঞা

হযরত থানভী (রহঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁরা কথায় হৃদয় তন্ত্রীগুলো যেন ছিড়ে গেল। নিজেকে হুযুর আর ধরে রাখতে পারছেন না। মন চলে যাচ্ছে বার বার থানাভবনের সেই সাধনাগৃহের দিকে। সবই যেন মনে হচ্ছে বৃথা। এ দুনিয়ার যেন কানা কড়িরও মূল্য নেই। এটা যে এত তুচ্ছের এ কথা ইতিপূর্বে এত স্পষ্টভাবে তাঁর উপলব্ধিতে আসেনি। যদিও দুনিয়ার প্রতি অনীহা পূর্বেও ছিল কিন্তু এমনভাবে মনে ধিক্কার পয়দা হয়নি। অন্যদিকে পিতার কঠোরতাও মন মাঝে জেগে উঠে; ইংরেজী পড়া বাদ দিলে হয়তো তিনি কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। এ জন্য মনে এক বুদ্ধি ঠিক করলেন যে, যতদিন তিনি জীবিত আছেন,

অবাধ্যতো কিছুতেই হওয়া যাবে না, তার মনেও কোন কষ্ট দেওয়া যাবে না। কাজেই বুদ্ধি করে প্লান করলেন, যে কোন ভাবেই হোক পরীক্ষায় ফেল করতে হবে, তাহলে তিনি ভাববেন, এর দ্বারা কিছু হবে না কাজেই যা মনে চায় পড়ুক। এই চিন্তা করে টেষ্টের পরেই বই পুস্তক বেঁধে ট্রাংকে রেখে দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন পরীক্ষার আগে আর বই খুলে দেখবেন না। ফলে ফেল আপনা আপনিই হয়ে যাবে। সুতরাং মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে বই আর স্পর্শও করলেন না।

নতুন সাধনায় মগ্ন হলেন

ক্লাশের বই আর পড়বেন না এবং আব্বাকেও তা জানতে দিবেন না। এই কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, এই দীর্ঘ তিন মাস পরীক্ষা পর্যন্ত কি পড়বেন? অনেক ভাবনার পরে স্থির করলেন, এই তিন মাসে দ্বীনি ইল্‌মের কিতাবপত্র পড়ে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবেন। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। তিনি ১০ দশটি টাকা মানি ওর্ডার করে এক কুতুবখানার ম্যানেজারের নামে পাঠিয়ে দিলেন এবং লিখলেন, কিছু ধর্মীয় পুস্তক পাঠিয়ে দিন। কার লেখা, কি নামের কিতাব পাঠাতে হবে কিছুই না লেখায় লাইব্রেরিয়ান প্রথমে কিছুটা দ্বিধায় পড়লেন পরে চিন্তা করে থানভী (রহঃ)-এর লিখিত দশ টাকার কতিপয় কিতাব হুযুরের নামে পার্সেল করে পাঠিয়ে দিলেন। কারণ, ঐ লাইব্রেরীতে তখন একটা লোক বসা ছিলেন তিনিই দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেছিলেন যে, পত্র লেখক কে, তা আমি জানি, তাঁর নামে থানভী সাহেবের দশ টাকার কিতাব পাঠিয়ে দিন। কিতাবগুলো পেয়ে হুজুর খুবই আনন্দিত হলেন এবং পুরা তিনটি মাস ঐ কিতাবগুলো কয়েকবার করে পড়ে মুখস্ত করে ফেললেন। ইবাদত-বন্দেগী বাড়িয়ে দিলেন। বেশী বেশী নফল নামায, জিকির, মোরাকাবা ইত্যাদি এক নুতন জগতের নুতন সাধনায় মত্ত হয়ে গেলেন। তিনি যখন সর্বদা উর্দূ কিতাব নিয়ে লেগে থাকতেন, তখন অনেক সাথী-সঙ্গীরা তাঁর এ কাজ দেখে বিস্মিত হয়ে যেতেন। সামনে যার কঠিন পরীক্ষা, উস্তাদগণ তাঁর সাফল্যের কথা কল্পনা করে চিন্তা ভাবনা করছেন। তারা ভাবছেন ভালভাবে পরীক্ষা হয়ে গেলে আমাদের শামছুল হক অবশ্যই ফার্ষ্ট ষ্ট্যান্ড করবে। আর এদিকে তিনি পাঠ্য পুস্তক স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞা করে থানভী (রহঃ)-এর কিতাব নিয়ে নুতন সাধনায় লিপ্ত রয়েছেন।

পরীক্ষার হলে এক ঘন্টা পরীক্ষা

এদিকে পরীক্ষা যতই নিকটবর্তী হতে লাগল, মাওলানাও ততই থানভী (রহঃ)-এর কিতাবের ভিতর ডুবে যেতে লাগলেন। কিতাবের মর্ম উপলব্ধি করে সে মর্মেই জীবন গঠনের সাধনায় লিপ্ত হয়ে গেলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী। সমস্ত ছাত্ররা জীবন মরন পণ করে পরীক্ষা-প্রস্তুতির কাজে লেগে গেছে। আর আমাদের মুজাহিদে আযম তখন থানভী ছাহেবের কিতাবের মর্ম অনুধাবন করতে এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়ার তৈরী পর্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। পরীক্ষা বলে কোন চিন্তাই যেন তার নেই অথচ পরীক্ষা আসন্ন। পরীক্ষা না দিলে হুযুরের পিতা যে ভয়ানক ক্ষেপে যাবেন, অসন্তুষ্ট হবেন, তাও জানা। সে জন্য পরীক্ষাতো পিতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অবশ্যই দিবেন কিন্তু ফেল যাতে নিশ্চিত হয় এজন্য পরীক্ষার হলে ঢুকার পূর্ব মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলেন যে পরীক্ষার হলে এক ঘন্টার বেশী থাকবেন না, লিখবেন না। তিন ঘন্টা পরীক্ষার প্রথম ঘন্টাটি বাজার সাথে সাথে তিনি হল থেকে বেরিয়ে আসবেন। কারণ তিনি জানতেন প্রশ্ন যতই কঠিন হোক তিন মাস না পড়েও একটু চেষ্টা ও চিন্তা করে লিখলে অবশ্যই পাশের নম্বর ভালভাবে পেয়ে যাবেন। আর যখন পাশ করবেন, তখন তাঁর বাহাদুর পিতাজী অবশ্যই কলেজে পড়ানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে যাবেন। কাজেই তিনি কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন মাত্র এক এক ঘন্টা করে দৈনিক পরীক্ষা দিয়ে, পরীক্ষা দিয়েছি শুধু একথা পিতার কাছে বলার ব্যবস্থা করবেন এবং ফেল করলে আরবী পড়ার সুযোগ আসবে এজন্য এক ঘন্টা পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন এক ঘন্টা পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই ফেল করা যাবে। পরীক্ষা আরম্ভ হলো। সময় অতিবাহিত হতে লাগল সবাই নিশ্চুপ। কলম একটু দ্রুতই চালালেন, সর্টকার্ট করে উত্তর লিখলেন। শিক্ষক মণ্ডলী ভাবছেন, এবার শামছুল হকের দ্বারা আমাদের স্কুলের মুখ উজ্জ্বল হবে, সুনাম বাড়বে কারণ সে কেমন ছাত্র পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহে জানা গেছে। অবশ্যই বোর্ডে সে ফার্ষ্টষ্ট্যান্ড করবে প্রথম পজিশন হাছিল করবে। কিন্তু এ কি? প্রথম ঘন্টাটি যেই মাত্র বেজেছে, শামছুল হক সাথে সাথে খাতা জমা দিয়ে হল থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। শিক্ষক মণ্ডলী হতবাক হয়ে গেলেন। ছাত্ররা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ী করে দু' মিনিট লেখা বন্ধ রাখল, কিন্তু শামছুল হককে তখন আর পরীক্ষার হল বাউন্ডারীর মধ্যে দেখা গেল না। তিনি যেমনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে -া পালন করে চলেছেন। শিক্ষকগণ মনে করলেন আমাদের শামছুল হকের মাথায় কোন অসুবিধা হলো কি না! কিন্তু শামছুল হক আপনা প্রতিজ্ঞায় অটল, মকছুদে দৃঢ়, কারও কাছে কিছু ব্যক্ত করলেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করলেও কৌশলে এড়িয়ে যেতেন। ঘন্টা বাজার সাথে সাথে হল থেকে বের হয়ে আসতেন। যদিও ঐ সময় একটা শব্দের দুটো অক্ষর লিখেছেন আর দুইটি অক্ষর বাকী আছে! কিন্তু ঘন্টা বেজে গেছে সাথে সাথে ঐ দুইটি অক্ষর না লিখেই কলম বন্ধ করে খাতা জমা দিয়ে বাইরে চলে এসেছেন। এইভাবে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। সবাই আপন আপন আশ্রয়স্থলে ফিরলো কিন্তু হুযুর আপন সাধনায় মত্ত হয়ে কলিকাতা হোষ্টেলে থেকে গেলেন।

এক ঘন্টার পরীক্ষায় লেটার সহ স্কলারশীপ

তিনি ১৯২০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। তাও প্রতি সাবজেক্টে মাত্র তিন ঘন্টার স্থানে এক ঘন্টা পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষার পর আপন কাজে লেগে গেলেন। এ কথা সবাইই পূর্বে জেনেছেন। পরীক্ষার পর ছাত্ররা সাধারণতঃ ফলের জন্য অহর্নিষ ব্যস্ত থাকে। রেজাল্ট বের না হওয়া পর্যন্ত কেবল এই চিন্তায়ই দিশেহারা থাকে। রেজাল্টের জন্য সর্বদা ছেলেদের মন প্রসারিত ও সংকুচিত হতে থাকে। বুক দুরু দুরু করতে থাকে ফেল পাশের চিন্তায়; কিন্তু হুযুরের পরীক্ষার ফলের প্রতি সামান্যতমও খেয়াল ছিল না। কেমন যেন তিনি পরীক্ষাই দেননি। সর্বদা আরবী পড়ার চিন্তায়ই বিভোর থাকতেন।

ইতিমধ্যে হুযুর কয়েকদিন খুব জ্বরে আক্রান্ত হলেন। জ্বর একটু কমলেই বসন্ত রোগ দেখা দিল। একেতো বিদেশ তার উপর বসন্ত রোগ, অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। হুযুর অসহায় অবস্থায় পড়ে রইলেন। অবশেষে একজন পরামানিক হুযুরকে দেখাশুনা করতে লাগলেন। অপর একজন বৃদ্ধলোক খুব যত্ন করে, ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করতেন। অসুখ একটু ভাল হলে মাওলানা ইসমাইল ছাহেব হুযুরকে বাড়ী নিয়ে আসলেন। দিন কয়েক বাড়ী থেকে তিনি আবার কলিকাতায় আসলেন। কলিকাতা এসে শুনতে পেলেন যে, আর মাত্র দু'দিন পরে পরীক্ষার ফল বের হবে। সবার মনে খুশীর ঢেউ খেলে গেল। কেবলমাত্র হুযুরের যেন এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই।

দু'দিন পরেই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বের হলো। হাসি কান্নার মিশ্রিত রূপেই রেজাল্ট আউটের দিনটি এসে হাজির হলো। যারা পাশ করলো, তাদের খুশী যেন ধরে না এবং যারা ফেল করলো, তাদের দুঃখের সীমা থাকল না। কিন্তু হুযুর নির্বিকার। ফলাফলের সাথে যেন তার কোন সম্পর্কই নেই। অন্যান্য ছেলেদের দৃষ্টি এবার হুযুরের পরীক্ষার ফলের প্রতি আকৃষ্ট হলো। সবাই দেখলো সেই এক ঘন্টা করে পরীক্ষা দেওয়া ছেলেটি, যিনি রাত্র দিন পড়া বাদ দিয়ে শুধু আরবী উর্দু কিতাবাদি নিয়ে সময় কাটাতেন, সেই শামছুল হক নামক ছেলেটি ৫টি লেটার সহ ষ্টার মার্ক পেয়ে স্কলারশীপ পেয়েছে। তাঁর এই সাফল্যে সবাই অবাক হয়ে গেল। সবাই রেজাল্টের পত্রিকা নিয়ে হুযুরের কক্ষে এসে পরীক্ষার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি না সূচক জবাব দিলেন। সবাই তখন ফলাফলের কাগজটি হুযুরের সামনে মেলে ধরে বলল, জানেনতো না এই দেখুন আপনি ফার্ষ্ট ডিভিশনে ষ্টার মার্ক সহ ৫টা লেটার পেয়ে স্কলারশীপও পেয়েছেন। হুযুর প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, বরং তিনি ঐ সব সাথীদের বললেন, আমাকে ঠাট্টা করবেন না, আমার পরীক্ষার ব্যাপারতো আপনাদের সবাইর জানা যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করার জন্য এক ঘন্টা করে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু পত্রিকার

সাথে নিজের রোল নম্বর মিলিয়ে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। মুখে হাসির পরিবর্তে যেন কান্না বিজড়িত চেহারা মলিন রূপ ধারণ করলো। বুঝতে পারলেন, এই ভাল ফলাফলের সংবাদ পিতার কানে গেলে তিনি কলেজে না পড়িয়ে ছাড়বেন না। কাজেই আরবী পড়ার অদম্য স্পৃহা মাঠে মারা যাবে। এ চিন্তা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্থির করলেন, যে কোন প্রকারেই হোক কলেজে তিনি ভর্তি হবেন না। কলেজে ভর্তির শেষ তারিখ পর্যন্ত কলিকাতা অবস্থান করবেন এবং দুই চার দিন ভর্তির বাকী থাকতে বাড়ী যাবেন। বাড়ীতে ৪/৫ দিন অবস্থান করে ভর্তির তারিখ শেষ হয়ে গেলে কলিকাতায় এসে আব্বাকে জানিয়ে দিবেন- এ বৎসর ভর্তি হওয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে। এ বৎসরে আর ভর্তি হওয়ার কোনই সুযোগ নেই। কাজেই এ বৎসর আরবী পড়ি, আগামী বৎসর সময়মত কলেজে ভর্তি হবো।

মায়ের মুখ দেখা ভাগ্যে জুটলো না

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কলেজে ভর্তির শেষ তারিখের পাঁচদিন পূর্বেই তিনি বাড়ীর পথে রওয়ানা দিলেন। খুলনা পৌঁছে ট্রেন থেকে নেমে রাত্রের ষ্টীমারে ভোর বেলার দিকে পাটগাতি ষ্টীমার ষ্টেশনে জাহাজ থামলো। হুযুর ছামান হাতে করে সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামছেন। সামনে দেখলেন আজরাইলের মত হুযুরের পিতা দাঁড়িয়ে আছেন। নামার সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, "কলেজে ভর্তি হয়েছ? হুযুর মাথা নীচু করে ধীরভাবে জবাব দিলেন, না, বাড়ী থেকে কলিকাতা ফিরে গিয়ে ভর্তি হবো, এজন্য টাকা পয়সা নিতে এসেছি।" হুযুরের পিতা বুলন্দ আওয়াজে বললেন, কি সর্বনাশ! ভর্তির তারিখতো এত দিনে শেষ হয়ে যাবে, কাজেই মায়ের সাক্ষাতের আশা ছাড়, এই ফেরৎ ষ্টীমারেই তুমি কলিকাতা গিয়ে আগে ভর্তি হয়ে পরে বাড়ীতে এসে মাকে দেখবে, এখন এই ষ্টেশনে বরিশাল থেকে আসা ষ্টীমারের অপেক্ষা কর, একটু পরেই ষ্টীমার আসবে। আমি তোমাকে ষ্টীমারে তুলে দিয়ে যাবো। আমি বাড়ীতে গিয়েই টেলিগ্রাম মানি ওর্ডার করে তোমার ভর্তির টাকা পাঠিয়ে দিব। তুমি কলিকাতা গিয়েই টাকা পেয়ে যাবে এবং সাথে সাথে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়ে যাবে।' পিতার আদেশ শিরোধার্য করে পাটগাতি ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরে বরিশালের খুলনাগামী ষ্টীমার ঘাটে ভিড়ল। হুযুরের আব্বা ছেলেকে ষ্টীমারে তুলে দিয়ে বাড়ীর পথে চললেন এবং হুযুর ষ্টীমারে বসে বসে বাড়ীর কথা, মায়ের কথা এবং নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। ষ্টীমার খুলনা ঘাটে ভিড়লে হুজুর আস্তে নেমে ট্রেনে গিয়ে বসলেন। ট্রেন শিয়ালদাহর দিকে এগিয়ে চললো।

লবনের ঠোংগায় ভর্তির দরখাস্ত

কলিকাতা এসে কামরায় বসে চিন্তা করছেন কি করা যায়? আরবী পড়ার অদম্য স্পৃহাও ছাড়তে পারছেন না অন্যদিকে পিতার হুকুমও অমান্য করতে পারছেন না। পিতাকে তিনি সর্ববস্থায় মান্য করে চলতেন। কাজেই স্থির করলেন বি, এ, পর্যন্ত পড়ে তারপর আরবী পড়বেন। তবুও মন আরবীর থেকে, কুরআন হাদীছ থেকে ফিরাতে পারছেন না। এমন সময় কামরার ভিতর সাদা কাগজের একটি লবনের ঠোংগা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি ঠোংগাটি কুড়িয়ে নিলেন এবং ঠোংগার তলার শক্ত কাগজটুকু ফেলে দিয়ে ঠোংগাটি সমান করে ছিড়ে ঐ কাগজেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করলেন। হুযুরের ধারণা, লবনের ঠোংগায় ভর্তির দরখাস্ত দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ তা ফেলে দিবেন, ভর্তি করবেন না। তখন আমি পিতাকে বলতে পারবো যে, ভর্তির জন্য দরখাস্ত দিয়েছিলাম, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তি করেন নাই। কাজেই আমি এই সময় কিছু আরবী পড়ে নেই। তাতে পিতার কাছে মিথ্যাও বলা হবে না, কলেজে ভর্তি হওয়াও যাবে না। এইভাবে আরবী পড়ার একটা সুযোগ হয়ে যাবে।

এ পাগলামীরও মূল্য আছে

লবনের ঠোংগায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তির আবেদন করা, যেখানে ছাপানো ফরম কিনে মন্ত্রীর সুপারিশ সাথে দিয়ে আবেদন করতে হয়, হুযুর মনে মনে খুব শান্তিই পাচ্ছিলেন। এদিকে জমাকৃত ফরমগুলো কলেজের কর্মচারীরা একত্রিত করে সিরিয়াল দিয়ে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছাহেবের কাছে অনুমোদনের জন্য হাজির করবেন এজন্য একত্রিত করছিল। এমন সময় দেখতে পেল ফরমগুলোর মধ্যে সাদা লবনের ঠোংগার কাগজে হাতের লেখা বেআইনী একটা দরখাস্ত রয়েছে। কর্মচারী কাগজটি ফেলে দিতে চেয়েছিল কিন্তু চিন্তা করল এটা প্রিন্সিপ্যাল স্যারকে দেখিয়ে একটু হাসি তামাশা করা যাবে। এই মনে করে যত্নের সাথে ঐ দরখাস্তটি আলাদা রেখে দিল এবং প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব আসলে অন্যান্য অধ্যাপকদের সামনে প্রিন্সিপ্যাল ছাহেবের হাতে দরখাস্তটি দিয়ে বলল "দেখেন স্যার আপনার কলেজে লবনের পোটলায় ভর্তির দরখাস্ত এসেছে। হাসির রোল পড়ে গেল। সবাই দরখাস্তটি দেখে প্রেন্সিপ্যাল ছাহেবের হাতে দিলেন। তিনি গম্ভীর মনযোগের সাথে দরখাস্তটি পড়লেন। ইংরাজীতে লেখা দরখাস্তটি ভাল করে দেখলেন। এত সুন্দর হাতের লেখা, এত চমৎকার ইংরাজী দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। নীচে প্রবেশিকার ফল ও পরীক্ষার নম্বরগুলো দেখে আরও আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন "আজব ব্যাপার! এমন কারবার তো কোন দিন দেখিনি, শুনিনি। হয়ত ছেলেটি খুবই ভাল হবে, কি কারণে বা খেয়ালে এ পাগলামী করেছে জানি না। কিন্তু

দেখেছো! ছেলেটির হাতের লেখা, ইংরেজী লেখার ষ্টাইল আর পরীক্ষার নম্বর! এ ছেলেকে ছাড়া যায় না, একে বিনা টাকায় ভর্তি করে নাও এবং একে জানিয়ে দাও যে, তার ভর্তি হয়ে গেছে। এ পাগলামীরও মূল্য আছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের জীবন

ভর্তির পরে হুযুর রীতিমত কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। পিতার প্রেরিত টাকাও এসে গেল। বই পুস্তক কিনলেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আর্টস বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। রোজই ক্লাশে যান, অধ্যাপকগণ লেকচার দিয়ে যান, কিন্তু হুযুরের কাছে যেন সবই অসার মনে হতে লাগল। কোন সাবজেক্টের লেকচারই হুযুরের মনে রেখাপাত করে না। পড়া লেখায় মন একটুও বসে না। শুধুমাত্র তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক R K D আরকে ডি সাহেবের কথাগুলো ভাল লাগত এবং খুব খেয়াল করে শুনতেন। বাকী ক্লাশগুলো গতানুগতিকভাবেই চালিয়ে নিতেন।

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ক্লাশে নুতন তথ্যের সন্ধান

একদিন বাংলার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক পুরুষ আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্পণ করলেন। প্রিন্সিপ্যালের অনুরোধে তিনি বিজ্ঞান বিভাগের একটি ক্লাশ নিতে রাজী হলেন। সমস্ত ছেলেরা ঐ ক্লাশে যোগদান করলো। সমস্ত শিক্ষকগণও ক্লাশে হাজির হলেন। হুযুর যদিও কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন তবুও জগদীশ বাবুর ক্লাশে আগ্রহের সাথে যোগদান করলেন। জগদীশ বাবু বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তিনি দুইভাগ অক্সিজেন এবং একভাগ হাইড্রোজেন দ্বারা পানি তৈরী করে দেখালেন এবং বললেন দেখ, আমি যে একতোলা পানি তৈরী করলাম এতে প্রায় দশটি টাকা খরচ হয়ে গেল অথচ এ পানি খাবার উপযুক্ত নয় বরং বিষাক্ত। কিন্তু আমরা দৈনন্দিন যে কোটি কোটি গ্যালন পানি পান করছি, ব্যবহার করছি এ পানি কে সৃষ্টি করলেন? তাঁর সম্পর্কে কি কিছু চিন্তা করি? এ জগত আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি। এর মূলে একজন আছেন। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, অজ্ঞাতে অদৃশ্যে থেকে তিনি সব চালাচ্ছেন। তাঁর হুকুমেই সব চলছে। তিনি এত ক্ষমতাবান যে, তাঁর ক্ষমতার তুলনা হয় না। এ জন্যই দেখা যায় সমস্ত সৃষ্টির মাঝে কি সুনিপুণ নিয়ম কানুন। কোথাও কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। তিনি যদি না থাকতেন, তবে এত সুন্দরতম নিয়মে জগত চলত না, রাত দিন হতো না। সুতরাং সব কিছুর গোড়ায় সৃষ্টিকর্তা একজন নিশ্চয়ই আছেন। তিনি আরও বললেন "আমরা স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তুর বিষয়ে Analysis করে কেবল তার বিশেষ ব্যবহার বের করতে পারি, কোন বস্তু সৃষ্টি করতে আমরা পারি না। সসীম মানুষের চিন্তাধারা কোনক্রমেই সেই অসীমের সৃষ্টির নিগুঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়

না। আমরা বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের দ্বারা যারা জগতকে বিস্মিত করে তুলছি, তারা একটা তৃণ তৈরী করতে সক্ষম নই। তবে মহান স্রষ্টা যাদের সে ক্ষমতা বা যোগ্যতা দান করেছেন, তারা সেই সীমাবদ্ধতার ভিতর থেকেই তার মহিমা প্রকাশ এবং নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন মাত্র। এটা ব্যতীত মানুষের অতিরিক্ত আর কিছুই করার নাই। জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি যে আধ্যাত্মিক বিষয় তুলে ধরলেন, তা শ্রবণ করে হুযুরের অন্তস্থল যেন জান্নাতী জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠল। যদিও তিনি কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন তথাপি তিনি জগদীশ বাবুর বক্তৃতা শ্রবণ মানসে বিজ্ঞান কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার বক্তৃতা শুনে সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন। ভাববিহ্বল অবস্থায় হোষ্টেলের শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে নানা চিন্তায় তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। তন্দ্রাযোগে দেখতে পেলেন- কে যেন হুযুরকে দেওবন্দ ছাহারানপুর গমনের কথা কানে কানে বলছেন এবং আরবী পড়বার জন্য বলছেন। তিনি কে? তাঁর পরিচয় কি? তা জানার জন্য যখন তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার খেয়াল করছেন, এমন সময় তন্দ্রা ছুটে গেল। তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি স্থির করলেন, আরবীই পড়তে হবে, কিন্তু কিভাবে পড়বেন এই চিন্তা করতে লাগলেন।

শেরে বাংলাকে নামাযের দাওয়াত

১৯২১ সালে যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক ছাহেবকে প্রেসিডেন্সী কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের উন্নতির সহযোগিতার জন্য একবার কলেজে দাওয়াত করে নিয়ে সভা করলেন। হাজার হাজার জনতার সমাবেশ। শেরে বাংলা বক্তৃতা করে চলেছেন। আসরের নামাযের ওয়াক্ত অতীত হতে চলেছে, কিন্তু শেরে বাংলা বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। কিছু কিছু মুসল্লী লোক বলাবলি করছেন, আজ কিভাবে আসরের নামায পড়বো. বক্তৃতাতো থামছে না, কি করা যায়? একথা হুযুরের কানে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বুলন্দ আওয়াজে মিটিং-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ইংরেজীতে বললেন "It is the time of prayer, please let us now Pray to Allah the Almighty. এখন নামাযের সময়, মিটিং বন্ধ করে আসুন আমরা নামায পড়ে নেই।" এ কথা কয়টি শেরে বাংলার কর্ণকুহরে প্রবেশ করামাত্র তিনি নামাযের জন্য বক্তৃতা অসম্পূর্ণ, বন্ধ রেখে নামাযের জন্য সময় দিলেন। মিটিং বন্ধ হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ রাগে মোল্লা মোল্লা বলে গালি দিতে লাগল। এই গালি হুযুরের কানে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি আশ্চার্যান্বিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, কি ব্যাপার? আমাকে মোল্লা বলে গালি দেয় কেন? যারা মিলাদ পড়ে টাকা নেয়, আজেবাজে কাজ করে আমিত তাদের মোল্লা বলে গালি দেই। আর আজ আমিইতো নামাযের কথা বলেছি, এজন্য তারা

আমাকে মোল্লা বলে গালি দেয়া কেন? তবে কি মাদ্রাসার দাওয়াত দিলেও মোল্লা বলে গালি খেতে হয়। ঠিক আছে তবে আমিও আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি অবশ্যই মোল্লা হবো। এই কথা মনে মনে বলে হুযুর ধীরপদে সভাস্থল ছেড়ে এসে মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করলেন এবং বললেন "আমাকে অবশ্যই মোল্লা হতে হবে।"

অসহযোগ আন্দোলন- মুক্তির দ্বার উন্মোচন

১৯২১ সালে গান্ধীজির Non Co-Opration Movement. মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সবার অন্তরে স্বাধীনতার শিহরণ জেগে উঠল। স্কুল এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। হুযুর তখন স্থির করলেন আর ইংরেজী পড়বার প্রয়োজন নেই। তিনি আরবী পড়তে মনস্থ করলেন এবং সেই মর্মে বাড়ীতে আগমন করলেন। বাড়ী আসার পরেই তিনি দ্বিতীয়বার আবার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগ শয্যায় থাকা অবস্থায় তিনি একটি উর্দূ কিতাব পড়েছিলেন। কিতাবটির মধ্যে একটি হাদীছ পাঠ করে তিনি আরও উৎসাহিত হয়ে আরবী পড়বার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। হাদীছখানা এই- "তালেবুল ইল্‌মে তাকাফফাল্লাহু বেরেজকীহি- অর্থাৎ ইল্‌ম অন্বেষণকারীকে আল্লাহ জীবিকার জন্য অন্য কাহারও দ্বারস্থ করেন না, আল্লাহই তাঁহার রিজকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

অসুখ প্রায় সেরে গেছে কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা এখনও যায়নি। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর মাতাকে অবগত করালেন যে, দেশ শীঘ্রই স্বাধীন হয়ে যাবে, সুতরাং আর ইংরেজী পড়ে লাভ নেই। আমি দেওবন্দ গিয়ে সেখানে আরবী পড়বো। বিষয়টা মাতাকে জানিয়ে তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করেই নামায পড়তে চলে গেলেন। ইত্যবসরে তার পিতা মুন্সি আব্দুল্লাহ ছাহেব বাড়ীতে আসলেন। মাতা তার পিতার নিকট সবকিছু খুলে বললেন, তিনি জোর আওয়াজে বলে উঠলেন, "নদীর তীরে বসত করে কুমীরের সাথে আড়ি।" এত সকালে দেশ স্বাধীন হতে পারে না, এর জন্য আরও সময় এবং শত শত জীবন কুরবান হওয়ার দরকার আছে। তুমি তাকে বুঝিয়ে বলো সে যেন ইংরেজী আর বাংলা ছাড়া অন্য কিছু না পড়ে, আর যদি পড়তেই চায়, তবে যেন দেওবন্দ না গিয়ে কলিকাতা থেকেই তা পড়ার চেষ্টা করে।" মাতা যখন হুযুরের কাছে পিতার সব কথা খুলে বললেন, তখন হুযুর কি করে তাড়াতাড়ি বাড়ী ত্যাগ করবেন এই চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে সুযোগ এসে গেল। হুযুরের পিতা একদিন পার্শ্বের কুশলী গ্রামে ওয়াজ মাহফিলের দাওয়াতে গমন করলেন। এই সুযোগে হুযুর মাতাকে বলে আড়ুয়া বর্ণি গ্রামে বেড়াতে চলে গেলেন। আড়ুয়া বর্ণি থেকে পরের দিনই বাগেরহাট এবং

সেখান থেকে যাত্রাপুর গিয়ে ট্রেনে খুলনা এবং খুলনা থেকে সোজা কলিকাতা গিয়ে উঠলেন।

গায়েবী সাহায্য লাভ

হুযুরের বসন্ত রোগের সময় যে বৃদ্ধলোকটি হুযুরের খেদমত করতেন এবং দুধ সাগু খাওয়াতেন কলিকাতা এলে সেই বৃদ্ধ লোকটি হুযুরকে ১৬ টি টাকা দিলেন। হুযুর তখন সব ছেড়ে দেওবন্দ রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

দেওবন্দের পথে মুজাহিদে আযম

দেওবন্দ যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে প্রেসিডেন্সী কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখে বইপত্র যা কিছু ছিল তা গরীব ছাত্রদের দান করে শুধুমাত্র একটি ভাংগা ছাতা, একটি ট্রাংক ও একটি ঘটি সম্বল করে দেওবন্দ পানে ছুটে চললেন। তখন তার কণ্ঠ থেকে ঝংকৃত হয়ে উঠল, "সব বন্ধু ছেড়ে এক বন্ধুকে নিয়ে চলিনু দেশ ছাড়িয়ে।"

যার সংগে শত শত লোকের পরিচয় তিনি আজ সব ছেড়ে ফকিরের বেশে ছুটে চলেছেন দেওবন্দ পানে। আজ যেন তার কাছে সব অজানা, সব অচেনা বলে প্রতীয়মান হতে লাগল। কি এক নতুন আকর্ষণে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সত্যের বাহক এক নবীন আজ এক দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, সমস্ত মায়ার বন্ধক ছিন্ন করে স্বদেশের মায়া মমতা পরিত্যাগ করে মনজিলে মকছুদের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। দেখতে দেখতে ট্রেন হাওড়া গিয়ে থামল। এখানে এক বন্ধুর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করে তার সংগে নিজের জীবনের দু'একটি কথা বলে তাকে একটি পত্র পোষ্ট করতে দিলেন। সে পত্রটি হুযুর তার পিতার কাছে লিখেছিলেন। পত্রটি নিম্নে দেয়া গেল–

দেওবন্দের পথে
১৯২১ সাল ইং
১লা রজব

মাননীয় আব্বাজান,

পত্রে অধমের আন্তরিক ছালাম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বিজড়িত কদমবুছি গ্রহণ করতে মর্জি হয়। আশা করি করুণাময়ের অশেষ কৃপায় কুশলেই আছেন। আমি দেওবন্দ যাচ্ছি। আমার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবেন, যেন উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করতে পারি। আপনি যদি আমাকে আরবী পড়ার জন্য কোন টাকা পয়সা না দেন বা ত্যাজ্য পুত্রও করে দেন, তাতেও আমি দুঃখ পাব না। শুধু আপনার খেদমতে আমার একান্ত অনুরোধ পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাদে আপনি আমার

জন্য দোয়া করতে ভুলবেন না। আল্লাহ যেন আমাকে কামিয়াব করেন। আমি যেন জীবনে সাফল্যমন্ডিত হয়ে ফিরতে পারি। এই দোয়াই শুধু আপনার খেদমতে চাই। আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার জীবনে যাতে মঙ্গল হয় করুণাময়ের দরবারে এই দোয়াটুকু করতে অবশ্যই ভুল করবেন না। আপনি দোয়া করলেই আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হবো। আমি আমার উদ্দেশ্য সফল না করে দেশে ফিরবো না। মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম জানিতে দোয়া করতে বলবেন। ভুল ত্রুটি ও বেয়াদবী মার্জনা করবেন।

ইতি
আপনার দোয়াপ্রার্থী পুত্র
শামছুল হক

মনজিলে মকছুদে পদার্পণ দেওবন্দে উপস্থিতি

ট্রেন বিরামহীন গতিতে দেওবন্দের দিকে চলেছে। অপরদিকে সূর্য পশ্চিম আকাশে আস্তে আস্তে ডুবে গেল। গভীর রাত্রে ট্রেন দেওবন্দ ষ্টেশনে এসে থামল। সামানপত্র নিয়ে হুযুর ষ্টেশনে অবতরণ করলেন। অন্ধকার রাত্রি। চতুর্দিকে ভীষণ অন্ধকার। দুই একজন প্যাসেঞ্জার যারা নেমে ছিল, যার যার গন্তব্যস্থানের দিকে চলে গেল। লোকজন নেই, অন্ধকারে কোনদিকে যাবেন, কিছুই স্থির করতে পারলেন না। মনে মনে আল্লাহ্কে ডাকতে লাগলেন। এশার নামায ঐখানেই পড়ে নিলেন। নামায বাদ নানা রকম চিন্তা করে ষ্টেশনেই রাত্র যাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। ট্রেন ভ্রমণে যথেষ্ট শ্রান্ত ও ক্লান্ত ছিলেন। রাত্রে কিছুই খেলেন না। ক্লান্ত অবস্থায় ষ্টেশনেই ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ রাত্রের দিকে জেগে গেলেন। তাহাজ্জুদ পড়লেন। করুণ স্বরে মাওলার দরবারে কাঁদতে শুরু করলেন। কতক্ষণ কাঁদেন আবার কতক্ষণ করুণ সুরে দোয়া করেন। ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। হুযুর ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায বাদ মাদ্রাসার দিকে রওয়ানা দিলেন। সাথে ট্রাংক, ছাতা ও অন্যান্য আসবাব। কুলির দরকার। পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, আমিইতো কুলি কারণ দেওবন্দ আসার সময় তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, আরবী পড়লে বাড়ী থেকে টাকা পয়সা দিবে না। কাজেই পড়বেন কিভাবে? তাই ঐ সময়ই চিন্তা করেছিলেন মজদুরী করবো। তাতে যা পাওয়া যাবে, অর্ধেক উস্তাদকে হাদিয়া দিব এবং বাকী অর্ধেক দ্বারা খাবার ব্যবস্থা করবো। সুতরাং কুলি দিয়ে আর কি দরকার আমিতো নিজেই কুলি। মনে মনে এই কথা বলে, লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিজেই ট্রাংক ইত্যাদি মাথায় করে দেওবন্দের দিকে রওয়ানা

দিলেন এবং অতীতের ফেলে আসা দিনগুলোর চিন্তা ভাবনা করতে করতে মাদ্রাসার নিকটে এসে পৌঁছে গেলেন। মাদ্রাসার দৃশ্য একটু দূর থেকে দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। যেন কি এক মোহময় আকর্ষণে মাদ্রাসা সকলকে কাছে টানছে।

দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্রদের ব্যবহার

আর অল্প একটু দূরেই মাদ্রাসা দারুল উলূম দেওবন্দ। দূর থেকে একদল ছাত্র লক্ষ্য করল একটি ছাত্র যেন সামানপত্র মাথায় করে মাদ্রাসার গেটের দিকে আসছে। অমনি পলকের মধ্যে ছুটে আসল একই রকম পোষাকে সজ্জিত একদল ফেরেশতাতুল্য তালেবে ইলম। এসেই যেন কত যুগের পরিচিত আপনজন বিদেশ থেকে ঘরে ফিরেছে, সেভাবে সবাই কাড়াকাড়ি করে কেউ ট্রাংক, কেউ ছাতা, কেউ ঘটি হাতে তুলে নিলেন, কেউ ছালাম দিলেন, মোছাফাহা করলেন, একে একে সবাইই মো'আনাকা করলেন, যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। কোথায় বাড়ী, কি নাম, কি জন্য এসেছে কেউই একথা জিজ্ঞাসা না করে সবাই তাঁকে এক কামরায় নিয়ে তুলল, নাস্তার ব্যবস্থা করল, আদর করে বিছানা পেতে দিল। হালপুরছি করতে কেউ কেউ এগিয়ে এলো, অনেকে আবার বাধা দিয়ে বলল, ভাই ছাহেবকে এখন একটু বিশ্রাম করতে দিন, রেলের ছফর, অনেক কষ্ট হয়েছে, এখন আরাম করুক, বিশ্রামের পর আমরা সব কথা শুনবো। অনেকে বাহিরে চলে গেল। দু'একজন কামরায় খেদমতের জন্য রয়ে গেল। হুযুর বলেন, আমি অবাক হয়ে শুধু চিন্তা করছি, এই সেই স্বপ্নের দেওবন্দ, জান্নাতী বাগিচা কাছেমুল উলূমের ফসল, যা দূর থেকে শুনেছিলাম, মনে মনে যা ধারণা করেছিলাম, এ যে তার চেয়েও লক্ষ কোটি গুণে সুন্দর জান্নাত। এযে জান্নাতকে হার মানিয়ে দেওয়ার কারবার। এত উদার অমায়িক সহৃদয় হতে পারে মানুষ। এ যেন জান্নাতী ফেরেশ্তা। এমন ব্যবহার, এরকম আচরণ! শ্বশুর বাড়ীতেও কি এত আদর যত্ন মানুষ পায়? কত মহৎ এদের সবার হৃদয়, সবার একরকম আচরণ। কত সরল, সহজ, মধুর ব্যবহার এদের। কত ভাল মানুষ এরা। এমনটি দেখব এত বড় আশাতো ছিল না। শালীনতা, মধুরতা, মাধুর্যশীলতা, উদারতা, মহানুভবতায় আমি যেন কঠিন সাজাপ্রাপ্ত জেলখানা থেকে খালাস পেয়ে মায়ের কোলে স্নেহ-আদরের নিবিড় আবেষ্টনীর মাঝে মোহমুগ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছি। সবার সাথে পরিচিত হলাম। নিজের অবস্থা আদ্যোপান্ত সব খুলে বললাম। সবাই গভীর মমতা প্রকাশ করলেন, দরদভরা পরামর্শ দিলেন, হুযুর বলেন "জীবনে এ যেন প্রথম অমৃতের সাধ অনুভব করলাম। জীবনের ১০/১২টি বৎসর স্কুল কলেজে কাটিয়েছি কিন্তু হায় এ মানবতার তো একটি কানাকড়িও সেখানে মেলেনি। হিংসা বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, হৈহুল্লড়, মারামারি, রেশারেশী, স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, বেয়াদবী,

বেহায়েমী, অশ্লীলতা, বাচালতা, নীচতা প্রভৃতি মানবতাহীন পশু সুলভ আচরণই স্কুল কলেজে দেখেছি। অবশ্য সেখানে কিছু শিক্ষক এবং কিছু কিছু ছাত্র যে ভাল ছিল না, এ কথা বলছি না। অনেক ভাল ছাত্র শিক্ষক সেখানে রয়েছে, তবে সে ভালটা তাদের নিজস্ব, ঐতিহ্যগত, বংশগত বা পারিবারিক শিক্ষার কারণে হয়েছে। স্কুল কলেজের পাঠ্য সিলেবাস বা নিয়ম কানুনে যে কেউ ভদ্র নম্র হয়েছে, এটা বড় একটা পরিদৃষ্ট হয়নি।

এ কথা সত্য, একশত ভাগ সত্য যে, এই System of Education শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা ইংরেজ জাতি আমাদের ভারতবাসীকে মানুষ বানাতে বা মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে তৈরী করেনি, তৈরী করেছে এ শিক্ষা সিষ্টেম আমাদের এদেশবাসীকে অমানব বানাতে, গোলাম বানাতে, নিকৃষ্ট স্বভাবের ইতর বানাতে। এ জন্যই এ শিক্ষার দ্বারা ভাল ফলের আশা করা বৃথা।

অপর পক্ষে দেওবন্দ মাদ্রাসা যারা গড়েছেন, তারাতো এই বৃটিশ বেনিয়া জালেমদের ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য সম্মুখ যুদ্ধে অপারগ হয়ে মাদ্রাসার মাধ্যমে খাঁটি আল্লাহর সৈনিক, রাসূলের সৈনিক মর্দেমুমিন, মর্দে মুজাহিদ তৈরীর জন্যই এসব প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। এইসব মাদ্রাসার সিলেবাস, আদর্শ মানব গড়ার সিলেবাস। এইসব মাদ্রাসার মুরব্বীগণ বুঝেছিলেন সত্যিকারের কুরআন হাদীছের শিক্ষা, কুরআন হাদীছের মানবতার শিক্ষা থেকে ভারতের শাসকগোষ্ঠী, আমীর ওমারাগণ দূরে সরে এসে শয়তানের পরামর্শে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং স্বাধীনতা হারিয়ে গোলামে পরিণত হয়েছে। কাজেই তারা পণ করে ময়দানে নেমেছেন এবং এসব মাদ্রাসা কায়েম করে সত্যিকারের আদর্শ মানুষ গড়ার প্রচেষ্টায় লেগে গিয়ে জীবনপণ কাজ করছিলেন। যার দৌলতে জাতির মধ্যে চেতনা আত্মউপলব্ধি ফিরে আসল এবং সঠিক আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা ফিরে এল। দেওবন্দে হুযুর সত্যিকার মদীনার আখলাকের প্রদর্শনী প্রাণ ভরে দেখলেন, অনুধাবন করলেন। তাঁর হৃদয়- মন ঠান্ডা হয়ে গেল।

মুরশিদের সন্ধানে থানাভবন

দেওবন্দ তিনি রজব মাসে পৌঁছেছিলেন। ঐ মাসেই মাদ্রাসার ছবক শেষ হয়ে ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায় এবং রমজানের পর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময় আবার পরবর্তী বৎসরের পড়াশুনা শুরু হয়। তিনি চিন্তা ও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দীর্ঘ দুই মাস বন্ধের সময়টা দেওবন্দ না থেকে জগতের মোজাদ্দেদ কুতুবে দাওরান হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহঃ) দরবারে এ দু'মাস থাকার অনুমতি পেলে সৌভাগ্যের দ্বার খুলে যাবে। কারণ, থানভীর দরবারে কারো একদিন অবস্থান করতে হলেও তার

সূচিপত্র

কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হয়। এজন্য তিনি দেওবন্দ বসেই হুযুরের কাছে পত্র লিখে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পত্রটি নিম্নে দেওয়া হলো।

দেওবন্দ মাদ্রাছা হতে
রজব মাস (১৯২২ সাল)

শ্রদ্ধেয় জনাব হুযুর,

রিক্তের ছালাম ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আশা করি খোদার রহমতে ভালই আছেন। প্রত্যেক মানুষের চলার পথে একজন অভিভাবক ও পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। আর আমি হুযুরকেই আমার জীবন পথের একমাত্র মুরব্বী এবং সহায়ক বলে নির্বাচন করেছি। আশা করি অধম ছন্নছাড়া তা থেকে বিফল মনোরথ হবে না। আমি আরও আশা করি এখন থেকে হুযুরের খেদমতে কিছু দিন অবস্থানের অনুমতি প্রদান করে রিক্তকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখতে মর্জি হয়।

ইতি
আপনারই একান্ত বাধ্যগত
খাদেম, শামছুল হক ফরিদপুরী

পত্র যথাসময় থানাভবন গিয়ে পৌছল। থানভী ছাহেব পত্রটি পড়ে খুশী মনে হুযুরকে থানাভবন আসার অনুমতি দিয়ে দিলেন। রজব মাসের পনের তারিখে হুযুর দেওবন্দ থেকে থানাভবন দীর্ঘ ১৮ মাইল পথ পদব্রজে গমন করে হযরতের দরবারে হাজির হলেন এবং তথায় হযরত থানভীর ছুহবতে দীর্ঘ দুই মাস বিশ দিন অবস্থান করে জীবনের স্বাদ মিটিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের গভীর জ্ঞান লাভ করলেন। তিনি এ দরবারে এসে যেন দিব্য দৃষ্টি লাভ করলেন। এক নুতন জগতের জ্ঞান প্রদীপ জ্বলে উঠল। থানভী (রহঃ)-এর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি থানভী ছাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন "হুযুর! আমি কোন মাদ্রাসায় পড়াশুনা করবো? উত্তরে তিনি বললেন "দেওবন্দ মাদ্রাসায় উপর শ্রেণীর পড়াশুনা ভাল হয় আর সাহারানপুর মাদ্রাসায় নিম্ন শ্রেণীগুলির পড়াশুনা ভাল হয়। এখম তোমার যেখানে সুবিধা হয়, সেখানে গিয়ে পড়াশুনা কর।" থানভী (রহঃ) আসবার সময় আরও বললেন, "তোমার অন্যান্য যত সমস্যা আছে, তা পরে সমাধা করতে পারবে, এখন শুধুমাত্র পড়াশুনার প্রতি লক্ষ্য রাখ।"

সাহারানপুর মাদ্রাসায় গমন

মুজাহিদে আযম কাল বিলম্ব না করে থানাভবন থেকে সাহারানপুর মাদ্রাসায় হাজির হলেন এবং ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে জামায়াতে কাফিয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। পড়ার প্রথম থেকেই তিনি না বুঝে একটি শব্দও পড়তেন না। তিনি তখন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কোন মাসআলার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ইয়াদ না হওয়া পর্যন্ত এবং স্পষ্ট বুঝে না আসা পর্যন্ত সামনের দিকে অগ্রসর হবেন না। তিনি বলতেন, অনেকের কাছে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছি; কিন্তু সঠিক সুন্দর উত্তর মেলেনি, এজন্য খেয়াল করলাম, আর কারও কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবো না, নিজে মাসআলা পাকাভাবে শিক্ষা করে মানুষকে বলবো।' সাহারানপুর মাদ্রাসায় পড়াশুনা ভালভাবে চলতে লাগল। এখানে মাদ্রাসার নাজেম হযরত মাওলানা আছাদুল্লাহ ছাহেবের কামরায় থেকে পড়াশুনা করতেন। মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক ছিলেন জগত বিখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা খলীল আহমদ ছাহেব সাহারানপুরী (রহঃ)। সাহারানপুর মাদ্রাসায় পড়া অবস্থায় হুযুর ভীষণ পরিশ্রম করে পড়তেন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি সকলকে অবাক করে দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মাদ্রাসার একজন সেরা ছাত্ররূপে পরিগণিত হলেন। ছাত্র শিক্ষক সবার অত্যন্ত আদরের ও গর্বের পাত্রে পরিণত হলেন। সাহারানপুর পাঠ্য অবস্থায় পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না; আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চাসনে আরোহনের জন্যও তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। সাহারানপুর পড়ার জামানায় তিনি সর্বদা আত্মার উন্নতির চেষ্টা করতেন।

আল্লাহর প্রেমে প্রতি বৃহস্পতিবার

সাহারানপুর মাদ্রাসায় অবস্থানকালে তিনি সর্বদা হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহঃ)-এর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা ছুটির পর প্রতিদিনের বেঁচে যাওয়া টুকরা বাসি রুটিগুলো গামছায় বেঁধে থানাভবনের পথে রওয়ানা হতেন। দীর্ঘ ৩৫ মাইল পথ, সে জামানায় কোন ভাল রাস্তাঘাটও ছিল না, কোন প্রকার যানবাহনও ছিলো না, পায়ে হেটে অতিক্রম করে থানাভবন পৌঁছতেন। রাত্র এবং পরের দিন শুক্রবার জুম্মার নামায পর্যন্ত থানভী (রহঃ)-এর ছুহবতে কাটিয়ে জুম্মার নামায হযরতের পিছনে পড়ে দোয়া নিয়ে মোছাফাহা করে আবার সাহারানপুরের পথে রওয়ানা হতেন। এই দীর্ঘ পথ প্রতি বৃহস্পতিবার অতিক্রম করে থানাভবন গমন করতেন এবং শুক্রবার জুমা বাদ আবার

সাহারানপুর রওয়ানা হতেন। প্রথম প্রথম অনেক সময় পথ ভুলে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং গভীর রাত্রে থানাভবন পৌঁছেছেন। তবুও দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে একটি বৃহস্পতিবারও বাদ দেননি। পথে কত শত বিপদ হয়েছে, পথ ভুলেছেন, পায়ে কাটা বিধেছে, পথে জখমী হয়ে বসে রয়েছেন, তবুও তাঁর এ গতিকে কেউ স্তব্ধ করতে পারেনি। আল্লাহর গুণগান করতে করতে, আল্লাহর প্রেমের পাগল হয়ে বিশ্ব বিখ্যাত আল্লাহর প্রেমিকের দর্শনার্থে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ছুটে চলে যেতেন। দীর্ঘ চারটি বৎসর এইভাবে কাটিয়ে জামাতে উলা মেশকাত শরীফের জামায়াত পর্যন্ত তিনি সাহারানপুরে পড়াশুনা করেন।

উস্তাদের সান্ত্বনা

যে বৎসর তিনি ফেকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব কুদুরী ইত্যাদি পড়েন, সে সময় কুদুরী কিতাবের পড়ানোর দায়িত্ব যে উস্তাদের উপর অর্পিত হয়, তিনি ফেকাহ শাস্ত্রকে বেশী গুরুত্ব দিতেন না। এইজন্য হুযুর চিন্তা করলেন তিনি যখন ফেকাহ শাস্ত্রকে বেশী পছন্দ করেন না, কাজেই তাঁর নিকট ফেকার কিতাব পড়ে বেশী স্বাদ পাওয়া যাবে না। কাজেই তাঁর কাছে এই কিতাব না পড়ে যিনি ফেকাহ পছন্দ করেন, ঐরূপ এক জনের কাছে পড়ার মনস্থ করলেন এবং সাথী ছাত্র ভাইদেরকে বুঝিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে মাদ্রাসার মুরব্বী হযরত মাওলানা খলীল আহমদ ছাহেবের বাড়ীতে ছাত্রদের নিয়ে হাজির হলেন। তিনি ছাত্রদের কথা মনযোগ দিয়ে শুনে বললেন "আমি যথাসম্ভব যাকে দিয়ে যা পড়ান যায়, তাকে তাই দিয়েছি এটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এরপর সবাই মাদ্রাসার দিকে আসলেন পথে হুযুর বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কারণ যে উস্তাদের কিতাব পাল্টানোর চিন্তা করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই একথা জানতে পারবেন তখন, সে উস্তাদের সামনে কোন মুখ নিয়ে হাজির হবেন- এই চিন্তায়ই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। ছেলেরা তাকে ধরাধরি করে মাদ্রাসায় নিয়ে আসলেন। হুঁশ হলে যে উস্তাদের কিতাব বদলানোর জন্য হুযুর দরখাস্ত করেছিলেন, তিনি ঐ দিনই হুযুরকে ডেকে কামরায় নিয়ে গেলেন এবং হাত ধরে বুঝিয়ে বললেন, তুমি কোন চিন্তা করো না, আমি যথাসাধ্য তোমাকে কিতাব বুঝানোর চেষ্টা করবো। এই দেখ, ঐ কিতাবের সমস্ত শরাহ শরুহাত আমি জমা করেছি প্রয়োজন হলে সারারাত্র মোতাআলা-অধ্যয়ন করে তোমাকে পড়াবো। তুমি না বোঝা পর্যন্ত ছবক ঐখানেই থাকবে। ইনশাআল্লাহ তোমার কোনই অসুবিধা হবে না। এইভাবে অনেকক্ষণ সান্ত্বনা দিলেন এবং বুঝালেন।

—৫

সাহারানপুর থেকে দেওবন্দ

হযরত থানভী (রহঃ) বলেছিলেন সাহারানপুরে নিচের দিকের পড়াশুনা ভাল হয় এবং দেওবন্দে উপরের দিকে পড়াশুনা ভাল হয়। এ কথা মনে রেখে হুযুর মেশকাত শরীফ পড়া শেষ করে দেওবন্দ যাওয়ার ইরাদা করলেন। সাহারানপুরে অবস্থানকালে হুযুর প্রত্যেক ক্লাশেই প্রথম হতেন। শুধু প্রথমই নয় সমস্ত মাদ্রাসার মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর লাভ করতেন। এ জন্য ওস্তাদগণ হুযুরের দেওবন্দ যাওয়ার কথা শুনে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করলেন। স্বয়ং মাদ্রাসার মুরব্বী হুযুরকে অনেক বুঝালেন। হুযুর বললেন, আমি হযরত মাওলানা এজাজ আলী ছাহেব শায়খুল আদব ছাহেবের কাছে প্রাইভেটভাবেও কিছু কিতাব পড়বো। তখন মুরব্বীগণ খুশীর সাথে দেওবন্দ যাওয়ার অনুমতি দান করলেন। দেওবন্দ যাওয়ার পূর্বে শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলী (রহঃ)–এর কাছে পত্র দিয়ে জানালেন যে, হযরত আমি সাহারানপুর থেকে দেওবন্দ আসছি, আমি ওখানে দাওরা হাদীছ পড়বো কিন্তু প্রাইভেটভাবে আপনার কাছে হেদায়ার শেষ দুই অংশ পড়তে চাই। আপনি যদি রাজী হন, তাহলে আমি চলে আসি। হযরত রাজি হয়ে দেওবন্দ আসার জন্য পত্র লিখলেন এবং বললেন, ঠিক আছে আমি তোমাকে হেদায়া কিতাবের শেষের দুই অংশ প্রাইভেটভাবে পড়িয়ে দিব। অতঃপর হুযুর দেওবন্দ যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করলেন।

চার বৎসরে ২০৮ বার থানাভবন গমন

মুজাহিদে আযম যে চারটি বৎসর সাহারানপুরে পড়াশুনা করেছেন, ঐ চার বৎসরে প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলে থানাভবন ৩৫ মাইল হেটে গমন করেছেন এবং জুমার নামায থানভী ছাহেবের পিছনে পড়ে বিকেলেই ৩৫ মাইল পথ হেটে রাত্রের অন্ধকারে মাদ্রাসায় পৌঁছে পরের দিনের পড়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। জীবনে বিনা মোতাআলায় একটি ছবকও পড়েননি। চার বৎসরে তিনি মোট ২০৮ বার থানাভবন গমন করে থানভীর (রহঃ) ফয়েজ হাছিল করেছেন। এতে দেখা যায় পীরের ছুহবত হাছেলের জন্য চার বৎসরে হুযুর মোট ৭২৮০ সাত হাজার দুইশত আশি মাইল পায় হেটেছেন শুধুমাত্র থানভী ছাহেবের দুটো কথা শোনার জন্য। এ সমস্ত মহামানবের জীবন স্বর্ণের মত উজ্জ্বল হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি?

থানভী সাহেবের হাতে বায়য়াত গ্রহণ

১৯২২ সালে রজব মাসে দেওবন্দ থেকে থানভী ছাহেবের এজাযত নিয়ে প্রথম যেদিন থানাভবন পৌঁছেন ঐ দিনই হযরত থানভী (রহঃ) হযরত মাওলানা শামছুল

হক ছাহেবকে বায়য়াত করে নেন। এইরূপ বায়য়াত করা থানভী (রহঃ)-এর জীবনের প্রথম ঘটনা। কারণ একেত থানভী ছাহেব কাউকেও ছাত্র অবস্থায় বায়য়াত করতেন না। দ্বিতীয় যারা ছাত্র জীবন শেষ করে আলেম হয়েছেন, তাদেরও সহজে বায়য়াত করতেন না। ৮/১০ বৎসরও বায়য়াত হওয়ার জন্য ঘুরতে হতো। কিন্তু হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) থানাভবন পদার্পণ করেই এমন এক আশেকানা পাগলা দিল নিয়ে হযরতের সাথে মিলেছিলেন যে, হযরত থানভী (রহঃ) সমস্ত উছুল বাদ দিয়ে সাথে সাথে মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে বায়য়াত করে নেন। হযরত মাওলানা মাদ্রাসায় পড়তে এসেছেন ভর্তি হবেন এখনও ভর্তি হননি জীবনে প্রথম মাত্র থানাভবন এসেছেন, এর পূর্বে মাত্র এক নজর কলিকাতায় হযরতকে দেখেছেন। এছাড়া আর কোন যোগাযোগ নেই অথচ সাথে সাথে যে বায়য়াত করে নিলেন এটা মাওলানা ফরিদপুরীর কামালাত ও সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। 'রক্তে রক্ত চিনে।' হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) হযরতের দরবারে বসেই আরজ করলেন, 'হযরত মায় ইছলাহ চাহ্তাহো', হযরত ইছলাহ চাই। থানভী (রহঃ) বললেন আ, যাও অর্থাৎ আস এবং সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতে হাতে বায়য়াত করে নিলেন। একেই বলে ভাগ্য।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী আইনের কিতাব দু'বার উস্তাদের কাছে পড়ার পর ৬৫ বার গভীরভাবে অধ্যয়ন।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সাহারানপুর মাদ্রাসায় ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠতম কিতাব হেদায়া সম্পূর্ণ এক একটি ছবক করে পড়ে শেষ করেন এবং পরীক্ষায় শতকরা একশত নম্বর তো লাভ করেন এবং এত সুন্দর পরীক্ষা দেন যে, পরীক্ষক সন্তুষ্ট হয়ে আরও ৪/৫ নম্বর পুরস্কার স্বরূপ দেন। এইভাবে পুরা আইনের কিতাব শেষ করার এবং কৃতিত্বের সাথে ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করার পর বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী আইন বিশারদ দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ও আইন বিভাগের প্রধান শায়খ হযরত মাওলানা এজাজ আলী ছাহেব (রহঃ)-এর কাছে হেদায়া কিতাবের শেষের দুই অংশ দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে একা একা প্রাইভেটভাবে পড়েন। অতঃপর হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব (রহঃ) একাধারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চার অংশ ব্যাখ্যা সহ ৬৫ পঁয়ষট্টিবার গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এ জামানায় এরূপ পড়াশুনার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া বিরল। এই জন্যই দেখা যায় যখন তিনি শেষ বয়সে চোখে একটু কম

দেখতেন ঐ সময়ও হেদায়ার কঠিন কঠিন মাসআলা এবারতসহ মুখে মুখে না দেখে বলে দিতেন, বুঝিয়ে দিতেন।

ওয়াজ করার অনুমতি চেয়ে সাজা প্রাপ্তি

সাহারানপুর মাদ্রাসা থেকে জামাতে উলা কৃতিত্বের সাথে পাশ করার পর একদিন থানভী (রহঃ)-এর দরবারে দরখাস্ত করলেন, হযরত অনেক জায়গায় অনেক মাহ্‌ফিলে লোকে আমাকে ওয়াজ করার জন্য পিড়াপীড়ি ও অনুরোধ করে; কিন্তু আপনার কোন অনুমতি গ্রহণ করিনি বলে ওয়াজ করি না। এ বৎসর হাদীছের কিতাব মেশকাত শরীফ পড়া শেষ করেছি; এখন লোকে যদি অনুরোধ করে ওয়াজ করার জন্য, তবে তাতে হুযুরের অনুমতি আছে কি না জানতেচাই। এই পত্র পাওয়ার পর হযরত থানভী (রহঃ) মুজাহিদে আযমকে লিখলেন "আমার পত্র পাঠ মাত্র ছয় মাস পর্যন্ত তুমি কারো সাথে কোন প্রকার প্রয়োজনীয় কথা এমনকি খাবার ব্যাপারেও কোন প্রকার কথা বলতে পারবে না। আজ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত তোমার যাবতীয় কথাবার্তা একদম বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র ছবক বোঝার জন্য উস্তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে, কথা বলতে পারবে, অন্য কোন কথা নয়। পত্র পাঠ মাত্র হুযুর পীরের নির্দেশে সমস্ত কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। তিনি বলেন, আমি ছয় মাস একদম কথা বলিনি কিন্তু তাতে আমার কোন প্রকার অসুবিধা হয়নি। হুযুর ঐ সময় সাহারানপুর মাদ্রাসা থেকে দেওবন্দ এসেছেন এখনও খানা জারি করেননি এই অবস্থায় হুযুর বলেন খাবার সময় হলে একটা সাদা পোষাক পরা লোক হাত ধরে টেনে নিয়ে খানা খাওয়ায়ে দিত। কিন্তু যে দিন ছয় মাস শেষ হলো, ঐ দিন থেকে আর ঐ সাদা পোষাকওয়ালা লোকটিকে দেখতে পেলাম না।

উয়োহ মেরা উস্তাদ থা

একবার বাংলাদেশ তথা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর একজন শাগরেদ সাহারানপুর মাদ্রাসায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য গমন করেন। তিনি সাহারানপুর মাদ্রাসার নাজেমে আলা মুহতামিম ছাহেব হযরত মাওলানা আছাদুল্লাহ খাঁন ছাহেব, যিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর উচু দরজার খলীফা ছিলেন, তার সাথে সাক্ষাত করে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন "হুযুর, হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছাহেব আমার উস্তাদ তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন আপনি তার সম্মানীত উস্তাদ। এই কথা শুনে হযরত মাওলানা আছাদুল্লাহ

খাঁন ছাহেব যিনি হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের উস্তাদ ছিলেন, চীৎকার করে বললেন, কৌন কাহ্তা হ্যায় মায় উন্‌কা উস্তাদ হ্যায়? ম্যায় খোদা কি কসম খা কর কাহ্তাহোঁ উহ মেরা উস্তাদ থা, উহ্ মেরা উস্তাদ থা, উহ্ মেরা উস্তাদ থা এবং আরও বললেন "আমি তাঁর থেকে কামুস দেখা শিখেছি অমুক জিনিস শিখেছি অমুক বিষয় শিখেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। ছাত্রের প্রতি কত বড় আযমত এবং সম্মান থাকলে উস্তাদে ছাত্র সম্পর্কে এই ধরনর মন্তব্য করতে পারেন। হযরত মাওলানা আছাদুল্লাহ খান ছাহেব কত বড় আল্লাহর অলী এবং হযরত থানভীর (রহঃ) বড় দরজার খলীফা এবং সাহারানপুরের মত এতবড় মাদ্রাসার মুহ্তামিম হওয়া সত্ত্বেও নিজের দীর্ঘ দিনের ছাত্র হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে ছাত্রের পরিচয় তো স্বীকার করলেনই না বরং ছাত্রকে খোদার কসম খেয়ে উস্তাদরূপে পরিচয় দান করলেন। কত বড় ইখলাছ ও বুযুর্গী থাকলে মানুষ এ দরজায় পৌছতে পারেন এবং এমন কথা অম্লান বদনে বলতে পারেন, অপরদিকে যে ছাত্রটিকে তিনি গর্বের সাথে সেই ছাত্রের কাছে উস্তাদ বলে স্বীকার করে নিলেন, সেই ছাত্রটির মর্তবাই বা কত উর্ধ্বে। আল্লাহপাক উভয়ের দরাজাত বুলন্দ করে আলায়ে ইল্লীনে স্থান দান করুন, উভয়কে জান্নাতুল ফেরদাউছের উঁচু মকাম দান করুন এবং আমাদের মত নালায়েক নাদানদেরকে ঐ মহামানবদ্বয়ের জুতা খড়মের জায়গায় সামান্যতম স্থান দান করুন, আমীন। ছুম্মা আমীন!!

দেওবন্দ মাদ্রাসায় দুই বৎসর

আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসায় পুরা দুই বৎসর পড়াশুনা করেন। উভয় বৎসরই তিনি হাদীছ শরীফ পড়েন। দেওবন্দ মাদ্রাসায় শেষ বৎসর ছিহাছেত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছের কিতাব এক বৎসরেই পড়ান হয়। ঐ সময় একই বৎসরে পড়ান হতো। কিন্তু হযরত মাওলানা এক বৎসরে সব হাদীছ না পড়ে ভাগ করে দুই বৎসরে সমস্ত হাদীছের কিতাব পড়েন এবং প্রথম বৎসর প্রাইভেটভাবে হযরত মাওলানা এজাজ আলী ছাহেবের কাছে হেদায়া আখেরাইন পড়েন। হাদীছের কিতাবসমূহ তিনি বিনা মোতাআলায় (অর্থাৎ আগামী ছবককে আগের থেকে পড়ে বুঝে ছবকে যাওয়া) কোন দিনও পড়েননি। একটা একটা শব্দ জিজ্ঞেস করে বুঝে বুঝে তাহ্কীক করে করে পড়েছেন। প্রত্যেক কিতাবের যত প্রকার ব্যাখ্যার কিতাব শরাহ শরুহাত আছে, সমস্ত শরাহ পুংখানুপুংখরূপে দেখে বুঝে ছবকে যেতেন। কোথাও বুঝে আসেনি অথচ ছবক আগে বেড়েছে এমনটি কোন দিনই হয়নি বরং বুঝে না আসলে এক ছবক সাত

আট দিন পর্যন্ত চলেছে। না ছাত্রদের ক্লান্তি ছিল, না উস্তাদের কোন প্রকার বিরক্তিভাব ছিল। হুযুর সারাজীবন সব জাতীয় পড়ায় কোনদিন দ্বিতীয় হননি, কি ইংরেজী পড়ার জীবনে, কি আরবী পড়ার জীবনে, কি সাহারানপুরে, কি দেওবন্দে সব জায়গাই ওস্তাদগণের চরম পরম স্নেহ ধন্য হওয়ার সাথে সাথে ক্লাশেও প্রথম স্থানের অধিকারী হতেন। চরিত্রে, আচার ব্যবহারে উস্তাদ মান্যতায় উস্তাদের খেদমতে সব সময় হুযুর প্রথম কাতারে শামিল থেকে উস্তাদগনের স্নেহ ধন্য হয়েছেন।

উস্তাদ ভক্তির বিরল দৃষ্টান্ত

একবার কোন কারণে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ষ্টাইক হয়ে গেল। ছেলেরা সবাই একযোগে ছবকে না গিয়ে সব জায়গায় শুয়ে গেল যাতে উস্তাগণ ক্লাশে না যেতে পারেন। কয়েকদিন এইভাবে অতিবাহিত হলো। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর দাওরায়ে হাদীছ পড়েন। শেষ বর্ষের ছাত্র। সমস্ত ছেলেরা হরতাল পালন করে রাস্তায় শুয়ে গেল, কিন্তু মুজাহিদে আযম ছাত্রদেরকে বললেন, এটা করো না, এটা জায়েজ নয়, আমি তোমাদের সাথে এই কাজে শরীক থাকবো না। হরতাল করবো না" এবং তিনি ঘোষণা দিলেন "যদি আমার একজন উস্তাদও ছবক পড়াতে দরছগাহে যান, তাহলে আমিও দরছগাহে অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে ক্লাসে যোগদান করবো, এতে যদি তোমরা আমাকে বাধা দাও তোমাদের বুকের উপর দিয়ে মার্চ করে হলেও ক্লাশরুমে আমি অবশ্যই গমন করব। তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলো, তবুও আমি শহীদ হওয়ার আগ পর্যন্ত ক্লাশের দিকে উস্তাদদের সম্মানের খাতিরে অগ্রসর হবো। এটা আমার দৃঢ় সংকল্প, এ থেকে আমাকে কেউ বিরত রাখতে পারবে না।" কি অমিত চেজা হিম্মত এবং উস্তাদ ভক্তি যে, শহীদ হয়ে গেলেও উস্তাদের সম্মান করতে ত্রুটি করবে না। আজকালতো উস্তাদ ভক্তি একেবারেই নেই।

আল্লামা হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এ সময় মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ ও ছদরে মোদাররেছ ছিলেন। তিনি কয়েক দিন এই অবস্থা দেখলেন। পরে একদিন সকলকে মসজিদে জমা করে জলদগম্ভীর স্বরে ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন "আগামীকাল থেকে তোমরা সবাই ছবকে যাবে। যদি তোমরা কেউ ছবকে না যাও, সব চলে যেতে পার, আমার একটি ছেলে আছে সে "মাওলানা শামছুল হক।" সে ছবকে যাবে। আর সে যদি ছবকে যায়, আমি অবশ্যই ছবক পড়াব। তোমাদের কারুর দরকার নেই। এই একটা ছেলেই মাদ্রাসার জন্য যথেষ্ট।' ইনিই আমাদের ছদর ছাহেব হুযুর।

ধ্যানে মগ্ন তাপস

একবার নোয়াখালীর তথা বঙ্গের অন্যতম বুযুর্গ বটতলী মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল, হযরত থানভী (রহঃ)-এর অন্যতম খলীফা মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব (বটতলীর জনাব ওয়ালা হুযুর) পাঁচ শতাধিক ছাত্রের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি বিশেষ কারণ বশতঃ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম (তিনি মাদ্রাসার শুরা পরিষদের সদস্য ছিলেন শুরার মিটিং-এ গিয়েছিলেন) সেখানে গিয়ে পরিচিত উস্তাদ ও ছাত্রদের কাছে জানতে পারলাম যে, মাওলানা শামছুল হক ছাহেব ফরিদপুরী দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম মেধাবী ছাত্র এবং বঙ্গদেশের সবচেয়ে সেরা ছাত্র। আমি সেখানকার কাজ সমাধা করে মাদ্রাসার মুহ্তামিম ছাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন দেশে চলে আসবো, তখন একজনকে বললাম মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে ডেকে আনতে পার, আমি তাকে একটু দেখে যেতাম। পরে তাকে ডাকতে নিষেধ করে আমি নিজেই তার কক্ষে গিয়েছিলাম তাকে দেখার জন্য, আলাপ করার জন্য। কিন্তু গিয়ে দরজায় উকি মেরে দেখলাম তিনি হাদীছশাস্ত্র এত গভীর মনযোগ সহকারে দেখছেন যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (একটু কিনারায় দাঁড়িয়ে) প্রায় দীর্ঘ দু'ঘন্টা তার মনযোগ সহকারে হাদীছ অধ্যয়ন দেখতে লাগলাম, তিনি এমন একাগ্রতার সাথে হাদীছ দেখছেন যে, আমি তার দরজায় দু'ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম সেদিকে তিনি ভুলেও দৃষ্টিপাত করলেন না বরং গভীর মগ্নতার সাথে এক ধ্যানে হাদীছের মধ্যে মগ্ন থাকলেন। এই অবস্থা দেখে আমি আর তাকে ডাকতে সাহসী হলাম না, কারণ এ ধ্যানে মগ্ন তাপসকে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায় না। মাওলানা আঃ হাফিজ ছাহেব ও মাওলানা আঃ রব ছাহেব হুযুরকে ট্রেনে পৌছে দিয়ে ফিরে এসে দেখেন তখনও তাপস ধ্যানে মগ্ন। তারা দুজন মাওলানাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জনাব আপনার এখানে কে এসেছিলেন জানেন? তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, না তো। তখন ঐ দু'জন বললেন, জনাব ওয়ালা হুযুর এসেছিলেন। তখন মাওলানা আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমাকে ডাকেননি কেন? তারা বললেন হুযুর নিষেধ করেছিলেন। পরে দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

হায়দ্রাবাদের চীফ জাষ্টিসের পদ প্রত্যাখ্যান

মাওলানা শামছুল হক ছাহেব এইরূপ অসাধারণ সাধনা করে জগত বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গ লাভ ও সর্বশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য অর্জন করে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে দেওবন্দ

থেকে সর্বশেষ পরীক্ষায় অত্যন্ত সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মাওলানা উপাধিতে ভূষিত হন। ঐ সময় হায়দ্রাবাদের নিজামের পক্ষ হতে হযরত মাওলানা হোসাইন আমহদ মাদানী ছাহেবের কাছে একজন যোগ্যতম আলেমকে সেখানকার চীফ জাষ্টিসের জন্য পাঠানোর পত্র এল। সব ওস্তাদগণ পরামর্শ করে হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে সেখানে চীফ জাষ্টিস পদের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত মাদানী (রহঃ) কয়েকজন বিশিষ্ট উস্তাদদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে ডেকে হায়দ্রারাবাদের চীফ জাষ্টিস পদে যোগদানে খোশখবরী জানিয়ে দিলেন। সবাই মনে করেছেন, মাওলানা শামছুল হক এ খবরে নিশ্চয়ই খুশী হবেন। বেতন তৎকালীন সময়ের ছয় শত টাকা, বর্তমানের ছয় লক্ষ হতেও বেশী। কিন্তু মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক ছাহেব এ খবর শুনে কেঁদে দিয়ে বললেন, "হযরত আপনাদের হুকুম আমার মাথার তাজ কিন্তু 'দেলে চায় বাংগাল পোর জঞ্জাল' আমি বাংলাদেশে গিয়ে আমার ভাইদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনবো। হুযুর আমার টাকার প্রয়োজন নেই।" হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) এই কথা শুনে খুব খুশী হলেন, কারণ মাওলানা ছিলেন মাদানী (রহঃ)-এর প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছাত্র। কাজেই তিনি বললেন, ঠিক আছে দেখা যাক বাংলাদেশ থেকে কোন আহবান আসে কি না? কিছুদিন পর কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে মাদানী ছাহেবের কাছে একজন শায়খুল হাদীছ চেয়ে পাঠালেন বেতন ৬০ টাকা।" হযরত মাদানী ছাহেব হুযুরকে ডেকে বললেন, "যাও ভাই এবার বাংলাদেশ থেকে ডাক এসেছে। বেতন ৬০ টাকা। মাওলানা শামছুল হক ছাহেব বললেন "আমি ইনশাআল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যাব কিন্তু এত টাকা দিয়ে কি করবো। আমার তো ১০ টাকা হলেই চলে যাবে। অগত্যা হযরত মাদানী বললেন, ঠিক আছে বাকী টাকা আমাকে দিয়ে দিও।" হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ৬০ টাকা বেতনে চলে আসলেন। পুরা বছর কাজ করে প্রতি মাসে দশ টাকা খরচ করতেন। বাকী ৫০ টাকা জমা করে রাখতেন। রমযান মাসে হযরত মাদানী (রহঃ) যখন সিলেট আসার পথে চাঁদপুর নামতেন ঐ সময় একদিন পূর্বে মাওলানা শামছুল হক ছাহেবও চাঁদপুর অপেক্ষা করতেন, হযরত মাদানী ছাহেব ষ্টীমার থেকে নামার সাথে সাথে হুযুর তার হাতে জমাকৃত ছয়শত টাকা দিয়ে দেশে আসতেন এবং কয়েক দিন দেশে থেকে থানাভবন রওয়ানা হয়ে যেতেন। এইভাবে হযরত থানভীর জীবদ্দশায় ছদর ছাহেব হুযুর (রহঃ) ২২ টি চিল্লা দিয়েছেন।

সূচিপত্র

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পীর শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ

হযরত ছদর ছাহেব হুযুর প্রায় সময়ই বলতেন "সারা রোয়ে জমীনের মধ্যে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শায়েখ হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এবং সারা বিশ্বের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ শায়খুল ইসলাম আল্লামা সাইয়েদ হুছাইন আহমাদ মাদানী (রহঃ)। এই দুইজন আমার জীবনের পথের দিশারী, মাথার তাজ। দু'জনকেই আমি একই রকম করে হৃদয়ে আসন দিয়েছি। এ দুজনকে ছেড়ে আমি আমার জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি না। সারা বিশ্ব খুঁজে আমার জীবন পথে চলার জন্য এ যুগল দিশারী আমার গর্বের সম্বল। এ দুইজনের চেয়ে বড় আমি কাউকে মনে করি না। আমার জীবনের যা কিছু লাভ হয়েছে, সেক্ষেত্রে এ দুজনের অবদানই সর্বাধিক। আমার পীর, আমার উস্তাদ।

উস্তাদ ভক্তির বিরল দৃষ্টান্ত
শত্রুর মুখে চুন কালি লেপন

শায়খুল ইসলাম আল্লামা হুছাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) বলতেন, "আমার একটি ছাত্র আছে, সে শামছুল হক। মাদ্রাসার সব ছাত্র যদি চলে যায় আর শামছুল যদি একাও থাকে, তবে আমি একা তাকেই পড়াব।" হযরত ছদর ছাহেব হুযুর হযরত মাদানী (রহঃ)–এর নিকট বুখারী শরীফ ও অন্যান্য কিতাবও পড়েন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দুই বুযুর্গদ্বয় হযরত থানভী (রহঃ) ও হযরত মাদানী (রহঃ)–এর চিন্তাধারার মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু উভয় বুযুর্গ পরস্পরের প্রতি ছিলেন অগাধ শ্রদ্ধাবান। কিন্তু একদল চাটুকার পরস্পরের কাছে বদনাম রটনা করত। এজন্য দুই বুযুর্গের শাগরেদদের মধ্যেও এখতেলাফ বা মতপার্থক্য দেখা দিত। কিন্তু এ মহান বুযুর্গ কোনদিনই একে অন্যের সম্পর্কে অতিশয় ভক্তিপূর্ণ সম্মানজনক শব্দ ব্যতীত আপত্তিকর সাধারণ একটি শব্দও ব্যবহার করেননি বরং প্রত্যেকেই অন্যকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করতেন এবং কথাবার্তা ও কাজকর্মেও স্পষ্টভাবে তা প্রকাশ পেত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা, চরম মহব্বত ও ভালবাসা। কিন্তু চাটুকারেরা কি না পারে। নিম্নের ঘটনাটি পড়লে তা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, চামচিকার দল চিরকালই আবাদ ঘর বরবাদ ও বিরান করতে চায়, এতেই তাদের সুবিধা। ঘটনাটি নিম্নরূপ–

হযরত থানভী (রহঃ) ও হযরত মাদানী (রহঃ)–এর মতপার্থক্যের জামানার ঘটনা। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর বলেন "ঐ সময় একদিন আমি খুব বড় একটি

তরমুজ খরিদ করে হযরত মাদানী (রহঃ)-এর খেদমতে হাদিয়া পেশ করার জন্য মাথায় করে নিয়ে চললাম। আমি যখন হযরত মাদানী (রহঃ)-এর গৃহের নিকটবর্তী হয়েছি এবং হযরত মাদানী (রহঃ) আমাকে তরমুজ মাথায় তার গৃহের দিকে অগ্রসর হতে দেখে তিনিও আমার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখন কয়েকজন চাটুকার দৌড়ে এসে হযরতকে বললেন, "হযরত তার হাদিয়া কবুল করবেন না, কারণ সে আপনাকে (নাউজুবিল্লাহ) কাফের বলে।" হযরত মাদানী (রহঃ) আগে বেড়ে আমার হাত থেকে তরমুজটি খুশীর সাথে তুলে নিলেন এবং চাটুকারদেরকে উদ্দেশ্যে করে বললেন "এর দ্বারা এমন কথা কশ্মিনকালেও হতে পারে না। তোমরা চুপ কর। তোমরাই বাড়াবাড়ি কর। এই কথা শুনে চাটুকাররা মুখ কালো করে আস্তে সরে পড়লো। হযরত মাদানী (রহঃ) আমাকে যত্ন করে বসালেন এবং খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর আমি হযরতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। দুনিয়ায় ফেতনা সৃষ্টির জন্য একদল লোক সর্বদা ব্যস্ত থাকে। ফেতনা না করতে পারলে যেন তাদের পেটের ভাত হজম হতে চায় না। রাতের ঘুম, দিনের আরাম তাদের হারাম হয়ে যায়। এই জাতীয় লোক সব জামানায়, সব জায়গায় পাওয়া যায়। এরাই জাতির একমাত্র শত্রু, দ্বীনের দুশমন, জগতের ফেতনা। এরা সুস্থ জায়গায় খোচা মেরে ঘা বানাতে বড় উস্তাদ। আল্লাহপাক এদের থেকে সকলকে বাঁচিয়ে রাখুন। এদেরকেও হেদায়েত করুন। আমীন।

দেওবন্দ থেকে থানাভবনঃ ছেড়া রুটির কেরেশমতী

হযরত মুজাহিদে আযম (রহঃ) সাহারানপুর মাদ্রাসা থেকে হযরত থানভী (রহঃ)-এর এজাজত নিয়ে শাওয়াল মাসের ১১ তারিখে দেওবন্দ আসেন। ঐ সময় হযরত থানভী (রহঃ)-এর নির্দেশে পড়াশুনার কথা ব্যতীত সব কথাবার্তা বন্ধ ছিল। ঐ সময় তিনি কিভাবে চলতেন, কিভাবে একজন বুযুর্গ আহারের সময় হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে খাইয়ে দিতেন একথা পূর্বেই জানতে পেরেছেন। দেওবন্দ উপস্থিত হয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় তিনি ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪৭ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে ফ্রি খানা পেয়ে গেলেন। খানা ও থাকা ফ্রি হওয়ার পরে তিনি নিশ্চিতে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। থাকার জন্য তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদের থাকার কামরাসমূহে না থেকে একটি অনাবাদ খোপের মত ছোট কামরা, যে কামরাটিকে মাদ্রাসায় কবরের কামরা বলা হতো- সেই কামরাটি পছন্দ করলেন এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পরি[illegible]র পরিচ্ছন্ন করে ঐ কামরায়

অবস্থান করলেন। ঐ কামরাটি আড়াই হাত চওড়া ছিল এবং কয়েক হাত লম্বা একটি কবরের মত ছিল। কবরের চেয়ে শুধু লম্বায় কয়েক হাত বেশী ছিল। যতদিন তিনি দেওবন্দ ছিলেন ঐ কামরাতে অবস্থান করেছেন। কামরাটিতে চওড়াভাবে বসলে একদিকের দেওয়ালে পিঠ লেগে যেত এবং অপরদিকে পা লেগে যেত। অন্য কোন ছাত্রের ঢুকারও সুযোগ ছিল না। শুধু পার্শ্বে কিতাব রাখা যেত। তাঁকে কবরখানার হুযুর বলা হতো। কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে কামরা থেকে বাইরে এসে কথা বলা লাগত। খানা আনয়ন এবং পেশাব পায়খানা ছাড়া তিনি কামরা থেকে বাহির হতেন না। সর্বদা কিতাব নিয়ে মশগুল থাকতেন। দেওবন্দ থেকে তিনি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ছুটির পর থানাভবন যেতেন। সেখানে জুমার নামায পর্যন্ত অবস্থান করে, জুমা বাদ আবার মাদ্রাসার দিকে রওয়ানা দিতেন। দেওবন্দ থেকে থানাভবন ১৮ মাইলের পথ। তিনি পায়ে হেটেই থানাভবন গমন করতেন। পুরা ছয় দিনের খানা থেকে কিছু কিছু রুটি বাঁচিয়ে শুকিয়ে রেখে দিতেন। দেওবন্দ পৌছে রুটির টুকরাগুলো এক বাসন পানির মধ্যে ভিজিয়ে মসজিদের ছাদে ঢেকে রেখে দিতেন এবং জুমার পূর্বে ছাদে গিয়ে গোপনে খেয়ে নিতেন। একদিন মসজিদের ছাদে উঠে তিনি গোপনে রুটি খাচ্ছিলেন কিন্তু যবের মোটা রুটির টুকরোগুলো পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখা সত্ত্বেও সেগুলো লোহার মত শক্ত ছিল। এজন্য তিনি সেগুলো ইট দ্বারা নরম গুড়ো করে পানিতে ধুয়ে খেতেন। ঐদিন ইট দিয়ে রুটি টুকরা করার টুক টুক শব্দ শুনে বটতলীর বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব (যাকে জনাবওয়ালা বলা হতো) কৌতুহলী হয়ে কিসের শব্দ জানার জন্য আস্তে আস্তে ছাদে উঠে গেলেন। জনাবওয়ালাকে দেখেই হুযুর চমকে উঠে তাড়াতাড়ি টুকরা রুটিগুলো গামছা দিয়ে ঢেকে ফেললেন। জনাবওয়ালা অনেক কষ্ট ও চেষ্টা করে আসল অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন এবং নিজের থেকে খানার ব্যবস্থা করতে চাইলেন কিন্তু হুযুর কিছুতেই অপরের খানা খেতে রাজী হলেন না। কি অসাধারণ সাধনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ। আমরা তো সামান্য কষ্টেই কাতর হয়ে পড়ি। আর হুযুর এত কষ্ট ও সাধনা করেও কোন সময়ই একটুও মুখ মলিন পর্যন্ত করেননি, সবই হাসিমুখে সহ্য করে সর্বদা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেছেন।

একটি ইলমের জাহাজ বাংলায় যাচ্ছে

দেওবন্দ থাকা অবস্থায় সর্বদা তিনি শুধু পাঠ্য পুস্তক শরাহ্ শরুহাত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না, বরং সব সময় কুতুবখানার যাবতীয় কিতাব অধ্যয়ন করতে চেষ্টা

করতেন এবং সর্বদা কুতুবখানায় ও কামরায় পড়ে থাকতেন। ফারেগ হয়ে যখন দেশে রওয়ানা হন, তখন এক বুযুর্গ বলে উঠলেন, "বাংলাদেশে একটি ইলমের জাহাজ যাচ্ছে।" দেওবন্দ পড়াশুনার সময় পড়াশুনা এবং গবেষণায় এমন মত্ত থাকতেন যে, অন্য কোন দিকে খেয়াল থাকত না। একদিন তিনি কিতাব কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিলেন। জামা পিছন দিকে ছিড়ে দু' টুকরো হয়ে দুই দিকে বাতাসে উড়ছে, ছেলেরা এই অবস্থা দেখে একে অপরকে দেখিয়ে হাসৃছে কিন্তু তাঁর সে দিকে কোন লক্ষ্য নেই। শুধু কিতাব নিয়েই মশগুল থাকতেন। কিতাবের সাথে সম্পর্কের কারণে সব ভুলে থাকতেন। প্রত্যেকটা মাসয়ালা এমনভাবে পড়তেন যে, শেষ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত না পৌঁছে ছাড়তেন না। জীবনে তাঁর একমাত্র সম্বল কিতাব। শুধু কিতাব জমা করেননি, কিতাব হাতে পেলেই তার খুটিনাটি ইয়াদ করে এরপর হাতছাড়া করতেন। তিনি বলতেন, আলেমের মৃত্যুর সময় দেখা যাবে তার বুকের উপর কুরআন মাজীদ বা বুখারী শরীফ রয়েছে।

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহঃ)-এর শিষ্যত্ব

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিছ হযরত আনোয়ার শাহ ছাহেব (রহঃ)-এর কাছে হুযুরের হাদীছ পড়ার খুব আকাংখা ছিল। পড়াও শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত শাহ ছাহেব ঐ বৎসরই ডাবেল চলে যান। এ জন্য মাত্র ১৭ বা ২২ ছবক মাত্র হুযুরের কাছে পড়েছিলেন। ঐ সময় শাহ ছাহেব ডাবেল হিজরত করে গেলে অনেক ছাত্র তাঁর সাথে দেওবন্দ থেকে ডাবেল চলে যান। কিন্তু হযরত ছদর ছাহেব হুযুর দেওবন্দ মাদ্রাসার মায়া কাটিয়ে ডাবেল যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং দেওবন্দই থেকে যান। দেওবন্দেই সমস্ত হাদীছের কিতাব পড়েন।

হেকিমী চিকিৎসা শাস্ত্র বা ইল্‌মে তীব অধ্যয়ন

দেওবন্দ মাদ্রাসায় হুযুর ইল্‌মে তীব বা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র একটি কঠিন সাবজেক্ট। কিন্তু হুযুরের কাছে তা পানির মত সহজ ছিল। অতি অল্প দিনেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে সনদ অর্জন করেন। হেকিম ছাহেবের নিকট হুযুর খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। হেকিমী শেষ করে সার্টিফিকেট অর্জন করে তিনি বড় একজন চিকিৎসাবিদ হন। কিন্তু আল্লাহ যাকে জগতের একজন মহান আধ্যাত্মিক চিকিৎসক বানাবেন বাহ্যিক-শারীরিক চিকিৎসাশাস্ত্র তাকে আকর্ষণ করে ধরে রাখতে পারেনি। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি এমনভাবে ডুবেছিলেন যে, বাহ্যিক জগতকে তিনি অতি নগন্য মনে করে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেই ক্ষান্ত হন। ব্যবহারিক জগতে আর অগ্রসর হননি।

সাত কিরাতের সনদ হাছিল

দেওবন্দ মাদ্রাসার জনাব মরহুম কারী আব্দুল অহিদ ছাহেবের কাছে তিনি হাফসের রেওয়ায়েত সমাপ্ত করে কিরাতে সাবার সাত কিরাতের সনদ হাছিল করেন।

মুমিনবাড়ীর মরহুম কারী হযরত মাওলানা ইব্রাহীম ছাহেব সাত কিরাতের কিতাব সাতবীর হাশিয়া সহ শরাহ লিখে এর অনুমোদনের জন্য হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি এর একটি সুন্দর অনুমোদনপত্র এবং ভূমিকা লিখে দেন।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর দরবারে ইজাযত বা খেলাফত

ইল্‌মে মারেফাতের ময়দানে একমাত্র কাজ নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া। এই কাজটি হযরত ছদর ছাহেব (রহঃ) অত্যন্ত স্বার্থকতার সাথে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কোন কোন সময় বলতেন, পীরের দরবারে যতদিন খেলাফত লাভ না হয়, ততদিনই নিজের ইছলাহ হওয়ার পূর্ণ সুযোগ থাকে, অবকাশ থাকে। যখন আনুষ্ঠানিক খেলাফত প্রাপ্তি হয়, তখন পীরের দরবারে মুরীদের একটা জাহেরী মর্যাদা লাভ হয়। তখন পীর ঐ মুরীদকে কঠোরভাবে ডাট দাপট করা থেকে বিরত থাকেন। হুযুর বলতেন, "থানভী দরবারে অনেকে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করতেন, এতে অতি সহজেই খেলাফত হাছিল হতো কিন্তু হুযুর বলতেন থানভী (রহঃ)-এর দরবারে এমন কোন কোন বান্দা এসেছেন, যারা সারাটি জীবন পীর থেকে শুধু লাভবানই হয়েছেন এমন কথা কোনদিন পীরের কাছে বলেননি, যাতে পীরের মুরীদের প্রতি বে-ফেকের হতে পারেন বা মোতমায়েন হতে পারেন এবং জাহেরী এজাজত দিতে পারেন। বরং সর্বদা পীরকে ছুয়ে জীনের ভিতর লাগিয়ে রেখে সর্বদা ইছলাহের ফায়দা হাছিল করেছেন। নিজের ভিতরকার দোষত্রুটি যার ইছলাহ হয়েছে, তবুও যেন পূর্ণভাবে ইছলাহ হয়নি এইভাবে দেখিয়ে শুধু তারাক্কীর ও মাকামাত এর উর্ধ্ব দরজায় পৌছার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং নিজের সন্দেহকে আরও কুড়িয়ে কুড়িয়ে ফনাও করে দেখিয়ে নেয়ামত ও দৌলত হাছিল করেছেন। কোন সময়ই পীরের কঠোর নেগরানীকে নরম করবার সুযোগ দেননি। খামাখা সন্দেহ করে করে শুধু ইছলাহ গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন, "হযরত থানভী (রহঃ)-এর দরবার থেকে আমার এমন কোন রগ রেশা বা লোমকূপ নেই যে, সেখানে তিনি অপারেশন বা ইনজেকশন করেননি। জীবন ভরই নিজেকে জলিল ও খার করে শুধু লাভের ইছলাহের ভিখারী

হয়ে ঐ দরবারে পড়ে থেকেছি, ইছলাহ হয়ে গেছে; এমন ধারণা এক মুহূর্তের জন্যও হৃদয় কোনে আসতে দেইনি। ঐ দরবার ছিল লাভের, পাওয়ার, ইছলাহের দরবার। খেলাফতের চিন্তা কোনদিনই মনে আসেনি বা মনে ঐ চিন্তার প্রশ্রয় দেইনি।"

তবুও হযরত হুযুরকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন এবং ভালবাসতেন। একদিন হযরত থানভী (রহঃ) হযরত ছদর ছাহেব হুযুরকে মহব্বতে অতিশয্যে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগের সংগে বললেন, 'তু মেরী সারে বাতে দুনিয়া মে ফায়লানা' অর্থাৎ তুমি আমার সমস্ত কাজ ও কথাকে সমস্ত দুনিয়ায় বিস্তার করো" এর চেয়ে বড় খেলাফত আর কি হতে পারে? তবুও হুযুর কোন সময় একে খেলাফত মনে করতেন না বা ঐ খেয়াল হৃদয়ে স্থান দিতেন না।

থানভী দরবারের সমস্ত মাশায়েখদের ধারণা

হযরত থানভী (রহঃ)–এর দরবারের সমস্ত মাশায়েখগণের ধারণা ছিল, সবাই বিশ্বাস করতেন যে, মাওলানা শামছুল হক ছাহেব (রহঃ) হযরতের অনেক বড় দরজার খলীফাগণের মধ্যে একজন। কিন্তু হযরত থানভীর জীবিত থাকাবস্থায় সবসময় ঐ দরবারের মিসকীন হিসাবে পরিচয় দান করতেন এবং থানভী (রহঃ) খেলাফতের ব্যাপারে যত কথা বলেছেন, সব তাবিল করে নিজের আজেজীর পরিচয় দিতেন। হযরত থানভী (রহঃ)–এর ইন্তেকালের পর বড় বড় সবাই যখন হুযুরকে একজন উচ্চ দরজার খলীফার মর্যাদায় সম্বোধন করেছেন, তখন হুযুর অত্যন্ত আজেজীর সংগে এ কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁর এই অস্বীকার যদিও নিজেকে লুকানোর জন্য ছিল তবুও উপস্থিত দরবারের বড় বড় সমস্ত খোলাফাগণ এক সংগে বলেছেন, ঠিক আছে আপনি যাই বলেন– "আমরা সবাই আপনাকে এজাযত ও খেলাফত দিলাম।" একদিন হুযুর বললেন "আমি হযরত থানভী (রহঃ)–এর ইন্তেকালের পরে স্বপ্নে দেখলাম– হযরত থানভীর দরবারে তিনি বসে আছেন। সামনে একটি আংগুর গাছ বহু ফলে ভর্তি, গোড়ার দিকে খুব বড় বড় কয়েকটি আংগুর। হযরত থানভী (রহঃ) একটি বড় আংগুর ছিড়ে আমার মুখে জোর করে তুলে দিলেন। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হযরতের বড় খলীফা শাহ আব্দুল গণি ছাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন "এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা– তুমি হযরতের জীবিত থাকাবস্থায় খেলাফত কবুল করতে চাওনি বা তার উপযুক্ত মনে করনি, একথা বুঝানোর জন্য সেই খেলাফত তোমাকে জোর করে দিয়েছিলেন।"

থানভী দরবারের উছুল বা নিয়ম

হযরত থানভী রহমাতুল্লাহির দরবারের উছুল ছিল সকলকে তো মুরীদ করতেনই না বরং অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার বাদে মুরীদ করতেন। সত্যিকার তালেব কি না? দুনিয়ার নাম গরজ আছে কি না? কত প্রকারের পরীক্ষা করে যে মুরীদ করতেন তার ইয়ত্তা নেই। ঐ দরবারের মানই ছিল আজীব ধরনের। তিনি প্রথমে ইছলাহের কাজ সম্পূর্ণ করে জিকির অজিফার দিকে যেতেন। যাকে বায়আত করতেন, তাকে হয়ত সরাসরি নিজের কাছেই রাখতেন। আবার কোন কোন সময় নিজের বড় বড় খলিফাদের হাওয়ালা করে তার দায়িত্বে ইছলাহের ভার অর্পণ করতেন এবং নিজে মাঝে মাঝে ঐ খলিফার কাছে খবর নিতেন। অধিকাংশ সময় ঐ খলীফা ছাহেব হযরতকে মুরীদ সম্পর্কে তার হালাত, উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে, ইছলাহ ও আমল সম্পর্কে খবর দিতেন, জানাতেন। হযরত ঐ মোতাবিক পরবর্তী নির্দেশ দিতেন। অনেককে অন্যের হাওয়ালা করতেনও না। অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাপক চিন্তাধারার অধিকারী মুরীদদেরকে তাদের জেহেন মোতাবিক ঐ জাতীয় যোগ্যতা সম্পন্ন খলীফার হাওয়ালা করতেন এবং নিজের কাছেও রাখতেন। যাদের চিন্তাধারা কোন একদিকে বেশী ছিল, তাদেরকে ঐ জাতীয় চিন্তাধারার অধিকারী খোলাফাদের নিকট সোপর্দ করতেন। যার যেরূপ যোগ্যতা সে অনুসারেই ব্যবস্থা নিতেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুরকে হযরত ঈসা ছাহেবের দায়িত্বে দিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত ছদর ছাহেব হুযুরকে হযরত থানভী (রহঃ)-এর কায়েম মোকাম আপন ভাগ্নে বিশ্বব্যাপী সর্ব বিষয়ের ব্যাপক চিন্তাধারার অধিকারী আল্লামা হযরত যাফর আহমদ ওছমানী (রহঃ)-এর উপর।

হযরত থানভী (রহঃ)-এর খেলাফত প্রদানের নিয়ম

হযরত মাওলানা থানভী (রহঃ)-এর খেলাফত দেয়ার নিয়ম এই ছিল যে, তিনি নিজে যখন কারো সম্পর্কে আশ্বস্ত হতেন যে, ঐ মুরীদের ইছলাহ হয়েছে এবং নেছবত কায়েম হয়েছে অর্থাৎ তায়াল্লুকে মায়াল্লাহ মজবুতভাবে কায়েম হয়েছে, তখন হযরত নিজেই তাকে এক সময় বলে দিতেন "লোকে তোমার কাছে আসলে ফেরত দিও না, লোকের ইছলাহের ফিকির করিও কেউ ইছলাহের জন্য আসলে তাকে ফিরাইও না, লোকদেরকে বায়আত করিও, কেউ বায়আতের জন্য এলে ফিরিয়ে দিও না, এখন মানুষের খায়েরখাহির কাজে লেগে যাও, আমার থেকে যা শিখেছ, মানুষকে তা শিক্ষা দিও, আমার দিলের কথা মানুষের কাছে পৌছে দিও, মানুষদেরকে বঞ্চিত কর্মো না এই সব বাক্য দ্বারাই খেলাফত বা

এজাযত বুঝায়। কোন কোন সময় "আমি তোমাকে বায়য়াতের এজাযত ও খেলাফত দিলাম এইরূপ স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন।"

অন্যান্য বড় বড় খলীফাদের দায়িত্বে কাউকেও সোপর্দ করলে তিনি যখন ঐ মুরীদ সম্পর্কে ভাল রিপোর্ট দিতেন, তখন হযরত হয় বলে দিতেন "তুমি তাকে আমার পক্ষ হতে এজাযত ও খেলাফত দিয়ে দাও অথবা বলতেন, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি তাকে নিজে এজাযত ও খেলাফত দিব।

হযরত ছদর ছাহেব হুযুর (রহঃ), হযরত আল্লামা যাফর আহমাদ উছমানী (রহঃ) ছাহেবের দায়িত্বে ছিলেন। এজন্য হযরতের হুকুমে উছমানী ছাহেব হযরত ছদর ছাহেব হুযুরকে এজাযত ও খেলাফত দিয়েছিলেন এবং হযরত থানভী (রহঃ) হযরত ছদর ছাহেব হুযুরকে কাছে ডেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগের সাথে বলেছিলেন "তু মেরী বাতে দুনিয়া যে ফায়লানা" অর্থাৎ তুমি আমার দিলের কথা জগতকে বাতাইও। দেখা গেল উভয় প্রকার এজাযত ও খেলাফত হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের ছিল।

সূর্যকে আসতে দাও, তা না হলে অন্ধকারে ছেয়ে যাবে

হযরত থানভী (রহঃ)-এর অসুস্থতার সংবাদ শুনে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) সাথে সাথে থানাভবন পৌছে যান। যতদিন হযরত থানভী (রহঃ) হায়াতে ছিলেন, হযরত ছদর ছাহেব হুযুর থানাভবন খানকায় অবস্থান করেন। ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে হযরত হাফেজ্জী হুযুরও থানাভবন গিয়ে পৌছেন। হযরতকে দেখার জন্য চারিদিক থেকে বড় বড় হযরতের খোলাফা ও ওলামায়ে কেরাম হযরতের জেয়ারতের জন্য আসতেন।

হযরতের ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহ্তামিম হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যেব ছাহেব (রহঃ) এবং মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী ছাহেব (রহঃ) হযরতের সাক্ষাতের জন্য থানাভবন তাশরীফ আনয়ন করেন। এই সময় হযরতের সাথে কথা বলা এবং সাক্ষাৎ করা ডাক্তারের সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। ডাক্তার ও হেকিম ছাহেবরা শুধু খাদেমা আম্মা ছাহেবা ব্যতীত সবাইর গমনাগমন ও কথা বলা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। উক্ত দুই বুযুর্গ, হযরতের বড় দুই খলীফার আগমনবার্তা হযরত থানভী (রহঃ)কে জানান হলো। তিনি এ দুজনকে স্পেশালভাবে সাক্ষাতের অনুমতি দান করলেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর সর্বদা ঐখানে পড়ে থাকতেন

এবং হযরতের খবরাখবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করতেন। হযরত মাওলানা কারী তৈয়্যেব ছাহেব ও হযরত মুফতী শফী ছাহেব যখন থানভী (রহঃ)-এর কাছ এজাযতে ঘরের ভিতর সাক্ষাতের জন্য ঢুকলেন এবং হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলা শুরু করলেন, এই সময় হযরত ছদর ছাহের হুযুর তাঁদের সাথে দরজা পর্যন্ত গেলেন এবং দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, ভিতরে যেহেতু অন্য কারও জন্য ঢুকার অনুমতি নেই, এজন্য দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দূর থেকে হযরতের চেহারা দেখার চেষ্টা করলেন। আলাপের সময় হযরত থানভী (রহঃ) শায়িত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! দরজায় কে দাঁড়ানো? ঐ দুই বুযুর্গ বললেন, হযরত! দরজায় মাওলানা শামছুল হক ছাহেব দাঁড়ানো আছেন।" এ কথা শোনার পর হযরত থানভী জোসের সাথে জোর আওয়াজে বললেন "উস্ শাম্‌ছ কো ভি আন্দর আনে দো, অরনা আন্ধিরে ছা জায়েগী" অর্থাৎ ঐ সূর্যকেও ভিতরে আসতে দাও, অন্যথায় সব অন্ধকারে ঢেকে যাবে। অতঃপর তারা সবাই হযরত ছদর ছাহেবকে হযরত থানভীর (রহঃ) নিকট ঘরের ভিতরে ডেকে নিলেন। হযরত থানভী (রহঃ) ছদর ছাহেব হুযুরকে আদর করে কাছে বসালেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে জরুরী নছীহত ও সান্ত্বনা দিলেন। এই সাক্ষাৎ হযরত থানভী (রহঃ)-এর জীবিত থাকাবস্থায় হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের শেষ সাক্ষাৎ। এর অল্প কিছুদিন পর হযরত ইন্তেকাল করেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর কাফন-দাফন সমাপ্ত করে কয়েক দিন পর দেশের পথে রওয়ানা হন।

কবরস্থানে তারাবী খতম

রমযান মাসে সর্বদা হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব (রহঃ) থানা ভবনে হযরত থানভীর সাহচর্যে অবস্থান করতেন। একবারের ঘটনা- রমজান মাস। থানা ভবনে হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের সাথে হাফেজ্জীও ছিলেন। তিনি থানা ভবনের এক মহল্লায় থানভী (রহঃ)-এর নির্দেশে তারাবী পড়াতেন। সূরা তারাবী পড়া হতো। মুসল্লীরা অনেকে বৃদ্ধ ছিলেন এ জন্য হযরত থানভী (রহঃ) ছুরা তারাবী পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুরও ঐ মসজিদে তারাবী নামায পড়তেন। তিনি হাফেজ্জীকে বলতেন "হযরত যখন সূরা তারাবী পড়তে বলেছেন, তখন আপনি বড় বড় সূরা নামাযের মধ্যে পড়বেন।" এই কথায় হযরত হাফেজ্জী হুযুর একদিন বড় বড় সূরা দ্বারা নামায পড়ালেন। এতে মুসল্লীগণ খুব রাগান্বিত হয়ে গেল। কারণ বড় বড় সূরার দ্বারা নামায পড়ানোর কারণে খতম তারাবীর চেয়েও বেশী সময় লাগত এবং মুসল্লিদেরও বেশী কষ্ট হয়েছিল। এজন্য

মুসল্লিগণ হযরত থানভী (রহঃ)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করে দিল। হযরত থানভী (রহঃ) দু'জনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে হযরত হাফেজ্জী হুযুর বললেন, "হযরত আমি ছোট ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়তে চেয়েছিলাম কিন্তু মাওলানা শামছুল হক ছাহেব আমাকে বলেছেন যে, হযরত তো ছুরা তারাবী পড়তে বলেছেন কাজেই তুমি বড় বড় সূরা দ্বারা তারাবী পড়, এজন্য আমি বড় বড় সূরা দ্বারা নামায পড়েছি। হযরত থানভী (রহঃ) সব শুনে সাজা স্বরূপ হযরত হাফেজ্জী ও ছদর ছাহেব হুযুর দুজনকে কবরস্থানে গিয়ে শীতের রাত্রের অন্ধকারে খতম তারাবী পড়ার হুকুম দিলেন। ইফতার বাদ দুইজন আস্তে আস্তে কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন। জনমানবহীন কবরস্থান, কনকনে শীত কোন কিছুর পরওয়া না করে কবরস্থানে গিয়ে দু'জন হাজির হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভয় এবং শীতে দুজনের বুক দুরু দুরু করতে লাগল। এদিকে হযরত থানভী দুইজনকে কবরস্থানে যাওয়ার হুকুম দিয়ে কয়েকজন লোককে ঠিক করে পূর্বের থেকেই লেপ তোষক এবং উত্তম খাবার সাথে দিয়ে কবরস্থানে পাঠিয়ে দিলেন। তারা অপরিচিতের মত যেন রাত্রে সেখানে থাকার জন্য অবস্থান করছিলেন। তাদের সাথে হযরত ছদর ছাহেব হুযুর এবং হযরত হাফেজ্জী হুযুরের সাক্ষাৎ হলে তারা বললো "রাত্রে আমরা এখানেই থাকবো, আপনাদের কোন চিন্তা নেই, নিশ্চিন্তে নামায পড়তে থাকুন।" পরে তারা দুইজনকে খাবার ও লেপ তোষক দিলেন এবং একসাথে রাত্রি যাপন করলেন। এইরূপে কয়েক রাত্রি অতিবাহিত হলো। এই কথা হযরত পীর আম্মা (হযরত থানভী (রহঃ)-এর স্ত্রী) জানতে পেরে হযরত থানভীকে বলে এই সাজা মাফ করিয়ে দেন এবং তাঁরা যথারীতি পূর্বের মসজিদে ছোট ছোট সূরা দ্বারা নামায আদায় করতে থাকেন। কি অদ্ভুত কুরআন প্রেম, কি অদ্ভূত সাজা ও কতবড় শিষ্য প্রেম।

থানভী-মাদানীর প্রাণঢালা এজাযত

দেওবন্দের অন্যান্য উস্তাদদের থেকে বিদায় নিয়ে হুযুর হযরত মাদানী (রহঃ)-এর কাছে গমন করলেন। তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে দোয়া ও বুখারী শরীফ সহ যাবতীয় হাদীছের কিতাব পড়ানোর অনুমতি দান করলেন। অতঃপর মুজাহিদে আযম আপন শায়েখ হযরত থানভী (রহঃ)-এর সামনে থানাভবন খানকায়ে এমদাদিয়ায় হাজির হলেন। হযরত থানভী (রহঃ)ও দোয়া করলেন এবং বুখারীসহ সমস্ত হাদীছের কিতাব পড়ানোর অনুমতি দান করে প্রিয় শাগরেদকে বিদায় করলেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় মুজাহিদে আযমের পদার্পণ

অবশেষে হযরত ছদর ছাহেব হুযুর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসায় উপস্থিত হলেন। ঐ মাদ্রাসা তখন সমস্ত কুমিল্লা জেলার সু-প্রসিদ্ধ মাদরাসা ছিল। মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম ছিলেন হযরত মাওলানা ইউনুস ছাহেব, ওখানকার পীর ছাহেব। পূর্বেই হুযুরের নাম, যোগ্যতা, গুণ-গরিমা লোক মুখে সবারই জানা ছিল। সবাই সাদর সম্ভাষণ জানালেন, অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন এবং মাদ্রাসার শায়খুল হাদীছ ও ছদরে মুদাররিছ পদে অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক পদে বরণ করে নিলেন। ছাত্রগণ হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের পড়ানোর কৌশল দেখে এবং জ্ঞান-গর্ভ বক্তব্য শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে গেল। অল্প দিনের মধ্যেই এলাকার চতুর্দিকে হুযুরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় জলসায় যোগদান করতে আরম্ভ করলেন। ছাত্র শিক্ষক দেশবাসী জ্ঞানী গুণী সবাইর মুখে হুযুরের গুণগান।

হযরত হাফেজ্জী ও হযরত পীরজী হুযুরের ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আগমন

খানকায়ে এমদাদিয়া থানা ভবনে হযরত থানভী (রহঃ)-এর দরবারে থাকাবস্থায়ই হাফেজ্জী, পীরজী ও ছদর ছাহেব হুযুর তিনজন পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন যে, দেশে ফিরে তিনজন সর্বদা একসাথে, এক সংগে কাজ করবেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্রাসায় যাওয়ার পর হযরত ছদর ছাহেব হুযুর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে হযরত হাফেজ্জী হুযুর এবং হযরত পীরজী হুযুর (রহঃ) দুজনকেই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্রাসার উস্তাদ হিসাবে নিয়ে গেলেন। তিন ভাই আপন আপন প্রতিজ্ঞা মোতাবেক একই মাদ্রাসায় ফূর্তির সাথে দ্বীনের খেদমতে লেগে গেলেন এবং কাজ করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সংস্কার কাজ শুরু

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার শায়খুল হাদীছ ও ছদরে মুদাররিছ হয়ে তিনি মাদ্রাসার আমূল সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নাজেমে তালিমাত বা শিক্ষা-সেক্রেটারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন। শিক্ষা পদ্ধতির নূতন ধারা সংযোজন করলেন। মাদ্রাসার বিভিন্ন বিভাগের কাজ বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের উপর অর্পণ করলেন এবং নিজে সব বিভাগের তারাক্কী ও উন্নতির পরামর্শ ও নেগরানী করতে লাগলেন। বাৎসরিক সিলেবাসকে চার ভাগে ভাগ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাঠ্যাংশ শেষ করার নির্দেশ দিলেন। সময়মত শিক্ষক ছাত্রদের উপস্থিতি এবং শিক্ষকদের হাজিরী খাতায় [illegible] ব্যবস্থা করলেন। ক্লাশ টাইমে পাঠ্য

কিতাবাদির প্রয়োজনীয় পাঠ ব্যতীত আজে বাজে গল্প বলা বন্ধ হয়ে গেল। উস্তাদ ছাত্রদের কঠোরভাবে মোতায়ালা এবং ছাত্রদের সব জামায়াতের তাকরারের ব্যবস্থা করে দিলেন। ছাত্র শিক্ষক সবাইর জন্য নেজামুল আওকাত বা-কায়েদা রুটিনের ব্যবস্থা করে দিলেন। মাদ্রাসা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, নিয়মিত ঘুমান, খেলাধুলা শরীর চর্চার ব্যবস্থা করলেন। সাপ্তাহিক পরীক্ষা, সাপ্তাহিক আলোচনা সভা, যথারীতি শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়া, আল্লাহ বিল্লাহ করা, কিতাব অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলেন। এলাকার দূর দূর অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ, দাওয়াতী প্রোগাম চালু করলেন। মাদ্রাসার আর্থিক অবস্থা অল্পদিনের মধ্যে উন্নতি লাভ করলো। ছাত্র শিক্ষক এবং জনসাধারণের মধ্যে মজবুত সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে মাদ্রাসার সার্বিক অবস্থা উন্নতির দিকে ধাবিত হলো।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হকের নামকরণ ও হাতে খড়ি

মুজাহিদে আযম যে সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাদ্রাসায় তাশরীফ আনেন ঐ সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ব্যবসা উপলক্ষে হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেবের আব্বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

অল্পদিনের মধ্যে হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেবের পিতা ছদর ছাহেব হুযুরের সংগে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবং একদিন নিজের ৭/৮ বৎসরের বাচ্চা আয়াতুল্লাহকে মাদ্রাসায় পড়ানোর জন্য ভর্তি করতে নিয়ে আসেন। ভর্তির জন্য হযরত পীরজী হুযুরের কাছে গেলেন। হযরত পীরজী হুযুর ছেলেটির নাম আয়াতুল্লাহ শ্রবণ করে বললেন, "এত ছোট বাচ্চার বুড়ো নাম ভাল নয়, আপনি একে নিয়ে হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের কাছে যান তিনি সুন্দর একটি নাম রেখে দিবেন।" ছেলেকে নিয়ে পিতা হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের কামরায় গমন করলে তিনি সব কিছু শুনে ছেলেটির নাম রাখলেন আজিজুল হক। তিনি বর্তমানে আমাদের শায়খুল হাদীছ আল্লামা আজিজুল হক ছাহেব। হুযুর মাওলানা আজিজুল হক ছাহেবকে আলিফ বা থেকে কায়দায়ে বাগদাদীর ছবক বাতিয়ে দিলেন। হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব বলেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকেই আমি কায়দায়ে বাগদাদী ও আমপারা পড়া সমাপ্ত করে পরে ঢাকায় এসে বড় কাটরা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হই।

বিবাহ কার্য্য সমাধান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থাকাবস্থায়ই বিবাহের জন্য আম্মা আব্বার জোর তাকিদ আসতে থাকে। পিতা-মাতা এবং গার্জিয়ান পক্ষ থেকে খান সাহেব, সৈয়দ ছাহেব, চৌধুরী

সাহেব এবং বড় বড় ধনী গনি জমিদার শ্রেণীর মেয়েদের প্রস্তাব আসতে থাকে। হুযুর এসব পছন্দ করতেন না কিন্তু মুখ ফুটে মুরব্বীগণের কথার প্রতিবাদও করতেন না। তিনি চাইতেন সহজ সরল দ্বীনদার পরিবারের একটি দ্বীনদার, ঈমানদার ও সমঝদার বুদ্ধিমতি মেয়ে।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে সে সুযোগ এসে গেল। টুংগীপাড়ার সম্রান্ত ব্যক্তিত্ব জনাব মরহুম কাজি আব্দুর রাজ্জাক ছাহেব হুযুরের পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার নাজিরপুর থানাধীন ডুমুরিয়া গ্রামের জনাব রাহাত আলী মোল্লা ছাহেবের মেয়ের সাথে। মেয়ে সবদিক দিয়েই অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্না এবং জনাব কাজি আব্দুর রাজ্জাক ছাহেব ইতিপূর্বে জনাব রাহাত আলী মোল্লা ছাহেবের বড় মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। জনাব মরহুম কাজী ছাহেবের চেষ্টায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিব্যহ কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু বাড়ী গার্জিয়ানগণ, আত্মীয়-স্বজনগণ, তাদের জাঁকজমক, টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি এবং বিরাট বিরাট যৌতুকের বিবাহ বাদ দিয়ে এই সহজ, সরল, সুন্নত তরীকার খালি হাতের বিবাহ মোটেই পছন্দ করছিলেন না অবশেষে হুযুরের বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ ধৈর্যের কাছে সবাই মাথা নত করে সন্তুষ্ট হয়ে গেল। হুযুরের বড় ভাই মরহুম মুন্সি ফজলুল হক ছাহেব তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। হুযুর ভাইকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতেন এবং ভক্তি করতেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে খুলনা জেলার গজালিয়া

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অবস্থানকালে মুজাহিদে আযম অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে সময় অতিবাহিত করছিলেন। মাদ্রাসার মুহতামিম ছাহেব হুযুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি পীর ছাহেব হিসাবে খ্যাত ছিলেন, কোন পরামর্শ দিলে প্রায়ই ত্যাগের পরিচয় দিয়ে মান্য করে নিতেন। তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, হযরত হাফেজ্জী হুযুর এবং হযরত পীরজী হুযুরকে মাদ্রাসা থেকে বিদায় দিবেন। একথায় মাদ্রাসায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর বললেন, "আমার এ দু'ভাইকে মাদ্রাসা থেকে বিদায় দিলে আমিও মাদ্রাসা থেকে বিদায় নিব; আমিও এ মাদ্রাসায় থাকব না। কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ হুযুরকে কিছুতেই মাদ্রাসা থেকে বিদায় দিবেন না কিন্তু হাফেজ্জী হুযুর ও পীরজী হুযুরকে বিদায় দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তখন হযরত ছদর ছাহেব হুযুর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে বললেন, আমরা থানাভবন পীরের দরবার থেকে এই সিদ্ধান্ত করে এসেছি যে, তিনজন যেখানেই যাবো এক মাদ্রাসায় থাকবো। এখন হাফেজ্জী হুযুর

ও পীরজী হুযুরকে যখন মাদ্রাসা থেকে বিদায় দেয়া হচ্ছে কাজেই আমিও আর এখানে থাকতে পারি না, আমাকেও বিদায় দিতে হবে। এই বলে তিন ভাই একই সাথে মাদ্রাসা থেকে বিদায় গ্রহণ করে পরবর্তী কর্মসূচীর জন্য হযরত থানভী (রহঃ)-এর খেদমতে পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। হযরত থানভী (রহঃ) পত্র দ্বারা তিনজনকে জানিয়ে দিলেন ঐ মাদ্রাসার চর্তুদিকে ৩০ মাইলের অধিক দূরে নুতন মাদ্রাসা করতে পার। সুতরাং তিনজনে অনেক চিন্তাভাবনা করে আপাততঃ খুলনা জেলার কচুয়া থানার গজালিয়া গ্রামে এসে নুতন মাদ্রাসা স্থাপন করলেন।

গজালিয়ায় এক বৎসর কাল অবস্থান

গজালিয়া গ্রামে এসে স্বল্প পরিসরে খালের পাড়ে স্কুলসহ ছোট মক্তবের ২/৩টি ঘরেই মাদ্রাসার কাজ শুরু হলো। ছাত্রও জুটে গেল। জায়গীর বোর্ডিং মিলে ছেলেদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। শুরু থেকেই দাওরায়ে হাদীছ টাইটেল ক্লাশ পর্যন্ত পড়াশুনা চালু হলো। হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব (মুহ্তামিম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা) হুযুরের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন। গজালিয়ায় এসে হযরত ছদর ছাহেব হুযুর হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেবকে লোক পাঠিয়ে চিঠির মারফত গজালিয়ায় ডেকে নিলেন এবং মাদ্রাসার এন্তেজামের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করলেন।

এক বৎসর বর্ণনাতীত কষ্ট ও অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে যথারীতি মাদ্রাসার কাজ সমাপ্ত হলো। হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব এ সময় ঐ বৎসরই হুযুরের কাছে দাওরায়ে হাদীছ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর যখন বুখারী, তিরমিজী ও অন্যান্য হাদীছের কিতাব পড়াতেন তখন হযরত মাওলানা আঃ আজিজ ছাহেবের সাথে হযরত হাফেজ্জী হুযুর ও হযরত পীরজী হুযুরও ঐ ছবকে শরীক হতেন এবং নিয়মিত পড়তেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর অনেক সময় তাদেরকে বলতেন, আপনারা মুরব্বী আমার এ ছবকে বসে আমাকে লজ্জা দিবেন না। হযরত হাফেজ্জী এবং পীরজী হুযুর দৃঢ়তার সাথে বলতেন "আমরা অবশ্যই ছবকে বসবো আপনাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য নয়; আপনি যা বলেন, আমরা এমন কথা উস্তাদদের মুখেও শুনিনি, এজন্য বসবো, আপনি কিছুই মনে করবেন না।" বৎসর শেষ হলো। সবাই পরামর্শ করে দেখলেন এই অজপাড়াগায়- যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, এলাকার মানুষ মাদ্রাসা ভালভাবে বুঝে না, এজন্য হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেবকে কিছু দিনের জন্য সেখানে রেখে সবাই ঢাকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত করে ওখান থেকে বিদায় নিলেন।

ঢাকার লোহার পুলের পূর্ব পার্শ্বে সেই সৌভাগ্যশালী মসজিদ

গজালিয়া থেকে রওয়ানা দিয়ে তিন বুযুর্গ হযরত ছদর ছাহেব, হযরত হাফেজ্জী এবং হযরত পীরজী হুযুর পথে চিন্তা করে স্থির করলেন যে, কেন্দ্রীয় স্থান ঢাকাতেই দ্বীনের ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে। যেখান থেকে সারা দেশের সাথে যোগাযোগ রাখা যায়।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকায় আসলেন। সংগে কিতাবপত্র। বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ও বিছানাপত্র কিতাবাদিসহ লোহার পুলের পূর্ব পার্শ্বের মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করলেন। পরিচিত কেউ নেই। মসজিদের ইমাম ছাহেব দ্বীনদার মানুষ। তিনি মসজিদে জায়গা দিলেন। পড়াশুনা ঐ মসজিদ এবং মসজিদের বারান্দায়ই শুরু হয়ে গেল। হাদীছের কিতাব ছাড়াও অন্যান্য কয়েক জামায়াতের ছেলেরা ছিল। সবাইর পড়াশুনা কম বেশী চলতে লাগল। রাত্রে মসজিদেই সবাই ঘুমাতেন। মুসল্লীরাও কিছুটা বিরক্তি অনুভব আরম্ভ করলো। এদিকে এতগুলো মানুষ এদের খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেকেরই নিজের উপর খানা থাকার দায়িত্ব। তবুও হযরত ছদর ছাহেব হুযুর এবং পীরজী হুযুর ছাত্র শিক্ষকদের খাবার, থাকার চিন্তা করতে লাগলেন। কি করবেন, কোন উপায় নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেন না। আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়ে থাকলেন লোহার পুলের নিম্নপ্রান্তে। হযরত পীরজী হুযুর হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব ছাহেব মাঝে মাঝে মাতুয়াইল যেতেন সেখানে তাঁর পরিচিত আত্মীয়-স্বজন এবং দেশের কিছু লোক বসবাস করতেন। হযরত পীরজী হুযুর প্রায়ই সেখানে গিয়ে ধামাভরা রান্না করা ভাত এবং তরী-তরকারী রান্না করে লোকজন দিয়ে মাথায় করে নিয়ে আসতেন। এভাবে লোহার পুলের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদে অত্যন্ত কষ্টে না খেয়ে না ঘুমায়ে ছাত্র শিক্ষক নিয়ে তিন বুযুর্গ বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। কারো কাছে কিছু চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, শুধু তাওয়াক্কুলের উপর দিন কাটতে লাগল। মানুষ শুধু মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতো। এরা কারা, কি চায়? কেউ কিছু জানত না। এভাবে অতিকষ্টে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে বাদামতলী ষ্টীমার ঘাট মসজিদে ছাত্র শিক্ষকদের নিয়ে চলে আসলেন।

সেই ঐতিহাসিক বাদামতলী ষ্টীমার ঘাট মসজিদ

সবাই বাদামতলী ষ্টীমার ঘাট মসজিদে এসে অবস্থান গ্রহণ করে মসজিদেই পড়াশুনার কাজ শুরু করলেন। কিন্তু এখানেও নানা প্রকার অসুবিধা দেখা দিল। খাবার ব্যবস্থা নেই, থাকার জায়গা নেই। না খেয়ে কতদিন চলা যায়। এদিকে

মসজিদের খাদেম, মোয়াজ্জেন ও মুসল্লিগণ বিরক্তি বোধ করতে আরম্ভ করলো। রাত্রে খাদেমরা ছাত্রদের কিতাবপত্র, কাপড়-চোপড় বাইরে ফেলে দিত। মসজিদ ধোয়ার নামে পানি ঢেলে কিতাবপত্র ও বিছানাপত্র ভিজিয়ে দিত, কটু কথা বলতো। সবই ধৈর্য্যের সাথে সবাই সহ্য করতেন। ছাত্রদের ধৈর্য্য ধারনের নছিহত করতেন। ইতিমধ্যে হযরত হাফেজ্জী হুযুরের লালবাগ শাহী মসজিদে ইমামতির ব্যবস্থা হয়ে গেল। হযরত পীরজী হুযুরও কোন একটি মসজিদে থাকার ব্যবস্থা করলেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুরও বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে জিঞ্জিরা হাফেজ ছাহেবের মসজিদে কুরআনে পাকের তাফছীর শুনাতে আরম্ভ করলেন। জায়গীরও আপাততঃ ঠিক হলো। ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গা থেকে এ তিন বুযুর্গের নিকট কিছু কিছু ছবক পড়তে লাগল।

মোঘল আমলের বড় কাটরা শাহী কেল্লা

ঐ সময় বড় কাটরা, ছোট কাটরা এবং চকবাজারের অনেক জায়গার মালিক ছিলেন জিঞ্জিরার জনাব আলহাজ্জ হাফেজ হোসাইন ছাহেব। তিনি তৎকালীন সময়ের বড় ধনী এবং দানশীল মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। হাফেজ ছাহেব প্রতি বছর প্রায় ৭০ হাজার টাকা যাকাত দিতেন। তার ইচ্ছা ছিল বড় কাটরার কেল্লাকে কেন্দ্র করে একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবেন কিন্তু উপযুক্ত কোন লোক পেলেন না। অনেকের মাদ্রাসা করার দায়িত্ব দিয়েছেন, টাকা-পয়সা দিয়েছেন কিন্তু কেউই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে টাকা-পয়সা খেয়ে চলে গেছে। এজন্য হাফেজ ছাহেব আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই তিন বুযুর্গের পক্ষ থেকে যখন মাদ্রাসা করার প্রস্তাব দেওয়া হলো তখন হাফেজ হোসাইন আহমদ ছাহেব বললেন, "কতজনকেই তো দিলাম মাদ্রাসা করার জন্য কিন্তু কোন লোকই ঠিকমত দায়িত্ব পালন করলো না। আপনারা মাদ্রাসা করতে চান ভাল কথা, কিন্তু আমি এক পয়সাও দিতে পারবো না, আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

অর্থ দ্বারা পরীক্ষা

জিঞ্জিরা থাকাবস্থায় হযরত ছদর ছাহেব হুজুরের চাল-চলন হাফেজ ছাহেব গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের চাল-চলন, কথাবার্তা, ব্যবহার, ইবাদত-বন্দেগী হাফেজ ছাহেবের খুব পছন্দ হতো। তিনি অনেককেই নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন এবং সবাই ফেল করেছে। এবার হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের ব্যবহারে চালন-চলনে মুগ্ধ হয়ে তাকেও পরীক্ষা করার চিন্তা করলেন। সব

পরীক্ষায়ই ছদর ছাহেব হুযুরের উপর খুশী হয়ে অবশেষে একদিন ছদর ছাহেব হুযুরের সামনে অর্থের টোপ ফেললেন। তিনি একদিম হুযুরকে বললেন "মাওলানা ছাহেব আপনি গরীব মানুষ ইসলামের কাজ করছেন, আমি আপনাকে এই ২২ হাজার জাকাতের টাকা দান করছি, আপনি এ টাকা নিজে প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন।" তৎকালীন সময়ে ২২ হাজার টাকার মূল্য বর্তমান কালের কয়েক কোটি টাকার সমান। কিন্তু হযরত ছদর ছাহেব হুযুর হাফেজ ছাহেবের এ অর্থের প্রস্তাব হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, হাফেজ ছাহেব আমার টাকার কোনই প্রয়োজন নেই, আমার কোনভাবে চলে যাচ্ছে, আমি টাকা দিয়ে কি করবো? বরং ঢাকায় অনেক গরীব অসহায় মানুষ আছে, আপনি এ টাকা দিয়ে এসব অসহায়, গরীব, এতীম, বিধবাদের সাহায্য করলে অনেক বেশী ছওয়াব পাবেন। আমার টাকার কোনই প্রয়োজন নেই। আমি কিছুতেই আপনার টাকা গ্রহণ করবো না। হাফেজ হোসাইন আহমদ ছাহেব চুপ করে সব কথা শুনলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন যে, এত নির্লোভ মানুষ তো আমি জীবনেও দেখি নাই, এই লোককে জায়গা দান করলে তিনি নিশ্চয়ই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

অবশেষে একদিন জনাব মরহুম হাফেজ হোসাইন আহমাদ ছাহেব হুযুরকে ডেকে বললেন, "হুযুর আমি আপনাকে বড় কাটরার এই জায়গা দান করলাম। আপনি আপনার খুশীমত এখানে আল্লাহর দ্বীনের একটি খালেছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন।"

মাদ্রাসার নামকরণ

অতঃপর হযরত ছদর ছাহেব হুযুর পীরজী ও হাফেজ্জী হুযুরকে সংগে নিয়ে সবার সাথে পরামর্শ করে মাদ্রাসার নামকরণ করলেন– হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা বড় কাটরা। হাফেজ ছাহেবের নামের সাথে নিজে পীর হযরত থানভী ছাহেবের নাম মিলিয়ে মাদ্রাসার এই নামকরণ করলেন।

আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার প্রাথমিক অবস্থা

প্রাথমিক অবস্থায় যে অল্প সংখ্যক ছাত্র কাছে ছিল তাদের নিয়েই মাদ্রাসার ছবক শুরু হলো। বিশাল বিল্ডিং, শতাধিক রুম। কিন্তু সমস্ত রুমগুলো ময়লা আবর্জনা এবং কবুতরের পায়খানায় ভর্তি। চামচিকা ও বাদুড়ের পায়খানার দুর্গন্ধ। এর মধ্যে রাজত্ব কায়েম ছিল পেশাদার ফকিরদের। ফকিরদের মধ্যে আবার লিডার ছিল। সর্বোপরি ফকির লিডারকে সর্দার বাবাজী বলা হতো। তিনি উপরের

চিলা কোঠায় জটা লাঠি নিয়ে প্রতাপের সাথে সর্দারী করতেন এবং বসে বসে সকল ফকিরের রোজগারের কর খেতেন ও বিচার আচার করতেন।

হুযুররা ফকিরদের বিরক্ত না করে নীচের কয়েকটি রুমের কবুতরের পায়খানা ও ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে ছাত্রদের কিতাব ও বিছানাপত্র রেখে পড়াশুনার কাজ আরম্ভ করলেন। চারদিক থেকে ইলম পিপাসু ছাত্র সমবেত হলো। প্রথম বৎসরেই দাওরা হাদীছের কিতাব পর্যন্ত পড়াশুনা শুরু হলো। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ্য যোগ্য উস্তাদ নিয়ে আসলেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুরকে সবাই মাদ্রাসার মুহতামিম নির্ধারণ করলেন। হুযুর বিভিন্ন বিভাগ বিন্যস্থ করে প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একজন নাজেম ঠিক করে দিলেন। যথারীতি কাজ শুরু হয়ে গেল। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর দেওবন্দ থেকে কাশ্মীরের একজন অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন মুহাদ্দিছ নিয়ে আসলেন। শুনা যায় কাশ্মিরী মোহাদ্দিছ ছাহেবের মত এত বড় যোগ্য উস্তাদ নাকি সচরাচর দেখা যায় না।

কেল্লা থেকে জটাধারী সর্দার ফকির উৎখাত

মাদ্রাসা চালু হওয়ার পরও বেশ কিছুদিন জটাধারী সরদার ফকিরের রাজত্ব কায়েম ছিল। আস্তে আস্তে ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং মাদ্রাসার প্রয়োজনে রুমগুলো পরিষ্কার করে আস্তে আস্তে ফকিরদেরকে অপসারণ করা হলো। হযরত ছদর ছাহেবের নির্দেশ ছিল কোন ফকিরকে যেন মন্দ কথা বলা বা মারধর না করা হয়। মিষ্টি কথা বলে বুঝিয়ে দেয়া হয়। সে ভাবেই কাজ হলো কিন্তু সমস্যা দেখা দিল জটাধারী সর্দার ফকির বাবাজীর ক্ষেত্রে। আমাদের গওহরডাংগা মাদ্রাসার সুযোগ্য উস্তাদ, মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল বারী ছাহেব (রহঃ) (বাঁশবাড়িয়ার হুযুর) বলেন, "আমরা আশরাফুল উলুমের প্রথম সময়ের ছাত্র। সে দিন ফকির বাবাকে উৎখাত করতে কয়েকজন ছাত্র অগ্রসর হলাম তখন তার কি বিক্রম? লাল চক্ষু, গাজার নেশায় ভরপুর আমাদের দিকে চেয়ে হুংকার দিয়ে গর্জে উঠল। কিছুতেই গদি ছাড়তে রাজী নয়। আমরা অনেক অনুনয় বিনয় করে বুঝিয়ে অতঃপর তাকে বাহির করে দিলাম।

সে কালের ঢাকার অবস্থা

তৎকালীন সময়ে ঢাকার অবস্থা ছিল ভিন্ন ধরণের। ঢাকার নবাব ছাহেবের প্রতি সকল মানুষের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা ও আস্থা। যে কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজ নবাব ছাহেবকে কেন্দ্র করেই চলতো। বিচার-শাসন সবই নবাব ছাহেবের

মাধ্যমে সমাধা হতো। বৃটিশ গভর্মেন্ট যদিও দেশ শাসন করতো কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আহসান মঞ্জিল কেন্দ্রিক যখন যে নবাব ছাহেব ক্ষমতায় থাকতেন তিনিই ঢাকার প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি যে কোন ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত দান করতেন সবাই-ই তাই ভক্তি ও মহব্বতের সাথে শিরধার্য্য করে নিতেন। সমস্ত ঢাকা শহরটি মহল্লায় মহল্লায় বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক মহল্লায় এক একজন করে সরদার থাকতো। নবাব ছাহেব মহল্লার গণ্যমান্যদের সাথে পরামর্শ করেই মহল্লার সরদার মনোনীত করতেন। সরদার ছাহেবই প্রকৃত প্রস্তাবে মহল্লার যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করতেন। বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এখন মহল্লার সরদারদের নিদর্শন সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ের সরদার ছাহেবরা ছিলেন প্রায় সবাইই ন্যায়ের প্রতীক। আমরা পাকিস্তান আমলে জনাব মরহুম আব্দুল মাজেদ সরদার ছাহেবকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সত্যিকারের বলতে গেলে তাঁদের জীবন ছিল জাতির স্বার্থের জন্য নিবেদিত। ঢাকার নবাব ছাহেবরা প্রায় সবাইই ছিলেন ধর্মভীরু এবং আদর্শবান। বৃটিশের শোষণ-নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলমানরা যতটুকু ঐক্যবদ্ধ এবং রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন তা কেবলমাত্র নবাব ছাহেবদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল। ইংরেজদের সর্ববিধ অত্যাচার, বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা বন্ধ করার জন্য বিভিন্নভাবে, লক্ষ রাজসম্পত্তি, আয়েম্মা চেরাগী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কারণে ধর্মীয় শিক্ষা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে সামান্য কয়েকটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ধর্ম চর্চা কেন্দ্র অবশিষ্ট ছিল তা নওয়াব ছাহেবের মাধ্যমে মহল্লার সরদারগণের চেষ্টায়ই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মসজিদের সংখ্যাধিক্যতা পূর্বেও ছিল কিন্তু ইংরেজদের রাজনৈতিক কুটচালের কারণে আস্তে আস্তে জীবনী শক্তি হারিয়ে রছম রেওয়াজ ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে যায় এবং শিক্ষার সঠিক ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রকার বেদয়াত প্রথা ধর্মের নামে চালূ হয়ে যায় এবং মানুষ ইসলামের আসল শিক্ষা না পেয়ে ধর্মের নামে অনেক কুসংস্কারের দিকে ঝুকে পড়েছিল। মসজিদগুলো নামায এবং মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মধ্যে আনুষ্ঠানিক ওয়াজ মাহ্ফিলও হতো। মসজিদের ইমাম ছাহেবগণ ইলমী ময়দানে অনগ্রসর থাকার কারণে সঠিক কুরআনের তালিম এবং সুন্নত মোতাবেক শিক্ষা না থাকায় বিভিন্ন প্রকার বেদয়াত প্রসার লাভ করেছিল। সমাজে আলেমদের নেতৃত্ব হ্রাস পেয়ে মূর্খতা বিস্তার লাভ করেছিল। হিন্দু জমিদারদের কুটচাল এবং ইংরেজদের রাজনৈতিক কুটচালের কারণে মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। মাদ্রাসা ছিলনা বললেই চলে। শুধু নবাবদের প্রচেষ্টায় এবং তত্ত্বাবধানে

মোহসেনিয়া মাদ্রাসা নামে সদরঘাট এলাকায় একটিমাত্র নামকা ওয়াস্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তারও পাঠ্য সিলেবাস সুবিন্যস্ত ও যুগের চাহিদা মিটাতে অক্ষম ছিল। সবেমাত্র রাজনৈতিক ময়দানে মুসলিম লীগের মাধ্যমে কিছু কিছু চেতনা দেখা দিয়েছিল। তাও ঢাকার নওয়াব পরিবারের নওয়াব ছলিমুল্লাহ বাহাদুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মসজিদগুলো মহল্লার সর্দার ছাহেবদের পরিচালনাধীন ছিল।

সংস্কারের গতিধারার উদ্বোধন

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ত্যাগ, কুরবানী ও দরদভরা হৃদয় নিয়ে নবুয়ত, সুন্নত তরীকায় সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথমে কিছু কিছু ছোট আলেম ও ইমাম ছাহেবগণ এই সমস্ত মহান ব্যক্তিত্বের গুরুত্বই দেননি। মহল্লার সরদারগণ এসব কাজকে পাত্তাই দিতে রাজী ছিল না বরং প্রায়ই বিরোধীতার ভূমিকা পালন করত। এমতাবস্থায় মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ), হযরত পীরজী (রহঃ) ও হযরত হাফেজ্জী (রহঃ)কে নিয়ে প্রথমেই না খেয়ে ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে ছেলেদের আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে একটি বাস্তব নমুনা আদর্শ উদাহরণ সমাজের সামনে পেশ করতে চেষ্টা করেন এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সবাইর খেদমতে অগ্রসর হন। অবশ্য শুরু থেকেই কিছু সংখ্যক খালেছ দ্বীনদার মুরব্বী সরদার ও নওজোয়ান এ সমস্ত বুযুর্গের চাল-চলন, মধুর চরিত্র-মাধুর্য্য ও উন্নত তাকওয়া পরহেযগারী অনুধাবন করে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে আসছিলেন। ধীরে ধীরে ছহি কুরআনের তালিম এবং খাঁটি সুন্নতের কিছু কথাবার্তা, ওয়াজ নছিহত এবং নিঃস্বার্থ খেদমত দেখে জনগণও আস্তে আস্তে আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করলো। ঢাকার আশে পার্শ্বের এলাকায় এ সমস্ত বুযুর্গদের আগমন শুরু হলো। মাঝে মধ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও কিছু কিছু ওয়াজ নছিহত শুরু হলো। বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে ছাত্রদের গমণাগমণ শুরু হলো। আস্তে আস্তে কিছু কিছু করে বরফ গলতে শুরু করলো। কুরআনের সঠিক তালিমের বদৌলতে এবং লিল্লাহ দ্বীনের শিক্ষার কারণে এলাকাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষিত হতে লাগল।

সে জামানার চকবাজার মসজিদের মোতাওয়াল্লী ছাহেবের ঘটনা

বড় কাটরা আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম হিসাবে হযরত থানভী (রহঃ) হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকেই ঠিক করে দিয়েছিলেন এবং হযরত পীরজী হুযুরের উপর অন্যান্য দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর, হযরত পীরজী হুযুর এবং হযরত হাফেজ্জী হুযুর তিনজন এক মায়ের

পেটের সন্তানের মত যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতেন। প্রথমে সবাই ছাত্রদের বাহিরে যাতায়াত এবং পাবলিকের সাথে মিলামিশা থেকে কঠোরভাবে দূরে রাখতেন। কারণ স্থানীয় আলেমগণ ও মসজিদের মোতাওয়াল্লী ছাহেবান এবং মুসল্লীগন এই সমস্ত বুযুর্গদের ছাত্রদের সুন্নত মোতাবেক কাজগুলোকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতো, বিশেষ করে যাদের বিভিন্ন হীনস্বার্থে আঘাত লাগছিল তারা সমালোচনা করে জনগণের মনকে তাদের প্রতি কিছুটা বিরূপ ভাবাপন্ন করে তুলেছিল। ফলে কোন কোন মোতাওয়াল্লী ছাহেব বিশেষ করে চকবাজার মসজিদের মোতাওয়াল্লী ছাহেব এ সমস্ত বুযুর্গও ছাত্রদেরকে ভাল চোখে দেখতেন না। এজন্য হযরত পীরজী হুযুর বিশেষ করে ছাত্র শিক্ষক কাউকেও মাদ্রাসার বাইরে বিশেষ দরকার ছাড়া যেতে দিতেন না। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর বলেন "আমরা সাধারণতঃ মাদ্রাসাই নামাযের জামায়াত করতাম কোন সময় চকে নামায পড়তে গেলে চুপে চুপে নামায পড়ে চলে আসতাম, কারণ মোতাওয়াল্লী বা ইমাম মোয়াজ্জেনের মনোভাব খারাপ থাকার কারণে সাধারণ মুসল্লীগণও আমাদের দেখলে নানা ধরনের উল্টা পাল্টা সমালোচনা করতো। হযরত বলেন, জনগন থেকে দূরে থাকাটা আমার মোটেই পছন্দনীয় ছিল না। কিন্তু ফেতনা হতে পারে এজন্য কিছু বলতামও না। শুধু আল্লাহর কাছে মনে মনে দোয়া করতাম এবং আমি নিজে মাঝে মধ্যে চকের মসজিদে নামায আদায় করতাম অন্য কাউকে যেতে কোন প্রকার উৎসাহিত করতাম না বা বলতাম না। একদিন আসরের সময় চকবাজার মসজিদ থেকে নামায পড়ে কেবলমাত্র সিড়ি দিয়ে বাইরে আসার সময় মসজিদের বিশালদেহী মুতাওয়াল্লী ছাহেবের মুখোমুখী হলাম। আমি তখন অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে, মহব্বতের সাথে মোতাওয়াল্লী ছাহেবকে ছালাম দিয়ে মোছাফাহা এবং মোয়ানাকা করে মহব্বতের সংগে বললাম হুযুর কেমন আছেন? মোতাওয়াল্লী ছাহেব যেন কেমন আভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুর বলেন, ঐ দিন থেকে ঐ মোতাওয়াল্লী ছাহেব আমাদের এমন প্রশংসা করা শুরু করে দিলেন যে, তার প্রশংসার কারণে এলাকাবাসী ইমাম মোয়াজ্জেম সবার-ই মনের পরিবর্তন হলো এবং সবাই আমাদের প্রশংসা করতে লাগল। মোতাওয়াল্লী ছাহেব ঐ দিন হতে আমাদের প্রশংসা শুরু করলেন। তিনি বলতেন এদের মত ভাল মানুষ হয় না। এরাই আসলে খাঁটি আলেম, বুযুর্গ। অতঃপর আস্তে আস্তে আমরা চকবাজারে নামায পড়া শুরু করলাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মানুষ আমাদের ওয়াজ শোনার জন্য দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলো। দিন দিন বাধার পাহাড় অপসারিত হতে লাগল এবং আস্তে আস্তে

সমস্ত ঢাকা শহরে আমাদের দাওয়াতী কাজও বাড়তে লাগল এবং কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হলো। ধীরগতিতে সংস্কারের কাজ আরম্ভ হলো। মাদ্রাসার হাফেজ, কারী এবং আলেমগন বিভিন্ন মসজিদে কুরআনের তালিম শুরু করে দিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত ঢাকাবাসী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে এ সমস্ত উলামায়ে হক্কানীদের খেদমত প্রসারিত হয়ে গেল। এলাকায় এলাকায় মসজিদে মসজিদে কুরআনের সঠিক তালিম শুরু হয়ে গেল। রমজানে খতমে তারাবীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেল। প্রতি দিনই কোন না কোন মসজিদ বা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে শিক্ষক উস্তাদের জন্য লোক আসতে লাগল। কিন্তু চাহিদার তুলনায় বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। এজন্য মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা বাড়ান এবং এলাকায় এলাকায় নুতন নুতন মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা শুরু হলো। হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব ও পীরজী হুযুর বাহিরের বিভিন্ন দ্বীনি জলছায় গমন করতেন। যে স্থানেই তাঁরা পদার্পণ করেছেন, সে স্থানেই একটা দ্বীনি মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কমপক্ষে মসজিদ কেন্দ্রীক কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই তাঁরা করতেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে নরসিংদী রাধাগঞ্জ, জামালপুর তালতলা আব্দুল্লাপুর বিভিন্ন স্থানে কুরআনী মাদ্রাসা স্থাপিত হলো। ঢাকায় মহল্লায় মহল্লায় ও মসজিদ কেন্দ্রীক কুরআনের সঠিক তালিম আরম্ভ হয়ে গেল।

মোস্তফাগঞ্জ মাদ্রাছায়

একবার হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের শাগরেদ জনাব মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব বিক্রমপুর এলাকার তালতলায় হুযুরকে ওয়াজের জন্য দাওয়াত করে নিয়ে যান। এলাকাবাসী বিপুল সমাবেশের মাধ্যমে হুযুরের ওয়াজ শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে যান। সভাশেষে পরের দিন সকালে হুযুর যখন বিদায় গ্রহণ করে রওয়ানা দিয়েছেন। এমন সময় এলাকার গণ্যমান্য মুরব্বীগণ হুযুরের সামনে এসে তিনশত টাকা হাদিয়া পেশ করেন। টাকা দেখে হুযুর বলেন, এটা কি? সবাই বুদ্ধি করে বললো, আমরা এলাকাবাসী সবাই রাস্তা খরচ বাবদ হাদিয়া দিচ্ছি। হুযুর বললেন দ্বীনের কাজে এসে রাস্তা খরচ নিজের পকেট থেকে দিতে হয় কারো মুখাপেক্ষী হয়ে বা রাস্তা খরচের আশায় ওয়াজ করতে হয় না। হা, যদি কারো সামর্থ না থাকে তবে শুধু পথ খরচটা কোন প্রকার নেয়া যেতে পারে অপারগ অবস্থায়, অন্যথায় নয়। কাজেই সদরঘাট থেকে তালতলা পর্যন্ত লঞ্চ ভাড়া হিসাবে বার আনা, বার আনা মোট দেড় টাকা আমি পথ খরচের জন্য গ্রহণ করতে পারি, এটা না নেওয়াই উত্তম তবুও না হয় গ্রহণ করলাম বাকীটা আপনারা ফেরৎ নিয়ে নেন।

মুরব্বীগণ তখন বললো "হুযুর আমরা আগের থেকেই সবাই মিলে হুযুরকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করেছি। আর হাদিয়া নেয়া তো সুন্নত, কাজেই হুযুর মেহেরবাণী করে আমাদের হাদিয়া সুন্নত হিসাবে কবুল করুন। হুযুর বললেন, হাদিয়া কবুল করা সুন্নত কিন্তু আমি ক্ষুদ্র মানুষ হাদিয়া গ্রহণ করার উপযুক্ত না।" তখন সবাইর কান্নাকাটি ও আন্তরিক অনুরোধের কারণে হাদিয়া কবুল করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে বললেন "আপনাদের এখানে কোন মাদ্রাসা আছে কি না? সবাই বললো "নেই।" তখন হুযুর বললেন একটা দ্বীনি মাদ্রাসা করতে আপনারা রাজী আছেন কি না? সবাই আনন্দিত হয়ে বললেন, হা, আমরা রাজী! হুযুর বললেন, "এই মাদ্রাসার জন্য টাকাগুলো আমি দান করলাম, চাঁদা দিলাম। আপনারা এর সংগে মিলিয়ে সাহায্য করে মাদ্রাসা গড়ে তুলুন।" পরে জায়গা ঠিক হলো এবং মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করা হলো। অল্পদিনের মধ্যে মাদ্রাসাটি একটি আদর্শ মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হলো। সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও আদর্শ উস্তাদ হযরত মাওলানা হাফেজ মোহসেন ছাহেব একসময় এ মাদ্রাসার পরিচালক ছিলেন। এই মাদ্রাসাটি অতি অল্পদিনের মধ্যেই অসাধারণ উন্নতি লাভ করে। মাদ্রাসাটির বৈশিষ্ট এর প্রাথমিক শিক্ষা ছাত্রদের তরবিয়ত। এর মক্তব বিভাগ এবং হেফজ বিভাগ সারা বাংলাদেশের মধ্যে আদর্শস্থানীয়। আস্তে আস্তে প্রাথমিক জামায়াত বিভাগও শুরু হলো। এই মাদ্রাসার ছাত্রদের আমলী প্রশিক্ষণই মাদ্রাসাটিকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে দিয়েছে। ছাত্রদের চরিত্র গঠন, আদব, ব্যবহার, ভক্তি-শ্রদ্ধা, নম্রতা-ভদ্রতা এবং পাঠ্য তালিকার মজবুত শিক্ষাই মাদ্রাসাটির মর্যাদাকে সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহায্য করেছে।

আশরাফুল উলূম বড় কাটরা মাদ্রাসা কেন্দ্রীক সারা দেশে ইসলামের নূতন বিপ্লব শুরু

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এই মাদ্রাসা থেকেই সারাদেশে ইসলামের নব জাগরণের সূচনা করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাথীদেরকে নিয়ে নূতন নূতন প্রোগাম চালু করেন। কুরআনের বিশুদ্ধ পঠন, প্রাথমিক শিক্ষার বৈপ্লবিক সংস্কার, অল্পদিনে অধিক শিক্ষা, ইমাম ট্রেনিং, বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাকের তাফসীর ক্লাশ চালু করে জনগণকে কুরআনী শিক্ষার দিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ঝগড়া-ফাসাদ, বাহাস-মোবাহাছা দলাদলি এখতেলাফী মাসলা-মাসায়েল সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে মহব্বত ভালবাসা উদারতা মহানুভবতা এবং উম্মতের প্রতি চরম দরদের প্রদর্শনী করে জাতির মধ্যে ঈমান,

ঐক্য ও ভালবাসার এক গুপ্ত ভাণ্ডারের সন্ধান দেন। তিনি ছিলেন সকল মতবিরোধের উর্ধে। তিনি শুধু সবাইর ভিতরের গুণটিই দেখতেন। কারণ বিভিন্ন ফেরকাবন্ধী ও সুবিধাভোগী ফাসাদীদের সকল সুবিধার চাবীকাঠি জাতির বৃহত্তর স্বার্থের সামনে মাঠে মারা গেল। সবাইই ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ, জাতি ও ইসলামের শত্রু ইংরেজ ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে শক্তিশালীভাবে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হলো। ঢাকার পার্শ্ববর্তী জিলা সমূহের সাথে বাংলা আসামের বিভিন্ন জেলায় তাঁরা শাগরেদদের দ্বারা নূতন চিন্তাধারায় সংস্কারমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন। জৈনপুরী, বাহাদুরপুরী, ফুরফুরা, শর্ষিনা সিলসিলার বুযুর্গদের দ্বীনি খেদমতের ধারা মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর উদার ভাবধারায় আরও একধাপ সামনে এগিয়ে যায়। সবাই সবার ভুলক্রটি বুঝার এবং সংশোধন করার সুবর্ণ সুযোগ পেলেন। ইংরেজদের কুট ঝগড়া বাধানো পলিসি ব্যর্থ হতে বাধ্য হলো।

শেরেবাংলা হকের সূর্য্যের দরবারে

রক্তে রক্ত চিনে। বাংলার মজলুম জনতার নয়ন মনি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ছাহেব একদিন হঠাৎ সকলকে চমকিয়ে দিয়ে ঢাকা আশরাফুল উলূম বড় কাটরা মাদ্রাসায় মুজাহিদে আযমের দরবারে হাজির হলেন। তখন তিনি যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রাণপ্রিয় নেতা। সহজ-সরল, অনাড়ম্বর, সাদাসিদে চাল-চলনে অভ্যস্ত মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। প্রাণখোলা আলাপ আলোচনা হলো শেরেবাংলা মুজাহিদে আযমের ব্যবহারে মুগ্ধ ও আভিভূত হয়ে পড়লেন। মাওলানার জ্ঞান দূরদর্শিতা, জাতির প্রতি গভীর হৃদয় নিংড়ান মমত্ব দেখে এবং তার পরিকল্পনা শুনে আরও বেশী মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার আদর্শ, উদ্দেশ্য জেনে আরো বেশী খুশী হলেন। অতঃপর শেরেবাংলা মাদ্রাসার বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করে ঘুরে দেখলেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কাছে মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী জেনে অবাক হয়ে গেলেন। প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব বললেন, "আমাদের মাদ্রাসা দেওবন্দ মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীর হুবহু অনুসরণ করে পরিচালিত হয়।" সর্ব প্রথমে আমরা ছাত্রদেরকে ঈমান আমল খাটি করার চেষ্টা করি। অতঃপর কুরআনের সহি পঠন, নামাযের নিয়ম পদ্ধতি ২৪ ঘন্টার জীবনের প্রতিটি কাজকে সুন্নত মোতাবেক শিক্ষা দান করি এবং আদব কায়দা চরিত্র গঠন ভদ্রতা নম্রতা নিয়মানুবর্তিতা উস্তাদ

মুরব্বীমান্যতা শিক্ষা দান করা হয়। আরবী ভাষার প্রথমিক ছরফ, নাহু, প্রাথমিক ব্যাকরণ, সাহিত্য, উছুল, আকায়েদ, মানতেক, কুরআন, হাদীছ, তাফছীর, বালাগাত, মানতেক, তাছাওওফ, হেকমত, তীব ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় এবং এগুলোর বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়। সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভুগোল, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ক জ্ঞান দান করা হয়। শেরেবাংলা এসব দেখে এবং শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মত আবিভূত হয়ে পড়েন এবং বেসরকারীভাবে সম্পূর্ণভারে জনগণের উপর নির্ভর করে এ জাতীয় শিক্ষা পরিচালনার জন্য সকলকে মোবারকবাদ জানালেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের হাতে দশ হাজার টাকার একটি চেক দিলেন। মাওলানা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? শেরেবাংলা জবাবে বললেন, "এটা মাদ্রাসায় দান করলাম। মাওলানা বললেন এটা কি আপনার ব্যক্তিগত তহবিলের, না সরকারী তহবিলের? তিনি বললেন সরকারী তহবিলের। মাওলানা বললেন, ধন্যবাদ। আমরা কোন সরকারী টাকা প্রত্যাশা করি না।" এ টাকা গ্রহণ করতে আমরা অপারগ। আপনি মেহেরবানী করে মনে কোন কষ্ট নিবেন না। টাকা দ্বারা মাদ্রাসা হয় না, আমরা আপনার টাকা চাইনা, আমরা আপনাকে চাই। এতে শেরেবাংলা অবাক দৃষ্টিতে মাওলানার দিকে চেয়ে থাকলেন এবং চেকটি ফেরৎ নিয়ে খুশীর সাথে মাওলানাকে জড়িয়ে ধরে বিদায় পর্ব শেষ করলেন।

সে জামানায় আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

তৎকালীন সময়ে ঢাকার বুকে একটি মাত্র মাদ্রাসাই ছিল। এই আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা। মাদ্রাসার সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন স্বয়ং হযরত মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। প্রধান পৃষ্ঠপোষক শায়খুল হাদীছ পদে সমাসীন ছিলেন বিশ্ববরেণ্য সর্বশাস্ত্রের ঈমাম হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর কলিজার টুকরা ভাগ্নে আল্লামা যাফর আহমদ ওসমানী (রহঃ)। হুযুরের সহকর্মী সাথী হিসাবে ছিলেন বিচক্ষণ প্রজ্ঞার অধিকারী হযরত পীরজী (রহঃ) ও যুগশ্রেষ্ঠ অলিয়ে কামেল হযরত হাফেজ্জী হুযুর। তখনকার দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ কাশ্মিরের হুযুর ও উক্ত মাদ্রাসার বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন চাঁদপুরের হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব শিক্ষক পদকে অলংকৃত করেছিলেন। এছাড়া দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম উস্তাদ হিসাবে উক্ত মাদ্রাসার রওনক বৃদ্ধি করেছিলেন। তন্মধ্যে এ জামানার মুহাদ্দিছকুল

শিরোমনি আল্লামা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহঃ) ও শায়খুল হাদীছ আল্লামা আজিজুল হকও তখনকার উস্তাদের গুরু দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন।

আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, শুধু পুথিগত আলেমই সেখানে তৈরী হতো না বরং জীবনের সর্বশাখায় একজন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানবরূপেই প্রতিটি ছাত্রকে গড়ে তোলা হতো। কুরআন, হাদীছ, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতার সাথে সাথে সমাজের দেশের যোগ্য নেতৃত্বের উপযোগী করেই এক একজন ছাত্রকে গড়ে তোলা হতো। কিরাত বিভাগ, হিফজ বিভাগ, আইন গবেষণা বিভাগ, দর্শন, ফালছফা সহ যাবতীয় বিভাগের ট্রেনিংই মাদ্রাসায় দেয়া হতো। বক্তৃতা বিবৃতি, বিচার, প্রশাসন পরিচালনাসহ সমাজ পরিচালনা সর্বদিকের শিক্ষা মাদ্রাসায় দান করা হতো। বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মুরব্বী উক্ত মাদ্রাসার ছাত্র। বিশেষভাবে ছাত্রদেরকে মদীনার নকশায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার মেহনত সেখানে করা হতো। ফলে দেখা গেছে অতি অল্পদিনের মধ্যে উক্ত মাদ্রাসার প্রভাব শুধু বাংলায় নয় সারা উপমহাদেশকে প্রভাবান্বিত করেছে।

রাজনৈতিক জীবন

মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) এক বিরল ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শ রাজনীতিবিদ ছিলেন। আর এ রাজনীতি ছিল তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন রাজনীতির সিংহ পুরুষ। সত্য ন্যায় ও ইনছাফের ঝান্ডাবাহী ইসলামের জন্য উৎসর্গকৃত পূর্ব পুরুষগণ ইসলামকে বিজয়ী মসনদে আরোহন করাতে মুজাহিদ বেশে আরব দেশ থেকে হিজরত করে ভারত ভূমিতে সিংহ বিক্রমে পদার্পণ করেন এবং বিজয়ী বেশে আস্তে আস্তে বাংলা দেশে আবাসস্থল নির্ধারণ করেন। কাজেই জন্মগতভাবে তিনি ছিলেন রাজনীতিবিদ। তাঁর রক্তের প্রতিটি কণায় কণায় জিহাদী স্পিরিট ভর্তি ছিল। অন্যায় ও অসত্যের, জুলুম ও নিপীড়নের শয়তানী প্রভাব থেকে জগতকে মুক্ত করে সত্য, স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির পরিবেশ কায়েম করাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য মুজাহিদে আযম অতি বাল্যকাল থেকেই কুরআনী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। অসত্যের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামই তাঁর রাজনীতির উৎস। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করাই এর আসল উদ্দেশ্য। ছোটবেলায় আব্বার মতের বিরুদ্ধে কুরআন বুকে নিয়ে কাঁদতেন। মানুষের সেবা, মজলুমের সাহায্য, জালেমের উৎখাতের কার্যক্রম তিনি অতি ছোট কাল থেকেই নিজের জীবনে ব্রত হিসাবেই

গ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় আদর্শকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায়ই বিজাতির সামনে গর্বের সাথে ইসলামী পোষাকের জিহাদী প্রদর্শনী দেখিয়েছেন। পাঠ্যবস্থায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে থাকাবস্থায় শেরে বাংলার লক্ষাধিক জনতার সভাকে বন্ধ রেখে আছরের নামাজ আদায় করেছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন এবং কলেজে পড়া বন্ধ করে ইসলামী স্পিরিট হাসিলের জন্য কুরআন-হাদীসের শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে এবং অখন্ড ভারত ও পাকিস্তানের নামে আলাদা স্বাধীন ইসলামিক ষ্টেট কায়েমের নামে দুইটি গতিধারার সৃষ্টি হয়। মুজাহিদে আযমের শ্রদ্ধেয় উস্তাদগণও দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। মুজাহিদে আযম উভয় শ্রেণীর উস্তাদগণের সাথে সুসম্পর্ক রেখে পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে শরীক হয়ে যান। যদিও তাঁর শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) অখন্ড ভারতের পক্ষেই ছিলেন।

তরমুজের ঘটনা

একদিন মুজাহিদে আযম হযরত মাদানী (রহঃ)-এর খেদমতে হাদিয়া দেয়ার জন্য বিরাট একটি তরমুজ খরিদ করে মাথায় করে মাওলানা মাদানীর দরবারে হাজির হলে কিছু সংখ্যক চাটুকার ওলামায়ে ছু হযরত মাদানী (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে হযরতকে বললেন, "হযরত তাঁর হাদিয়া কবুল করবেন না। কারণ সে আপনাকে কাফের বলে" হযরত মাদানী (রহঃ) রাগান্বিত কণ্ঠে তাদেরকে হটিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তোমরা মিথ্যাবাদী শামছুল হকের মুখ দিয়ে এমন কথা প্রকাশ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে এরূপ কথা কখনও বলতে পারে না।" একথা বলে তিনি অগ্রসর হয়ে মুজাহিদে আযমের মাথা থেকে তরমুজটি হাতে নিয়ে অন্দর মহলে গমন করলেন। চাটুকারগণ মুখ কালি করে দূরে প্রস্থান করলো। অখন্ড ভারত ও পাকিস্তান আন্দোলনের মতপার্থক্য সাংঘাতিক রূপ লাভ করেছিল। কিন্তু মাওলানা শামছুল হক অত্যন্ত দূরদর্শীতার সাথে উভয়কুল রক্ষা করে, উভয় পক্ষকে উচ্চ মর্যাদা দান করে নিজে যে কাজকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন সেই ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তান কায়েম করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠন

পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থনে ছিলেন হুজুরের পীর মুজাহিদে জামান হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)। হুযুর হাকিমুল

উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর নির্দেশে তাঁরই যোগ্যতম প্রতিনিধি আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ)-এর নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে কলিকাতা মোহাম্মদ আলী পার্কে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বিপরীতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠন করে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের সাথে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে কাজ করতে আরম্ভ করেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষ, অবলম্বন করার কারণেই ভাসমান মুসলিম লীগ হালে পানি পায় এবং পাকিস্তান আন্দোলন গণ-আন্দোলনে রূপ লাভ করে। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম গঠন করার ব্যাপারে এবং পাকিস্তান কায়েমের ব্যাপারে হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী, হযরত মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিক (রহঃ) সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরামগণের সাথে হুযুর একক ও অনন্য ভূমিকা পালন করেন। হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ)-এর নির্দেশে হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ ছাহেব ও আল্লামা যাফর আহমদ ছাহেবের নেতৃত্বে ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান কায়েম পর্যন্ত হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) অবিভক্ত ভারতের অলিতে গলিতে পাকিস্তানের সমর্থনে জনমত গড়ার আন্দোলনে সফর করেন এবং মিটিং মিছিলকরে পাকিস্তান আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে গড়ে তোলেন।

ঐতিহাসিক শিমলা কনফারেন্সে ঐতিহাসিক ভাষণ দান

শিমলা মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব ঐ সম্মেলনে যে বিপ্লবাত্মক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। এই ভাষনে জিন্নাহ ছাহেব এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ঐ মিটিং এ তিনি মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব দেন কিন্তু মুজাহিদে আযম স্বহাস্যে উক্ত প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে নিজে নিজেই উদ্যোগী হয়ে খাজা নাজিমুদ্দিন ছাহেবকে সভাপতি বানান। উক্ত কনফারেন্সে এ, কে, ফজলুল হক ছাহেব, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, মাওলানা আকরাম খাঁন, জনাব তমিজুদ্দিন খান ও জনাব মাওলানা আতাহার আলী ছাহেব ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব পূর্ব পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতির পদ

অলংকৃত করেছিলেন তখন সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন হযরত মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান ছাহেব এবং নিখিল পাকিস্তানের সভাপতি ছিলেন আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী ছাহেব এবং সেক্রেটারী ছিলেন খতীবে পাকিস্তান হযরত মাওলানা এহ্তেশামুল হক, থানবী (রহঃ)। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় সীমান্ত রেফারেন্ডাম ও সিলেট রেফারেন্ডামে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) উলামাদের সাথে নিয়ে রাত দিন মেহনত করে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ফলে সীমান্ত প্রদেশ এবং সিলেট জেলা আল্লাহর রহমতে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে "মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের অবদান"

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন একটা দেশ স্বাধীন হলেই জনগণের মধ্যে শান্তি ও ইনসাফ কায়েম হবে না। তাই তিনি পাকিস্তানের আসল উদ্দেশ্য ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম না হলে অশান্তি ও বে-ইনসাফী চালু হয়ে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে, বাস্তবে হলোও ঠিক তাই।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সহযোগিতা

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ) সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে মজবুতভাবে গড়ে তুলতে এবং ন্যাশনাল গার্ড ও আনসার বাহিনী নামে সমস্ত জনগণকে দেশ রক্ষার কাজে লাগাতে। এ ব্যাপারে সরকার বেশ অগ্রসর হয়েছিল এবং হযরত মাওলানাও সারাদেশের জনগনের মধ্যে সভা সমিতি করে জনগণকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলেন।

পাকিস্তান মুসলীম লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য

১৯৪৭ সালের পরে মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) পাকিস্তান মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদর্স্য নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময় ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের ওয়াদা করায় হুযুর নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সমর্থনও করেছিলেন। কিন্তু নেতাদের চরম দূর্ণীতি এবং ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রতি গাদ্দারীর কারণে মুসলিম লীগকে চিরতরে বর্জন করেন।

পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টায় হযরত মুজাহিদে আযম

হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই রাত দিন চেষ্টা ও পরিশ্রম করে আসছিলেন। সমস্ত উলামা-তলাবা, ছোলাহা, ইসলামী সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে তিনি সর্বদা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন। ১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথমে তিনিই লালবাগ শাহী মসজিদে পাকিস্তানের চার দফা আদর্শ প্রস্তাবের সমর্থনে আল্লামা যাফর আহমদ উসমানীর (রহঃ) সভাপতিত্বে সম্মেলন আহবান করেন এবং উক্ত সভায় আদর্শ প্রস্তাবের উপর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় অপর এক প্রস্তাবে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপর প্রস্তাব পাশ করা হয়।

মুসলিম লীগের চক্রান্ত

১৯৫০ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন ইসলামী আন্দোলনের গতিরোধের জন্য এক শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি ঘোষণা করেন এবং সরকারীভাবে যাকাত আদায় করার জন্য একটি আইন পাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম উক্ত আইন ও মূলনীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করলে লিয়াকত আলী খাঁন পশ্চিম পাকিস্তান তাঁর সমর্থন পাওয়ার থেকে হতাশ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন ছাহেবের সহায়তায় ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে উক্ত কুখ্যাত আইনের সমর্থনের জন্য ময়মনসিং-এ মুসলিম লীগের সম্মেলন ডাকেন। হযরত মাওলানা ফরিদপুরী ছাহেব কয়েকজন কর্মী ও জনাব মাওলানা আব্দুর রহীম ছাহেবকে সাথে নিয়ে ময়মনসিংহ পৌছেন এবং রাতারাতি পোষ্টার হ্যান্ডবিল প্রচার করে এক বিরাট সম্মেলন করে মুসলিম লীগের কারসাজির কঠোর প্রতিবাদ করেন। ঠিক ঐ দিনই লিয়াকত আলী খাঁন ময়মনসিংয়ে মুসলিম লীগের সম্মেলন করছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তড়িঘড়ি লিয়াকত আলী খাঁন ঢাকা চলে আসেন। মাওলানা ফরিদপুরী ছাহেবও ঢাকায় ফিরে এসে সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, 'ইসলামী শাসনতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রতন্ত্র এদেশবাসী গ্রহণ করবে না এবং নামায কায়েমের হুকুম জারী না করে যাকাতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার সরকারের নেই। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন পল্টন ময়দানে সভা ডেকে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আইন করা হবে না বলে ঘোষণা দেন এবং যাকাত বিল প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

২২ দফা আদর্শ প্রস্তাব পাশ করার জন্য সর্বদলীয় উলামায়ে কিরামের ঐতিহাসিক কুরবানী

সর্বদলীয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে যাতে ঐক্য না হতে পারে এজন্য সরকার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছিল। কিন্তু হক্কানী উলামায়ে কেরাম ১৯৫১ সালের ২১ শে জানুয়ারী থেকে ২৪ শে জানুয়ারী পর্যন্ত করাচীতে চারদিন ব্যাপী সর্বদলীয় উলামা সম্মেলন ডেকে সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য ২২ দফা আদর্শ প্রস্তাব রচনা ও পাশ করেন। এ ব্যাপারে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী মধ্য মনির বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, ফলে ইসলামী শাসনতন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা করতে সরকার ভয় পেয়ে যায়। ২২ দফা পাশের পূর্বে হক্কানী উলামায়ে কেরামের এক বিরাট প্রতিনিধি দল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে জিন্নাহ ছাহেবকে অবহিত করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যতম পরিচালক ছিলেন হযরত মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ)। ৩১ জন সর্বজনমান্য সর্বদলীয় উলামায়ে কেরাম উক্ত ২২ দফায় স্বাক্ষর করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হঠাৎ জিন্নাহ ছাহেবের ইন্তেকালে পাকিস্তানের রাজনীতি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীদের কুক্ষিগত হওয়ার পথে ধাবিত হয়।

পাকিস্তানের গণ পরিষদে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ৪ দফা মূলনীতি পাশ

অবস্থা রেগতিক দেখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চার দফা ইসলামী আদর্শ প্রস্তাবের এজেন্ডায় ১৯৪৯ সালের ১৪ই মার্চ গণ পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের মাওলানা আকরাম খাঁন ব্যতীত সমস্ত সদস্যগণ লিখিত আকারে আদর্শ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানেরও অধিকাংশ সদস্যগণ এর সমর্থন করেন। হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী ছাহেব ও হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) বিরাট কর্মী বাহিনীসহ পার্লামেন্টের দুই গেটে অবস্থান গ্রহণ করেন। গণ পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র আলেম সদস্য মাওলানা আকরাম খাঁ ছাহেব মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে ডেকে আফসোস করে বললেন- "ভাই কোন আশা নেই, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত সদস্য গাদ্দারী করে আদর্শ প্রস্তাবের বিপক্ষে লিখিতভাবে ভোট দান করেছে।" এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন আল্লামা হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ছাহেবকে ভাষণ দানের জন্য আহবান করেন। হযরত

মাওলানা শাব্বীর আহমদ ছাহেব দীর্ঘ সময় ব্যাপী আদর্শ প্রস্তাবের পক্ষে এমন সারগর্ভ জ্বালাময় বক্তব্য পেশ করেন যার ফলে উভয় প্রদেশের সদস্যগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের ভোট প্রত্যাহার করে সবাই একযোগে আদর্শ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান করে আদর্শ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করেন। এই আদর্শ প্রস্তাব পাশের জন্য মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) দীর্ঘ একমাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করে রাত দিন উলামাদেরকে নিয়ে কাজ করেছেন।

জনাব আতাউর রহমান খান ছাহেবের বাড়ীর সামনে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রকাশ্য প্রতিবাদ

১৯৫৪ সালে হক ছাহেবের নেতৃত্বে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রী সভা ভেঙ্গে যাওয়ার পরে ১৯৫৫ সালে আতাউর রহমান খাঁন ছাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ঐ সময় আতাউর রহমান ছাহেবের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিশন ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পেশ করেন। এতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয় এবং ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্য করা হয়। হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব সর্বপ্রথম উক্ত কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদ করেন এবং আতাউর রহমান ছাহেবের বাড়ীর সামনে প্রকাশ্য রাস্তায় বিশাল জনসভা করে জ্বালাময়ী ভাষায় এর প্রতিবাদ করেন এবং পুস্তিকা প্রকাশ করে সারাদেশে ছড়িয়ে দেন। সারাদেশে আগুন জ্বলে উঠে এবং ঘরে ঘরে প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঐ রিপোর্ট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কবলে পাকিস্তানের গণতন্ত্র বিপন্ন

জিন্নাহ ছাহেবের মৃত্যুর পর নাজিমুদ্দিন ছাহেব গভর্ণর জেনারেল হন। লিয়াকত আলী খাঁন নিহত হওয়ার পর নাজিমুদ্দিন ছাহেব প্রধানমন্ত্রী হন। গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল হয়ে গণ পরিষদ বাতিল করেন, পরে ইস্কেন্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল হন। এই ভাংগা গড়ার মধ্য দিয়ে আইয়ুব খাঁন প্রধান সেনাপতি হিসাবে মার্শাল 'ল' জারী করে চরম ডিক্টেটর হিসাবে মসনদে জেকে বসেন। হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহের একদিকে জালেম স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর প্রতিবাদে বই পুস্তক প্রণয়ন ও সভা সমিতি করে প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং অন্যদিকে গঠনমূলক আঞ্জুমান সমিতি তমদ্দুন মজলিস মাদ্রাসা ইত্যাদি কায়েম করে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারাকে অব্যাহত রাখেন এবং জোরদার করতে

তৎপর হন। আইয়ূব খান ক্ষমতায় এসে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী কর্তৃক মোটামুটি যে ইসলামী শাসনতন্ত্র পাশ হয় তা বাতিল ঘোষণা করে নিজে খোদ মোক্তার সেজে নূতন এক শাসনতন্ত্র তৈরী করেন এবং যথেচ্ছা স্বৈরাচারী ভাবধারায় কিছু সংখ্যক চাটুকারদের নিয়ে ডিক্টেটরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেন। কুরআনের বিধান লংঘন করে কুখ্যাত ইসলাম বিরোধী পারিবারিক আইন পাশ করেন। মাওলানা ফরিদপুরী সাহেব স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে দাড়িয়ে যান। ইতিপূর্বে সরকার গোলাম মোহাম্মাদ এর সময় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানী বিরোধীতার বাহানায় জনাব মওদুদী ছাহেবের ফাঁসির অর্ডার জারী করেন। মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক ছাহেব এবং হযরত মাওলানা যাফর আহমদ ছাহেব একত্রে জনগণের দ্বারা লক্ষ লক্ষ টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে তার প্রতিবাদ করেন। ফলে ফাঁসির হুকুম রহিত করে জেলের হুকুমে পরিবর্তিত হয়। অবশেষে বে-কসুর খালাশের হুকুম হয়।

জালেম আইয়ুব শাহীর বিরোধিতা

মুজাহিদে আযম মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) আইয়ুব খানের জবরদস্তী ক্ষমতা দখলে ভয়ানক অসন্তুষ্ট ছিলেন। সবচেয়ে তিনি বেশী দুঃখিত হন আইয়ুব শাহী ক্ষমতায় এসেই ৫৬ এর ইসলামী শাসনতন্ত্র বাতিল করে দেন। মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) সর্বপ্রথম আইয়ুব বিরোধী ভূমিকায় অগ্রসর হন এবং উলামায়ে কেরামদের সাথে নিয়ে সর্বপ্রথম স্কাটন রোডস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণে ইসলমী সেমিনারের নামে বিরাট সম্মেলন করে আইয়ুব খানের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করেন। পরবর্তীতে মজলিসে তামিরে মিল্লাতের উদ্যোগে সিদ্ধেশরীতে শিম্পোজিয়ামের নামে কয়েকদিন ব্যাপী সম্মেলন করে আইয়ুবের নীতিগত সমালোচনা শুরু করেন। ঐ সময় মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ) মজলিসে তা'মীরে মিল্লাতের পুরাপুরি পৃষ্ঠপোষকতায় লেগে যান। এইসময় সমস্ত রাজনীতিবীদগণ ঘরের কোনে তালাবদ্ধ। উলামারা ছিলেন হতাশাগ্রস্ত। হুযুর রাজনীতিবিদ ও উলামাদের ঐক্যবদ্ধ করে ধর্মীয় সভা-সমাবেশের নামে সারাদেশে কর্ম তৎপরতা চালু করে দেন এবং সব জায়গায় নিজে সামনে থেকে সবার মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতে আরম্ভ করেন। এই সময় পাকিস্তানের ইসলাম বিরোধী শক্তি সমূহ ইনকারে হাদীছের দুষ্ট গ্রুপকে হাত করে আইয়ুব খানের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে কোনঠাসা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। হযরত ফরিদপুরী (রহঃ) পাকিস্তানের সমস্ত উলামাদের মাধ্যমে মোনকেরীনে হাদীছ

গ্রুপের বিরুদ্ধে কাফের ফতওয়া জারী করে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এতে আইয়ুব খান মানসিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আরও ক্ষিপ্র হয়ে যায়।

মার্শাল 'ল' ভঙ্গ করে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

এই সময় আইয়ুব খান কুরআন বিরোধী পারিবারিক আইন জারী করে নাস্তিক ডাঃ ফজলুর রহমানের মাধ্যমে নতুন ইসলাম জারী করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী মার্শাল 'ল' ব্রেক করে একদিকে ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশাল মিটিং মিছিল করেন। অপরদিকে উলামায়ে কেরামের দস্তখত সম্বলিত মার্শাল 'ল' বিরোধী পুস্তিকা ছাপিয়ে সমস্ত গোয়েন্দা বিভাগের অগোচরে উক্ত পুস্তিকা বাংলার প্রতিটি অঞ্চলের জুমা মসজিদে পৌছে দেন এবং প্রচার করেন। সরকার টের পেয়ে সান্ধ্য আইন জারী করে তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু হুযুরের দূরদর্শীতায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মার্শাল 'ল' বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সরকার ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এবং মার্শাল 'ল' এ্যাডমিনেষ্ট্রেটর দ্বারা হুযুরকে ডাকিয়ে হুমকি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হুযুরের বিচক্ষণতা ও সীমাহীন সাহসিকতায় সরকার পক্ষ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হুযুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। হুযুরকে তারা বলল, "মার্শাল 'ল' অমান্য করে আপনি কেন এসব কাজ করছেন।" হুযুর উত্তরে সাহসিকতার সাথে বললেন, মার্শাল 'ল' আমি অমান্য করিনি, আপনারা সরকারী কর্মচারী হিসাবে সরকারের হুকুম পালন করছেন আর আমার যিনি আসল সরকার আল্লাহ পাক আমি শুধু তারই হুকুম পালন করছি। আল্লাহর সরকারের হুকুম মান্য করতে আমি অন্য কোন সরকারের পরওয়া করিনা।' এই কথা শুনে সরকার পক্ষ চুপ করে যায় এবং হুযুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে আইয়ুবের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করে।

গভর্ণর আযম খানের অপারগতা

একবার আইয়ুব খাঁন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আযম খানকে হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে গ্রেফতার করার হুকুম দেন। আযম খাঁন ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের মাধ্যমে খবরা খবর নিয়ে বিভিন্ন মহলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে বুঝতে পারেন, মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে গ্রেফতার করলে প্রশাসন বিকল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। আযম খাঁন আইয়ুব খানকে মাওলানা শামছুল হককে গ্রেফতারের ভয়াবহ পরিণতির কথা জানিয়ে দিলে আইয়ুব খাঁন অবস্থা বেগতিক বুঝতে পেরে এ পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন।

দশ লক্ষ টাকা প্রত্যাখ্যান এবং সরকার প্রধানকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দান

একবার ১৯৬৪ সালে হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লাহোর হাসপাতালে ভর্তি হন। এই সুযোগে আইয়ুব খান বাংলাদেশের তিনজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর মাধ্যমে গওহরডাংগা মাদ্রাসায় দশ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করলে এবং উক্ত টাকার কোন হিসাব দেওয়া লাগবে না বলে পাঠালে মাওলানা জ্ঞাত হয়ে ঘৃণা ভরে উক্ত চেক প্রত্যাখ্যান করেন এবং আইয়ুব খানকে বলে পাঠান প্রেসিডেন্ট ছাহেব, টাকা দ্বারা গরু, ছাগল কেনা যায়, মানুষ কেনা যায় না। আমরা মুসলমান আল্লাহর হুকুমের সামনে সমস্ত দুনিয়ার সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। মাওলানা শামছুল হক ছাহেব ছিলেন খাঁটি নায়েবে নবী, আলেমে রব্বানী। ন্যায়ের পথে ছিলেন বজ্রের ন্যায় কঠোর আপোসহীন। কারো রক্ত চক্ষুকে তিনি পরোয়া করতেন না কোনদিনও।

মনগড়া ঈদের জামায়াতের বিরোধিতা

একবার ঈদুল ফিতরের সময় আইয়ুব খান হুকুম জারি করলেন উভয় প্রদেশে একই দিনে ঈদ অনুষ্ঠিত হবে। গভর্ণরদ্বয়, মন্ত্রীপরিষদ উঠে পড়ে লেগে গেলেন। পেশোয়ারে, না কোথায় চাঁদ দেখা গেছে কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও চাঁদ দেখা না গেলেও আইয়ুব খান উভয় প্রদেশে ঈদের নামায পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর অনেক চামচা মৌলবী পীর ফতওয়াবাজ যোগাড় করে সব আলেমদের দাওয়াত দিয়ে আইয়ুবের হুকুমে চাঁদ দেখা না গেলেও পূর্ব পাকিস্তানে ঈদের নামায পড়ার ফতওয়া চেয়ে বসলেন। চামচা গোষ্ঠী একযোগে ঈদের নামায পড়ার হুকুম জারী করে দিলেন। কিন্তু হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব সেখানে বসা ছিলেন। তিনি দাড়িয়ে গেলেন এবং জলদ গম্ভীরস্বরে গভর্ণরের মুখের উপর ঘোষণা দিলেন "আগামী কাল ঈদ হবে না, সকলের উপর রোযা রাখা ফরয। আমি এখানে কোন রাজা-বাদশার হুকুম মানতে পারিনা। কিতাবপত্র সব সামনে নিয়ে কারো বুকের পাটায় জোর থাকলে সে বলুক শরীয়তের দৃষ্টিতে আগামী কাল ঈদ হতে পারে? সব চুপ হয়ে গেল। কেউ সাহস করে আর একটি কথাও বলল না। মজলিস ভেঙ্গে গেল। কিন্তু গভর্ণর সরকারীভাবে মাইকে আগামী কালের ঈদের কথা ঘোষণা করলো, রেডিও, টেলিভিশনে প্রচার করল। হুযুরও পাল্টা মাইকে আগামী কাল রোযার ঘোষণা দিলেন। পরের দিন জনগন কেউ ঈদের নামায পড়লো না। ঈমাম খুজে পাওয়া

গেলনা। কয়জন সরকারী কর্মচারী হাজির হলো তাও রোযা রেখে। কিন্তু তার পরের দিন হুযুরের নেতৃত্বে বিপুল উৎসাহের সাথে ঈদ উৎসব পালিত হলো।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মুখের উপর তাকে ধোকাবাজ সম্বোধন

১৯৬৬ সালে আইয়ুব খাঁনের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট অর্থলোভী মৌলবীদের জানিয়ে দিলেন, 'এইবার নির্বাচনে আপনাদেরকে আর টাকা দেওয়া হবে না, যদি মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে আমার সমর্থনে আপনাদের সাথে আমার সামনে আনতে না পারেন।' সবাই মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। মাওলানা শামছুল হক ছাহেব যে শক্ত মানুষ হকের ব্যাপারে অটল-অবিচল। তাকে তো আইয়ুবের সমর্থনে কিছুতেই রাজী করা যাবে না। আর তিনি রাজী না হলে টাকাও পাওয়া যাবে না। আইয়ুব খাঁন এও বলে দিয়েছেন যে, জনগন মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে ভালবাসে, তার হুকুম মান্য করে, কাজেই তাকে আমার চাই-ই। মহা সমস্যায় পড়ে অর্থলোভী মৌলবী ছাহেবান এক অভিনব কৌশল ঠিক করলো। প্লান করলো মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে প্রেসিডেন্টের ভবনে দাওয়াত দেওয়া হবে কিন্তু তাকে কোন কথা বলতে দেওয়া হবে না। কৌশলে অন্য লোকে প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের পর কথা বলে দোয়া করে দিবে, প্রেসিডেন্ট দেখবে মাওলানা শামছুল হক ছাহেব উপস্থিত আছেন। বাস এইভাবে কাজ ফতেহ হয়ে যাবে। বক্তা ও দোয়া মোনাজাতের জন্য আলাদা আলাদা লোক ঠিক করা হলো। যথাসময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকা এলেন। প্রেসিডেন্ট হাউজে সভার তারিখ ঠিক হলো। সবাইকে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেওয়া হলো। সমস্ত হক্কানী উলামায়ে কেরাম সম্মেলনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ ধোকার পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে কেউই আইয়ুবের সাপোর্টার সাজতে রাজী হলো না। কিন্তু মাওলানা ফরিদপুরী দাওয়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী অনেক বুঝালেন যে, এ ধোকার ফাঁদে পা দিবেন না।" কিন্তু মাওলানা ফরিদপুরী সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং সবাইকে বলে দিলেন, 'আমি বোবা বুঝ দিল নই, দেখি কেমন করে ধোকা দেয়।' মুজাহিদে আযম মাওলানা ফরিদপুরী একাই যথা সময় প্রেসিডেন্ট হাউজে সভায় যোগদান করলেন। সভা শুরু হলো। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব উদ্বোধনী ভাষণ শুরু করলেন। সভায় তিনি বললেন, 'মাওলানা ছাহেবান, পীর ছাহেবান উলামা হযরত! আমি ইসলামের বিগত ৫/৬ বছরে অনেক খেদমত করেছি।

আগামী নির্বাচনে যদি আপনারা আমাকে সমর্থন করেন তবে আমি ইসলামের জন্য আরও অনেক কাজ করবো ইনশাআল্লাহ। দেখুন বিগত সময় আমি ইসলামিয়াতকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করেছি, আমি কেন্দ্রের জন্য ইসলামী রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি, আমি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছি, আরও অনেক কিছু করেছি বলে তিনি হয়ত বলবেন আগামী নির্বাচনে আমাকে ভোট দিলে ইসলামের জন্য আরও অনেক কিছু করবো। এর পর নির্ধারিত মুফতী ছাহেব হয়ত প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ দিবেন এবং দোয়া হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের আমি ইসলামের জন্য অনেক করেছি মাঝেই সিংহ পুরুষ মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ আওয়াজে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার মাঝেই বলে উঠলেন, 'আপনি ইসলামের জন্য কিছুই করেননি, করেছেন শুধু ইসলামের সাথে এক নম্বরে ধোকাবাজী।' আর যায় কোথায়? লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান চক্ষু লাল করে বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করে বলে উঠলেন– আপনি কার সামনে কথা বলছেন খবর আছে? আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পাঠানের বাচ্চা পাঠান।' পাল্টা জবাবে মুজাহিদে আযম আরও তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন– আপনার খবর আছে আমি মুসলমানের বাচ্চা মুসলমান। আমাকে একা মনে করলে আপনার ভুল হবে, দেখেন দশ কোটি মুসলমান আমার পশ্চাতে দন্ডায়মান, সাবধানে কথা বলুন।' মুজাহিদে আযমের তেজদীপ্ত কথায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যেন ঘাবড়িয়ে গেলেন, থতমত খেয়ে নরম সুরে বললেন, 'কিভাবে আমি ধোকাবাজী করলাম বলুন।' মাওলানা এক নিঃশ্বাসে ১০/১২ টি উদাহরণ পেশ করে বললেন, আপনি কেন্দ্রে ইসলামী রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট করেছেন সত্য কিন্তু তার ডাইরেক্টর বানিয়েছেন নাস্তিক ইসলাম বিকৃতকারী ডাঃ ফজলুর রহমানকে। আপনি পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্য কিন্তু তার ডাইরেক্টর বানিয়েছেন ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত চিন্তাধারার অধিকারী একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্বকে, আপনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াতকে বাধ্যতামূলক করেছেন সত্য কিন্তু তার জন্য কোন শিক্ষক রাখেননি ইত্যাদি। কাজেই ধোকাবাজী ছাড়া আর কি? প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এই কথার পর একেবারেই ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, শিক্ষামন্ত্রী এ টি এম মোস্তফাকে ডাক, মোনায়েম খাঁকে ডাক, মাওলানা কি বলছেন, আমার বুঝে

আসছেনা। তোমরা তাকে বুঝাও।' অতঃপর প্রেসিডেন্ট বসে পড়লেন। কোন কোন মন্ত্রী রাগ দেখিয়ে বললেন, 'হুযুর আপনি প্রেসিডেন্টের সাথে কি আরম্ভ করলেন? হুযুর তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমাদের সাথে আমি কথা বলতে আসিনি, চুপ করো। সব চুপ হয়ে গেল। এরপর চাটুকারেরা প্রশংসা ও প্রেসিডেন্টের চৌদ্দ পুরুষের রাজত্বের জন্য তড়িঘড়ি দোয়া আরম্ভ করলো। হুযুর বলেন, আমি তখন সভা থেকে উঠে চলে এলাম। এদের দোয়া শুনতে আমার মন চাইল না।

বাদশাহ ফয়সালের দাওয়াত মুজাহিদে আযম

একবার ১৯৬৬ সালে সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সল রাবেতা আলমে ইসলামী সম্মেলনে হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)কে দাওয়াত দিয়েছিলেন। ঐ সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা দ্বীনি অগ্রগতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু সৌদী টিকিট প্রাপ্তির পর পাসপোর্টের জন্য হাজারও চেষ্টা করা সত্ত্বেও সরকার পাসপোর্ট দিতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর মুফতীয়ে আযম আল্লামা শফী ছাহেবের মাধ্যমে চেষ্টা করতে গিয়ে জানতে পারা যায় স্বয়ং আইয়ুব খাঁন নিজেই তাকে পাসপোর্ট না দেওয়ার জন্য পররাষ্ট্র দফতরকে বলে দিয়েছেন। কারণ আইয়ুব খান মনে করেছিলেন মাওলানা শামছুল হক ছাহেব বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনে যোগদান করতে পারলে তাঁর ইসলাম বিরোধী সব গুমর প্রকাশ হয়ে যাবে। এজন্যই আইয়ুব খাঁন এ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া প্রতিষ্ঠা

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার আলোচনা করতে গিয়েই হুযুরের রাজনৈতিক জীবনের কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে হলো। কারণ এই মাদ্রাসায় অবস্থান কালেই তিনি বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হুযুর পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কাজের প্রোগাম নিয়ে অগ্রসর হন। বিশেষ করে ঢাকাকে কেন্দ্র করে দ্বীনি শিক্ষার আরো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতেছিলেন। ঐ সময় ১৯৫০ সালে তিনি একদিন

স্বপ্নে দেখেন লালবাগ শাহী মসজিদের হাউজের পার্শ্বে স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে শরবত পান করাচ্ছেন। হুযুর ঐ সময় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছেন। এই স্বপ্ন দেখার পর মোঘল আমলে তৈরী শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি দীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় আশরাফুল উলূম মাদ্রাসাও সেভাবে মনের মত গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল। তার কিছু মৌলিক ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হওয়ায় ফেতনার আশংকায় আশরাফুল উলূমে হযরত পীরজী হুযুরের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর আদর্শ মাদ্রাসা গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ শুরু করেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর পূর্ব থেকেই শাহী মসজিদের পেশ ইমাম হিসাবে সেখানে অবস্থান করছিলেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুরকে সাথে নিয়ে হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উছমানী (রহঃ)কে মুরব্বী রেখে মহল্লার বিভিন্ন গণ্য মান্য মুরব্বীদের নিয়ে লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া নামে ১৯৫০ সাল হিজরী ১৩৭০ সালে শাওয়াল মাসে শাহী মসজিদে মাদ্রাসা শুরু করেন। প্রথম বছর প্রথম মাস থেকেই শুরু থেকে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত ক্লাশ চালু হয়ে যায়। হযরত হাফেজ্জী হুযুর তো প্রথম থেকেই লালবাগ ছিলেন। ঐ সময় তিনি আশরাফুল উলূম মাদ্রাসায়ও পড়াতেন। পরে সম্পূর্ণ লালবাগে পড়াতে শুরু করেন। হুযুরের নিজ হাতে গড়া ছাত্র হযরত মাওলানা হেদায়েত উল্লাহ ছাহেব, হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব ও অন্যান্য উস্তাদগণ ঐ সময় আশরাফুল উলূম মাদ্রাসার উস্তাদ ছিলেন। সবাই একে একে লালবাগ তাশরীফ নিয়ে এলেন। যোগ্য উস্তাদগণের সমাবেশ লালবাগে হতে আরম্ভ করলো। হুযুর মনের মত করে লালবাগ মাদ্রাসাকে গড়ে তুললেন। আদর্শ আলেম হিসাবে ছাত্রদেরকে গড়ে তোলার সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসা বাংলাদেশেরই নয় মুসলিম বিশ্বের একটি আদর্শ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। প্রথম অবস্থায় ঘর দরজা ছিল না বললেই চলে। হুযুরের একদিনের আলোচনায় ছয় মঞ্জেলা বিল্ডিং-এর ব্যবস্থা হয়ে গেল। লালবাগকে কেন্দ্র করে যেন সারাদেশে এক নতুন ইসলামী জাগরণ শুরু হলো। কি রাজনীতি, কি ধর্মনীতি, কি সংস্কার ও সমাজনীতি অর্থনীতি, হকের প্রতিষ্ঠা, বাতিলের প্রতিরোধের এক বিশালাকার ঘাটি রূপেই লালবাগের অস্তিত্ব মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। যে স্মৃতি আজ পর্যন্ত আপন গৌরবে অব্যাহত রয়েছে।

জামেয়া এমদাদিয়া ফরিদাবাদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরবানীর এক বিরল দৃষ্টান্ত

ফরিদাবাদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গোড়ায় এক অলৌকিক কোরবানীর নমুনা নিহীত রয়েছে। কলিকাতার বিখ্যাত দ্বীনদার ব্যবসায়ী ওয়াছেল মোল্লা ছাহেব (রহঃ) হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোল্লা ছাহেবের ছেলে জনাব আলহাজ্জ কবির উদ্দিন মোল্লা ছাহেব পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় এসে মিল কল-কারাখানা স্থাপন করেন। হুযুর তাকে মোল্লা ছাহেবের ছেলে হিসাবে খুব আদর ও স্নেহ করতেন। তিনি হুযুরের কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। একবার হুযুর সংবাদ পেলেন কবির মোল্লা ছাহেব কাচা পয়সার চিন্তায় ফরিদাবাদ এলাকায় সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি খরিদ করে সেখানে একটি সিনেমা হল করার পরিকল্পনা করছেন। সাথে সাথে হুযুর কবির মোল্লাকে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য খবর পাঠালেন। কবির মোল্লা ছাহেব যথাসময় খবর পেয়েও বেশ কিছু দিন দেরী করে হুযুরের খেদমতে দেখা করতে এলেন, হাতে একটি দলিল। হুযুর দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে কবির মোল্লা ছাহেব দলিলটি হুযুরের হাতে দিয়ে বললেন, শয়তানের ধোকায় খারাপ চিন্তা করেছিলাম, আপনার খবর পেয়েই আমার ভুল বুঝে এসেছে। আমি জমি আপনার নামে ছাফ কওলা করে দিয়ে দলিল বাহির করতে এই কয়দিন দেরী করেছি। ঐ জায়গায় আপনার জন্য একটি বাসস্থান নির্মিত হবে। দলিলটি ঐ জায়গার আপনি তা খুশীর সাথে কবুল করুন। হুযুর চেহারা একটু মলিন করে বললেন, বাবা শর্ত করা জায়গা আমি কবুল করি না। আপনি আপনার দলিল ফেরৎ নিয়ে যান। কবির মোল্লা ছাহেব আশাহত হয়ে হুযুরের পায়ের উপর পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন এবং কি হলে কবুল করবেন তা জিজ্ঞাসা করলেন। হুযুর বললেন, কোন শর্ত না হলে আমি কবুল করতে পারি। ঐখানে আমরা যা খুশী করব এই শর্তে কবুল করতে পারি। কবির মোল্লা ছাহেব খুশী হয়ে হুযুরের কথায় রাজী হয়ে গেলেন। হুযুর তার পরের দিনই হযরত হাফেজ্জী হুযুরকে মুহ্তামিম করে ঐস্থানে মাদ্রাসা চালু করে দিলেন এবং জনাব আঃ আজিজ মরহুম মোমেন মোটর কোম্পানীকে বলে চর্তুদিকে দালানের জায়গা বাদ রেখে টিনের ঘরের ব্যবস্থা করতে বললেন এবং পশ্চিমে একটা বড় আকারের মসজিদ করে দেওয়ার কথা বলে দিলেন। অল্পদিনেই মাদ্রাসা চালু হয়ে গেল। হুযুরের ইচ্ছা ছিল তাড়াতাড়ি ঐ এলাকায় একটি দাওরা হাদীছ মাদ্রাসা গড়া। এজন্য হযরত হাফেজ্জী হুযুরের মত মুরব্বীকে কষ্ট না দিয়ে হুযুরের সবচেয়ে বড় সমালোচনা কারী যোগ্য আলেম হযরত মাওলানা বজলুর রহমান ছাহেব তিনি তখন আশরাফুল উলূম থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ছদর ছাহেব তাকে ফরিদাবাদের

হতামিম করে দিলেন এবং হযরত হাফেজ্জী হুযুরকে সেখান থেকে নিয়ে এসে কামরাঙ্গীচর মাদ্রাসার বিশাল পরিকল্পনার কাজে চিন্তাভাবনা করার পরামর্শ দিলেন। ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় হাত দেওয়ার পূর্বে সমস্ত জায়গা মাদ্রাসার নামে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন।

জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম খাদেমুল ইসলাম গওহরডাংগা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

হযরত মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর মনে মনে একটা আকাংখা ছিল নিজের দেশের মানুষের জন্য একটা দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু লোক পাচ্ছিলেন না। এ সময় হুযুরের বিশিষ্ট শাগরেদ হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব মোল্লাহাট থানা উদয়পুর গ্রামে পীরে কামেল হযরত মাওলানা আব্দুল হালিম (রহঃ) মাদ্রাসায় মোহতামেমের পোষ্টে পীর ছাহেব হুযুরের সাথে কথা বলে হুযুরের এজাজতের জন্য গওহরডাংগা এসে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হুযুর সব কথা শুনে খুশী হয়ে বললেন, আমার মনেও একটা আকাংখা ছিল গওহরডাংগায় একটা কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা করার। কিন্তু লোক পাইতেছি না। আপনি যদি রাজী হন তবে মনের আকাংখা পূর্ণ হতো। হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব খুশীর সাথে বড় মাদ্রাছার প্রিন্সিপ্যালের পদমর্যাদা ত্যাগ করে হুযুরের কথায় মক্তবের শিক্ষকতায় রাজী হয়ে গেলেন। হুযুর গ্রাম্য মুরব্বীগণকে ডেকে গ্রামে হুযুরের বাড়ীর মসজিদে মাদ্রাছার কাজ শুরু করে দিলেন। বেতন মাত্র পাঁচ টাকা। কোন মাসে চার আনাও পেয়েছেন। হুযুরের নেগরানী ও চেষ্টায় সে মাদ্রাসা আজ বাংলাদেশে একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র ও ৫০ জন শিক্ষক কর্মচারী সমন্বয়ে ৮০/৯০ লক্ষ টাকা আয়-ব্যয়ে সুচারুরূপে চলিতেছে। তিনি মাদ্রাসার হেফজখানার দক্ষিণ পার্শ্বে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। হযরত মুহতামিম ছাহেবের হাতে প্রায় ৬০ বছর পর্যন্ত এ মাদ্রাসাটি পরিচালিত হয়ে এসেছে। মুহতামিম ছাহেব ও হুযুরের পার্শ্বে চির নিদ্রায় মগ্ন আছেন।

ইসলামী গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। জাতিকে সর্বাঙ্গীন, সুন্দর সুচারুরূপে গড়ে তোলার জন্য তিনি সর্বদা চিন্তা-ফিকির করতেন। কোটি কোটি পৃথিবীবাসীর কাছে ইসলামের চির শাশ্বত বিধানকে পৌছানের জন্য এবং সর্বপ্রকার গোমরাহী থেকে মুক্ত রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ যোগ্য বিজ্ঞ লেখক, বক্তা, সমাজ সংস্কারক, গবেষক, সাধক, বীর মুজাহিদের

প্রয়োজন। যুগোপযোগী যুক্তি প্রমাণ ও যুগ জিজ্ঞাসার জবাব এবং ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডনের জন্য চাই সৃষ্টি ধর্মী কাজের যোগ্যতা কলমের জোর দার্শনিক যুক্তি। এজন্য তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করে যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গবেষক, ঐতিহাসিক আলেমে দ্বীন আল্লামা নূর মোহাম্মদ আজমী ছাহেবের পৃষ্টপোষকতায় ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় এদারাতুল মা'আরিফ নামক একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে দাওরা পাশ আলেমদের ও অন্যান্য শিক্ষিত ছেলেদের ভর্তি করে, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, রচনা, প্রবন্ধ তৈরী, যুগ জিজ্ঞাসার জওয়াব অনুসন্ধান, ইসলামী আইনের গবেষণা সহ বিভিন্ন বিষয়াদির শিক্ষা দেওয়া হতো। আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী ছাহেব উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রথম পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।৭০ এর গোলমালের সময় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় এ প্রতিষ্ঠানটি আজও চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

খৃষ্টান মিশনারীদের মোকাবেলায়

মুসলিম জাতি শতধা বিচ্ছিন্ন, দারিদ্র পীড়িত, সামাজিক কু-সংস্কার ও নীচশয়তা বিভিন্ন ব্যধিতে আক্রান্ত। এই সুযোগে বিভিন্ন জাতি ইয়াহুদী, খৃষ্টান মিশনারী ও ওরিয়েন্টালিষ্ট পার্টির আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলিম বিশ্ব দিনে দিনে খৃষ্টান ধর্ম ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। কোন কোন মুসলিম দেশে খৃষ্টান জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং পাক-ভারতে খৃষ্টানদের প্রচারকার্য জোরে শোরে চলছে। পাকিস্তান আমলেই এদেশে খৃষ্টান পাদ্রীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের জ্বাল বিস্তার করতে তৎপর হয়। পাদ্রী পায়ারের শান্তি দ্বীপের নামে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হলে আইয়ুব সরকার তাকে সাহায্য করে। হযরত মাওলানা এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের শাখা সংগঠন হিসাবে আঞ্জুমানে তাবলীগুল কোরআন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে পাদ্রী পায়ারের বিরুদ্ধে খাদেমুল ইসলামের প্রচার সম্পাদক জনাব মাওলানা ফজলুর রহমাননের নেতৃত্বে একটি ওয়াফদ পাঠান এবং অল্পদিনে পাদ্রীকে দেশ ছাড়া করেন। নারানগঞ্জের চাড়ার ঘাটের পাদ্রীকে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দেশ ছাড়া করেন। আল্লাহর প্রেরিত ইঞ্জিল কোথায়? পাদ্রীদের গুমর ফাঁক কিতাব লিখে বিশ্ব খৃষ্টানদের চ্যালেঞ্জ করে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলেন। শিল ছড়িতে ৬০ একর জমি নিয়ে ইসলাম মিশনের কাজ শুরু করেন। ময়মনসিংহ গারো এলাকায় ও দিনাজপুরের বিভিন অঞ্চলে এবং সুন্দরবন এলাকা ও দেশের

ভিতরের বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টানদের মিথ্যা ভন্ডামীর মুখোশ খুলে ধরে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

খৃষ্টান মিশনারীরা দুস্থ মানবতার সেবার নামে ধোকা দিয়ে, আমেরিকা, ইউরোপের রয়াল সিটিজেন বানানোর লোভ দেখিয়ে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালায়। মিশনারীরা বিভিন্ন এন, জি, ও -এর ছদ্মাবরণেও তাদের মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা করে। আঞ্জুমানে তাবলীগুল কুরআন, খাদেমুল ইসলামের শাখা সংগঠন হিসাবে এই খৃষ্টান মিশনারী প্রতিরোধের কাজে সদা তৎপর ছিল। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) জাতিকে সজাগ করার সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রসারের জন্যও চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি বার বার সরকারকে হুশিয়ার করে দেন। কিন্তু সরকার উল্টো মিশনারীদের বন্ধু মনে করে তাদের সহযোগিতা করতে থাকেন। ফলে মিশনারীরা অধিক সাহস ও হিম্মত পেয়ে সরকারী আইনেরও বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকে। তাদের শাসন করতে গেলে উল্টা তারা আমেরিকার ভয় দেখায়। মাওলানা শামছুল হক ছাহেব এ সংস্থার মাধ্যমে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলার কাজ চালিয়ে যান। বর্তমানে এ আঞ্জুমানের কাজ খাদেমুল ইসলামের নামেই চলছে।

কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) জাতিকে সার্বিকভাবে ইসলামের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে গড়ে তোলার জন্য একদিকে মাদ্রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে প্রতিটি মসজিদ কেন্দ্রীক কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং কুরআনী মক্তবের সাথে প্রাথমিক প্রাইমারীর সিলেবাস ও তাতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। যাতে করে লোকে মক্তবের শিক্ষার সাথে সাথে ছেলে মেয়েদের শিক্ষাও দিতে পারে। এজন্য হুযুরের অত্যন্ত আদরের শাগরেদ হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়েত ছাহেবের মাধ্যমে নূরাণী প্রাইমারী চালু করেন। সেখানে হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়েত ছাহেব একই সংগে সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। বরং সাধারণ প্রাইমারী শিক্ষায় যেটুকু বাংলা, ইংরেজী, অংক, হাতের লেখা শিক্ষা দেওয়া হয়, হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়েত ছাহেবের পদ্ধতিতে উভয় প্রকার শিক্ষাই আরও অধিকতর সুন্দরতম পন্থায় ছেলে মেয়েরা বেশী যোগ্যতা অর্জন করছে। অপরদিকে মুজাহিদে আযম তাঁর অপর এক শাগরেদ বন্ধু হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহাবের মাধ্যমে নাদিয়ার তরীকায় মক্তব প্রশিক্ষণ চালু করেছেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত ক্বারী হযরত মাওলানা ইব্রাহীম ছাহেব চাঁদপুরী এক নতুন

তরীকায় কুরআন শিক্ষা চালু করেছেন। মুজাহিদে আযম হযরত ক্বারী ছাহেবকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন এবং তাঁর এ পদ্ধতিকে সর্বত্র চালু করার জন্য ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন। এইভাবে ঘরে ঘরে কুরআনের আলো পৌছানোর জন্য হুযুর জীবন ওয়াকফ করে দেন।

কুরআন তহবিল প্রতিষ্ঠা

হযরত মুজাহিদে আযম বলতেন, দুনিয়ার সমস্ত জাতি তাদের ধর্মের জন্য নিজের আয়ের একটি অংশ ব্যয় করে বিশেষ করে খৃষ্টান জাতি তাদের মিথ্যা ধর্মের প্রচারের জন্য প্রত্যেকে কমপক্ষে আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ (এক দশমাংশ) ব্যয় করে থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলিম জাতি কুরআনের নামে পয়সা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় এবং বেহুদা কাজে, শয়তানী কাজে প্রচুর পয়সা ব্যয় করে। কুরআনে পাকের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি বলতেন, যেদিন আল্লাহর রাসূল আল্লাহর কাছে নালিশ করে বলবেন, হে আল্লাহ আমার কওম তোমার এই কুরআনকে বাদ দিয়ে রেখেছিল। এই কথার আসামী হতে না হয় এইজন্য তিনি অন্য সমস্ত দ্বীনি কাজের সাথে সাথে প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে কুরআন ফান্ড নামে একটি তহবিল গঠনের জন্য সবাইকে উৎসাহিত করতেন এবং কমপক্ষে টাকা প্রতি এক পয়সা হলেও আল্লাহর কুরআনের খেদমতের নামে, দ্বীনের প্রচার প্রসার, তাবলীগ ও জেহাদী কাজের জন্য ব্যয় করতে বলতেন। এজন্য তিনি ঘরে ঘরে কুরআন ফান্ড প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

ইমাম সমিতি গঠন

ইসলামের জন্য উৎসর্গকৃত এই মর্দে মুজাহিদ জাতিকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তার অন্তরে বহু দিনের পালিত পরিকল্পনা জাতির সমস্ত মসজিদ সমূহ এবং ইমামদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে খুলনা টাউন হল মসজিদে এক বিরাট সম্মেলন করে আয়েম্মায়ে মাছাজিদ বা ইমাম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি খুলনা বিভাগের পাঁচটি জেলার ইমামদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। আস্তে আস্তে এই আদর্শে বর্তমানে সারা দেশেই কমবেশী ইমাম সমিতি গঠিত হয়েছে। তিনি চাইতেন সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এক মুহূর্তে আল্লাহর ও রাসূলের অনুসৃত পথে এসে যেত তবে কতইনা ভাল হতো। এজন্য তিনি যে মানুষটা যে কাজের যোগ্যতার অধিকারী হতেন তাকে সেই কাজে আরও অধিকতর যোগ্যরূপে গড়ে তুলতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। সমস্ত মানুষ যেন তাঁর সন্তানের মত প্রিয় ছিল। এজন্য প্রত্যেকটা মানুষই মনে করত হুযুর আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন।

তার মহৎ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দানের উদ্দেশ্যেই ইমাম সমিতি এবং মসজিদ কর্ম-পরিষদ গঠন করেছিলেন।

মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযুক্তির প্রচেষ্টা

মুজাহিদে আযম বলতেন, কর্মের মাঝে ধর্মের পরীক্ষা। এটাই আমাদের আসল কাজ। ধর্মহীন কর্ম শিক্ষা এবং কর্মহীন ধর্ম শিক্ষা উভয়টাই বেকার। এজন্য চাইতেন মাদ্রাসা শিক্ষার পূর্ণাঙ্গতা বজায় রেখে আধুনিক শিক্ষার মূল বিষয়গুলোকে তার সাথে সংযোজিত করে দেয়া। যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষই দেশ, জাতি, ধর্মের ব্যাপারে পরিপূর্ণ যোগ্য হয়ে আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে উঠতে পারে। অযথা সময় নষ্ট করাকে তিনি জীবন নষ্টের শামিল বলে মনে করতেন। তিনি মাতৃভাষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী দিতেন এবং ধর্ম ভাষাকে সবার উপরে স্থান দিতেন। তাঁর নেগরানীতে লালবাগ, গওহরডাঙ্গা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সিলেবাসের আমুল পরিবর্তন সাধন করেছিল কিন্তু মূর্খ গোড়া পন্থীদের কারণে অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হতেন। তবে সব বাধাই তিনি হাসিমুখে বরদাশত করে নিতেন। কোন বাধাই তাঁর দুর্বার গতিকে থামিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি।

ইসলামী আরবী বিশ্ব বিদ্যালয় কমিশনের সদস্য হিসাবে আল্লামা শামছুল হক (রহঃ)

আইয়ুব শাহীর আমলে দাবী দাওয়া আদায়, মিছিল-মিটিং করা ছিল অকল্পনীয়। যা কিছু করার তা যেন মাওলানা শামছুল হক ছাহেব কেন্দ্রিক ছিল। কারণ ঝুকিপূর্ণ কাজে কেবলমাত্র মাওলানাকেই এক নম্বরে সবাই পেতেন। তিনি উদ্বোধন না করলে কেউই তাতে হাত দিতে সাহসী হতেন না। সবাই মুখ বন্ধ করে মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের দিকে ইশারা করতো এবং বলতো এসব ঝুকিপূর্ণ কাজতো তাঁরই। আইয়ুবের আমলে ১৯৬৩ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশ্রেণীর মাদ্রাসা থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র ইসলামী আরবী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দাবীতে রাজপথে নেমে পড়েছিল। ইতিপূর্বে আইয়ুব আমলে তার নজির ছিল না। তখনকার আইয়ুবের গভর্ণর জনাব আযম খাঁন ছাত্রদের দাবী খুশীর সাথে মেনে নেন এবং এ উদ্দেশ্যে জনাব ডক্টর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে এগার সদস্যের একটি কমিশন গঠিত হয়। উক্ত কমিশনের অন্যতম দরদী সদস্য ছিলেন আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)। কিন্তু দুঃখের বিষয় আইয়ুবের পরবর্তী গভর্ণর জনাব মোনায়েম খাঁন অযথা টাল-বাহানা করে এ দাবীকে পিছিয়ে দেন। এজন্য হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব

তৎকালীন ডি পি আইকে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন, আপনারা আজ যে ইসলামী আরবী বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অন্যান্য ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে টাল-বাহানা করছেন, জেনে রাখুন ইসলামী শিক্ষা না থাকলে আপনাদের রাজত্বের অছিলা পাকিস্তানও থাকবে না। আপনারা খড় কুটার মত ভেসে যাবেন।

কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা

হযরত মুজাহিদে আযম কর্মীর হাতকে খুবই বেশী ভালবাসতেন। তিনি প্রায় সময়ই ঐ হাদীছটি বলতেন যে, একদা একজন গ্রাম্য লোক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে যখন হুযুর পাকের হাতে হাত দিয়ে মোছাফাহা করলেন, তখন হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ছাহাবীর হাতকে শক্ত অনুভব করে জিজ্ঞাসা করলেন– "আপনার হাত এত শক্ত কেন? উক্ত ছাহাবী জবাবে বললেন, হুযুর! আমরা কৃষক মানুষ, চাষাবাদের লাঙ্গল কোদালের কাজ করে মুজাহিদদের খাদ্য উৎপাদন করি এজন্য আমাদের হাত শক্ত হয়ে যায়।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে ঐ হাতখানায় চুম্বন করলেন এবং বললেন, যে হাত মুজাহিদের খাদ্য উৎপাদনে শক্ত হয়েছে ঐ হাতকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না।' মুজাহিদে আযম চাইতেন সবাই কর্মী হোক। এলেমের খেদমত আল্লাহর ওয়াস্তে করে বাকী সময় যে কোন পেশা অবলম্বন করে রুজীর ব্যবস্থা করবে। কারীগর শ্রেণীর প্রতি তাঁর অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। তাঁর মোল্লাহাট থানার জনাব আব্দুল আজিজ ছাহেব নামক শাগরেদ দ্বারা জিঞ্জিরা থেকে ২২ মাইল দূরে এক জায়গা থেকে একটা ছোট তাত ও কাতা পাকান মেশিন সংগ্রহ করে গওহরডাঙ্গায় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য নিজ হাতে তার উদ্বোধন করেন।

আলেম সমাজের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা

মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম গুণ ছিল উম্মতের ইত্তেহাদ, ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তিনি খুটিনাটি ইখতেলাফের কোনই গুরুত্ব দিতেন না। যারা ইখতেলাফের পিছনে পড়তো তাদেরকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন, অন্যান্য ফরযের চেয়ে উম্মতের ইত্তেহাদকে আমি সবচেয়ে বড় ফরয মনে করি এবং উম্মতের ইখতেলাফকে অন্য গোনাহের চেয়ে বড় গোনাহ মনে করি। এইজন্য তিনি কিয়াম, লা-কিয়াম, দেওবন্দী, বেরেলী, রায়পুরী, শর্ষিনা, ফুরফুরা, তবলীগি, হাটহাজারী, জৈনপুরী, আহলে হাদীছ ইত্যাদির মধ্যে কোন মতভেদকে কোনগুরুত্বই দিতেন না

এবং সবাই আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মত হিসাবে এক মায়ের পেটের সন্তানের মত মনে করতেন। কেউ ইখতেলাফ করতে চাইলে তা মাসয়ালার মধ্যে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন। উম্মতের মধ্যে খুটি নাটি আলোচনা ছড়ানোর একেবারে পক্ষপাতি ছিলেন না। ইখতেলাফ করে যারা হক্কানী সাজতে চাইত তাদের ধমক দিয়ে তিনি বলতেন, তোমরা শুধু মানুষের দোষ খোজ কর, গুণ দেখো না। একবার তিনি মিলাদ কেয়ামের এক বাহাছে কুমিল্লায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে সারা দেশের বড় বড় কেয়াম, লা-কেয়ামের মুরুব্বীগণ উপস্থিত ছিলেন। হাজার হাজার কিতাব জমা করা হয়েছিল। বাহাছ শুরুর প্রথমে তিনি সবাইকে অনুরোধ করে দশ মিনিট সময় নিয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতায় সংক্ষেপে দরদের সঙ্গে বলেন, যে দেশের মানুষকে আমরা ফরয, ওয়াজিব, ঈমান শিক্ষা দিতে পারি নাই সে দেশের জনগণের খেয়ে আমরা নফল, মোস্তাহাব নিয়ে ঝগড়া করি, আমাদের লজ্জা করা উচিৎ। আরও দুই একটি কথা বলার পর উভয় পক্ষের ৮০/৯০ হাজার শ্রোতা লজ্জায় যার যার কিতাব নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করল। বাহাছ শেষ হয়ে গেল। জনগন ছি ছি করতে লাগল এবং বললো হুযুররা অযথা আমাদের ভাই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে এসেছে। এতো কোন ঝগড়ার বিষয় নয়। অপর একটি ঘটনা খুলনার মোল্লারহাট থানার কুলিয়া গ্রামে হয়েছিল। বিরাট মাঠে হাজার হাজার লোক আহলে হাদীছ ও হানাফী মাজহাবের গন্ডগোল। হুযুর প্রথমেই দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখুন মাঠের পার্শ্বে যে বিরাট আমগাছটি দাড়িয়ে আছে তার চারপার্শ্বে যে সু-পক্ক আম ঝুলছে। আমরা সবাই আম খেতে ইচ্ছুক কাজেই যে যে ডালা থেকে ইচ্ছা আম খেতে পারে সব আমই মিষ্টি, ডাল ভাংগা ভাংগির কোন দরকারই পড়ে না, উদ্দেশ্য আম খাওয়া এতে সবাই খুশী হয়ে বিদায় নিল, সব গোলমাল থেমে গেল। অবশ্য তিনি কারও কোন মারাত্মক ভুল হলে বুঝিয়ে বলে দিতেন। ঐরূপভাবে জামাতে ইসলামীকে তিনি ইসলামী হুকুমতের জন্য পছন্দ করতেন। কিন্তু জামাত প্রতিষ্ঠাতার কিছু কিতাবে মারাত্মক কয়েকটি ভুল পরিদৃষ্ট হলে তা সংশোধনের জন্য বলেন এবং ভুল কয়টি যা সংশোধন না হলে মুল উদ্দেশ্য ইসলামী হুকুমত কায়েমই ব্যর্থ হবে। এজন্য তিনি ভুল সংশোধন নামক একটি কিতাব লিখে তাদেরকে জানিয়ে দেন। ভুল ভুলই। এটা নিয়ে ঝগড়া করে কি লাভ? সংশোধন করে নিলেই আমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে ইসলামের খেদমত করতে পারবো। একবারকার ঘটনা চিটাগাং-এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্মেলন আহবান করা হয়। সেখানে হযরত মুজাহিদে আযম উপস্থিত হয়ে দেখলেন সবাই দেওবন্দী আলেম অন্য গায়রে দেওবন্দী কেউ

নেই। তিনি বললেন, তাঁদের কেন দাওয়াত দেওয়া হয়নি? কর্তৃপক্ষ বললো তাদেরকে দাওয়াত দিতে গেলে তারা আমাদের হামলা করতে পারে। হুযুর বললেন, ঠিক আছে আমি নিজে গিয়ে দাওয়াত দিব। সবাই বললো আপনার বিপদের সম্ভাবনা আছে। হুযুর বললেন, আমার বিপদ আমার দায়িত্বে, আপনাদের চিন্তার কারণ নেই। একথা বলে তিনি একাই তাদের কাছে হাজির হয়ে দাওয়াত দিলেন। হুযুরকে দেখে তারা হাউ মাউ করে কেঁদে হুযুরকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিলেন এবং অভিযোগ করে বলল, হুযুর আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের কিছু কথা বলি, এজন্য আমাদেরকে বেদাতী, গোমরাহ বলে গালি দেয়। এজন্য আমরাও তাদেরকে ওহাবী ইত্যাদি বলি। এটা আমরাও বাধ্য হয়ে বলি। হুযুর তাদের মহব্বতের সাথে বুঝালেন, ফলে সবাই এক সংগে সম্মেলনে যোগদান করে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্মেলনকে সাফল্য মন্ডিত করলো। তিনি বলতেন আল্লাহকে, ইসলামকে, আল্লাহর রাসূলকে যদি আমরা ভালবাসি তবে সব মানুষকে, সব সৃষ্টিকে আমাদের ভালবাসতে হবে। অন্যথায় সব বৃথা যাবে খুটিনাটি তাহ্‌কিকের ইখতেলাফ উম্মতের জন্য রহমত হয় কিন্তু এটাকে জহমত বানানো যাবে না। মিল মহব্বতে পরস্পর পরস্পরের ভুল মহব্বতের সাথে সংশোধন করে দিয়ে ভাই ভাই হয়ে যেতে হবে, বিদ্বেষী হওয়া যাবে না। সবাই ভাই ভাই হয়ে আমাদের আসল শত্রু নফস শয়তান এবং তার চেলা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক, মোনাফেক, খৃষ্টান ওরিয়েনটালিষ্ট পার্টি নাস্তিক, মুরতাদ সমস্ত আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে রাসূলের তরীকায় ঝাপিয়ে পড়তে হবে। তাদের ইসলামিক ব্যবহার, চাল-চলন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাম্যনীতি দেখিয়ে ইসলামের দিকে টানতে হবে। এটাই ছিল মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর আসল উদ্দেশ্য। তিনি বলতেন, ভাল যতটুকু করতে পারি বা না পারি কেয়ামতের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলে শামছুল হক তোমার কারণে আমার উম্মতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা না হয়ে মতানৈক্যতা কেন হলো আজ জবাব দাও? রাসূলের সামনে আসামী না হতে হয় এই চিন্তা আমাদের করতে হবে। এজন্য রুজী রোযগার কিছু কম হলেও উম্মতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির কোন কাজ যেন আমাদের দ্বারা না হয়। উম্মতের ঐক্য এবং ইসলামের দুশমনের হেদায়েতের জন্য যদি পীরগীরি, মাওলানা, মুফতীগীরি, হুযুরগীরি, নেতাগীরি ছাড়তে হয়, এতে যদি আল্লাহর রাসূল খুশী হন তবে আর কি চাই? আসল উদ্দেশ্য সাধন হলেই হলো। এতে স্বার্থ সুখ ছাড়া হবে না বরং আরও হাজার গুণ বেশী লাভ হবে। উম্মতের ইত্তেহাদের জন্য হুযুর সর্বদা এ কথাই বলতেন।

তাবলীগী জামায়াতের সহযোগীতা

তাবলীগ জামায়াত, বিশ্ব ইজতেমা, গাশত, চিল্লা, মসজিদ ভিত্তিক পাঁচ কাজ, উমুমী খুছুছী, গাশ্‌ত, মারকাজ হেদায়েত কিছুই যখন এদেশে ছিল না, আল্লাহর হুকুম, রাসূল (সাঃ)-এর নূরানী তরীকায় সব কামিয়াবী একথা আজ ইথারের সংগে মিলে পৃথিবীর প্রতিটি কোনে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এসব কিছুই ছিল না। কাকরাইল রায়বেন্ড, নিজামুদ্দীনের তখন কোন আলোচনায় ছিলনা। সবেমাত্র হযরত মাওলানা ইলিয়াছ ছাহেব যখন মেওয়াত এলাকায় কাজ শুরু করেছেন, তার মক্কী জীবনের মত বেলাল খোবায়েবের দাওর চলছে। নিজামুদ্দীনের কাজ আরম্ভ হয়েছে, কলিকাতার একটি মসজিদে কিছু চারাগাছ লাগান হচ্ছে। সেই মুহূর্তে আমাদের মুজাহিদে আযম আনোয়ারী ফায়েজ, কাছেমী বরকত, গংগুহী তাহকীক, মাদানী জযবা, খলিলী হিম্মত, এমদাদী নূর নিয়ে হায়দ্রাবাদের চীফ জাস্টিস পদ প্রত্যাখ্যান করে থানভী মালাকা নিয়ে দেশে ফিরবেন এসময় হাজির হলেন ইলিয়াছী আনোয়ারের মাজলিস। হযরত মাওলানা ইলিয়াছ ছাহেব স্বাদর আহবান জানিয়ে আদর করে বসিয়ে আপনা আপনি করে আলাপ শুরু করলেন। তখন নাচিজ শামছুল হক বলে উঠলেন, হযরত আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করবেন না, আমার লজ্জা লাগে, আমি লজ্জা পাবো। আমিতো আপনার আদরের জামাতা হযরত মাওলানা জাকারিয়া ছাহেবের আদনা শাগরেদ। এই কথা শুনে হযরত জী হযরত ইলিয়াস (রহঃ) আগে বেড়ে মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে কোলে তুলে নিলেন। আপন বুকের সাথে মিশিয়ে আদরের সংগে বললেন, তোমার বাংলাদেশের তাবলীগের দায়িত্ব নিতে হবে। হুযুর লাব্বায়েক বলে দায়িত্ব গ্রহণ করে দোয়া নিয়ে বিদায় নিলেন। দেশে আসলেন, মাদ্রাসা, মাসজিদ, মক্তব, রাজনীতি, স্বাধীনতা, কুফর, বেদয়াত, শিরক উৎখাত করা এবং এজন্য হাজার হাজার পৃষ্ঠার দ্বীনি কিতাব লেখার সাথে সাথে হযরত জীর কথা অন্তরে কাটার মত বিধতে লাগল। অতি সংক্ষেপে লিখছি অন্যথায় এই কথায়ই বিরাট কিতাব হয়ে যায়। দেশে আসলে খুলনার মোল্লারহাট থানার উদয়পুরের অলিয়ে কামেল হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হালিম ছাহেবের দাওয়াতে উদয়পুর মাদ্রাসা দেখতে গিয়েছেন। যিনি শেষ হজ্জে মক্কা মোয়াজ্জামায় ইন্তেকাল করেছিলেন এবং হুযুর সাথে ছিলেন তিনি হুকুমতের সাথে ফাইট করে পীর ছাহেব হুযুরকে শাহী কবরস্থানে দাফন করেছিলেন। হুযুর ঐ মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন এমন সময় নজর পড়ল এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উপর। উজ্জ্বল চেহারা পশ্চিমা মানুষের মত বিশাল দেহ, নূর টপকাচ্ছে, ম্যালেরিয়ার এলাকা এজন্য পেটটা একটু বড় হয়ে গেছে। ২৫/২৬ বছর বয়স হবে। উদয়পুর মাদ্রাসার উস্তাদ হযরত পীর ছাহেবের জামাতা নাম

হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ, আজকের আমাদের বড় হুযুর দামাত বরকাতুহুম। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তুমি এখানে কি কর? মাওলানা বললেন, হুযুর আমি শিক্ষক, পীর ছাহেবের জামাতা। হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব বললেন, তুমি আমার সাথে চল, শিক্ষকতা থাক। মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব রাজী হয়ে গেলেন এবং বললেন, হুযুর আমার শ্বশুরের নিকট একটু অনুমতি নিতে হবে। মুজাহিদে আযম বললেন, এটা আমার দায়িত্বে। তিনি পীর ছাহেব হুযুরকে বললেন, আপনার জামাতাকে আমি নিয়ে গেলাম। পীর ছাহেব হুযুর বললেন, আল হামদুলিল্লাহ, কোথায় নিবেন, কি করবেন কিছু জানা নেই। হুযুরের সাথে চললেন। এই দুইজনে সোজা কলিকাতার তাবলীগ মারকাজে হাজির হলেন। তিন চিল্লায় নাম লেখালেন এবং চিল্লা শেষ করে নেজামুদ্দীন হাজির হয়ে পরামর্শ করলেন। আবার সেই উদয়পুরে দুইজন ফিরে এলেন। উদয়পুর মাদ্রাসা মসজিদ মারকাজ ঠিক হলো। কাজ শুরু হলো। বাংলার জমিনে দাওয়াতী কাজ। পরামর্শ করে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেবকে আমীর বানিয়ে দিলেন। ২/৩ বছর কাজ চলার পর এক সংগে মাদ্রাসা, তাবলীগের কাজে কিছু অসুবিধা হওয়ায় পরামর্শ করে হযরত ছদর ছাহেব হুযুর মারকাজকে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেবের গ্রামের বাজার মসজিদ তেরখাদা থানার বামন ডাংগায় নেওয়া হলো। এটা হলো বাংলাদেশে দ্বিতীয় মারকাজ। ৪/৫ বছর পুণ্যোদমে কাজ চললো উন্নতি হলো। একবার ইজতেমার সময় মাওলানা শামছুল হক ছাহেব বললেন, বাবা আব্দুল আজিজ গ্রামে মারকাজ হয় না, মারকাজ খুলনায় নেওয়া দরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হলো। হুযুর হেলাতলার মোতাওয়াল্লী ছাহেবের কাছে বলে তালাবওয়ালী মসজিদ বর্তমান দারুল উলূম মাদ্রাসার মসজিদে নেওয়া হলো। কাজ জোরেশোরে আরম্ভ হলো, বরকত হলো। হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব সর্বদা মারকাজে অবস্থান করেন। একবার ইজতেমার পর পরামর্শ হলো, হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব বললেন, বাবা আব্দুল আজিজ, দেহ এক জায়গায় এবং রূহ এক জায়গায় কাজে বরকত হচ্ছে না। এখানে মারকাজ চলুক এলাকার ভিত্তিতে। তুমি ঢাকায় লালবাগ শাহী মসজিদে চলে আস, শাহী মসজিদ বাংলার মারকাজ হবে। তাই হলো কিছুদিন চলার পর ইজতেমার জন্য লালবাগে জায়গা সংকুলন হলো না। হুযুর বললেন, দেখ মসজিদের সাথে মাঠ আছে কোথায়? পরামর্শ করে কেল্লার উত্তর পশ্চিম দিকের খান মুহাম্মদ মসজিদকে মারকাজ করে হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব সেখানে আসলেন। এটা হলো বাংলাদেশের পঞ্চম মারকাজ, লালবাগ চতুর্থ, খুলনা তৃতীয়, বামনডাঙ্গা দ্বিতীয় এবং উদয়পুর প্রথম মারকাজ বাংলাদেশের। কয়েক বছর পরে খান

মোহাম্মদ মসজিদ মাঠেও ইজতেমার জায়গা সংকুলান হলো না। পরামর্শ হলো, হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব সবাইকে বললেন, আপনারা দেখুন ঢাকা শহরে বড় মাঠের পার্শ্বে কোথাও কোন মসজিদ আছে কি না? অনেক অনুসন্ধানের পরে পাওয়া গেল রমনা পার্ক বড় ময়দানের পার্শ্বে ছোট একটি মসজিদ আছে, নাম মাল ওয়ালী মসজিদ। হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব বললেন, ছোট মসজিদ হোক ক্ষতি নেই, পার্কের জায়গা কিছুটা দখল করে আমরা মসজিদ বড় করে নেব ইনশাআল্লাহ। মালওয়ালী মসজিদে মারকাজ কায়েম হলো বাংলাদেশের ছয় নম্বরী দাওয়াতের কাজের ষষ্ঠ মারকাজ হলো। হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব খুশী হলেন। শাগরেদ হযরত মাওলানা আলী আকবার ছাহেব, হযরত জমিরুদ্দীন ছাহেব হযরত আশরাফ আলী ছাহেব, আমাদের হাজী ছাহেব হুযুরের পরিচালনায় এখন আমাদের নওজোয়ান মাওলানা জোবায়ের ছাহেবও আছেন। এখনও সেই হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব হায়াতে আছেন। তার ইমারতে এখনও কাজ চলছে। শেষবারের মত হযরত মাওলানা ইউছুফ ছাহেব যখন আইয়ূবের আমলে ইজতেমায় এলেন এবং টিন দিয়ে পার্ক ঘিরে ইজতেমা হলো। হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব, ছেলে হাফেজ মাওলানা ওমর, জনাব মাওলানা আব্দুল মান্নান ছাহেব হুযুরের মেঝে জামাতা বর্তমান গওহরডাংগার মুহতামিম ও আমি হতভাগা ঐ জামাতে হুযুরের সাথে শরীক ছিলাম। জনাব হাফেজ ওমর ছাহেব তখন খুব ছোট। হযরতজী মাওলানা ইউছুফ (রহঃ) এক সংগে খাবার সময় নিজ বরকতের হাতে রুটি হাফেজ ওমরের মুখে তুলে দিয়ে আদর করে খাওয়াচ্ছিলেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের চেহারা উজ্জ্বল নূরানী মনে হচ্ছিল। কত কথা যে হযরতজী বললেন, তার সীমা নেই। তিনি হযরত ছদর ছাহেব হুযুরকে মুরব্বীর মত সম্মান করতেন। ছদর ছাহেব বললেন, মাওলানা ইউছুফ ছাহেবকে আল্লাহ এ জামানার মুজাদ্দিদ বানিয়েছেন। ঐ সফরে হযরতজী পাকিস্তানের বেলাল পার্কে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে নেজামুদ্দীনে শান্তির নিদ্রায় শায়িত হন এবং হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছদর ছাহেব হুযুর ঐ ইজতেমার পরে অসুস্থ হয়ে দেশের বাড়ীতে গমন করেন। বর্তমানে তিনি গওহরডাংগা মাদ্রাসার হেফজখানার দক্ষিণ পার্শ্বে চির নিদ্রায় শুয়ে শুয়ে কুরআনে পাক শুনছেন।

খাদেমুল ইসলাম জামায়াত প্রতিষ্ঠা

খাদেমুল ইসলাম জামায়াত কি ও কেন?

বিংশ শতাব্দীর সমস্যা সংকুল ভয়াবহ দিশেহারা পরিস্থিতির মাঝে দাড়িয়ে দিক বলয়ের চতুঃ সীমানায় হৃদয়ের গতিধারাকে প্রসারিত করলে এবং ক্রমে ক্রমে

সে ধারাকে জল, স্থল ও শূন্য মন্ডলের প্রান্ত সীমায় বাড়িয়ে দিলে সর্বদা, সবত্র, সর্বপরিস্থিতিতে একটি আকাংখা, একটি চাহিদাই ইথারের সর্বস্তরে ভেসে আসে, শান্তি চাই, বাঁচার শান্তি, মরার শান্তি, বসার শান্তি, থাকার শান্তি, শারিরীক শান্তি, মানসিক শান্তি। কিন্তু শান্তি কোথায়? যে শান্তির আশায় আদি পিতা-মাতা গন্ধম খেলেন, বেহেশতের স্বর্গীয় উদ্যান ছেড়ে মর জগতে হিজরত করলেন, সাড়ে তিনশত বছর কেঁদে কেঁদে হয়রান হলেন, আকাশ-বাতাস কেঁদে কেঁদে ভরে দিলেন। অবশেষে রহমতে আলমের দোহাই দিয়ে শান্তির আবেদন করলেন। মহাপ্রভু খুশী হয়ে ইরশাদ করলেন, "আদম তোমাদের উপর আমি খুশী হয়ে গেলাম, আমার দয়ার সাগর ডিগ্রী ধারার অছিলায় ক্ষমা চেয়েছ, শান্তি চেয়েছ, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। শান্তির অমীয় বাণী আমার হেদায়েত নামা পাঠালাম, নির্দেশনামা প্রেরণ করলাম, যতদিন তুমি এ নির্দেশমত চলবে, এ হেদায়েত মানবে, আমি তোমাকে চির শান্তিতে রাখবো। ইহকালীন শান্তি, পরকালীন শান্তি, চির শান্তির প্রেম নিকেতনে তুমি চিরকাল বিচরণ করতে থাকবে। এপথ থেকে বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুৎ হলে, আপন খেয়াল খুশী ও মস্তিষ্ক প্রসূত বুদ্ধি বিবেককে প্রাধান্য দিলে তুমি পথভ্রষ্ট হয়ে চির অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকবে, তোমার সমাজ, দেশ, জাতি, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা অশান্তির আগুনে পুড়তে থাকবে।"

কেননা আমিই কেবলমাত্র, একমাত্র, শুধুমাত্র একক ও একচ্ছত্র, সর্বক্ষম, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান শান্তিদাতা। আমার নির্দেশ, আমার বিধান, অমান্য করে ইবলীস অহংবোধে ধ্বংস হয়েছে। তার মত, পথ ও চিন্তাধারা যে বা যারা গ্রহণ করবে, তারা নিজেরা ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে জাতিকে ও জগতবাসীকে ধ্বংসের অতল গহবরে তলিয়ে দিবে। এ মহা ধ্বংস থেকে ত্রাণ ও মুক্তির মহা সনদ আমার নির্দেশিত পথ, আমার হুকুম, আমার আহবান।

আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসূলগন (সাঃ) এ মহান আহবানে সাড়া দিয়ে, আল্লাহর দেয়া মহান একমাত্র সত্য, খাঁটি, সঠিক সংক্ষিপ্ত পথকে গ্রহণ করে এবং জগতবাসীর দ্বারা গ্রহণ করিয়ে শান্তির ফল্গুধারা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সেই আখেরী নবী (সাঃ) মহান আল্লাহর দেওয়া পরিপূর্ণ চির শাশ্বত, চির সুন্দর পরশ পাথরতূল্য দ্বীনে হক্বকে জগতের সামনে পেশ করেছিলেন। বর্বর জাহেল মূর্খ, গোয়ার, মাতাল, দূর্ধর্ষ, খুনী, জালেম, ভ্রান্ত দিশেহারা, তেজস্বী বাহাদুর, যিন্দাদিল হিম্মত ওয়ালা আরবদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। আর এমন সময় এমনভাবে, এমন পরিস্থিতিতে পেশ করেছিলেন যে, সে আহবানে

সাড়া দিলে রাজত্ব, প্রভুত্ব, বাসনা, কামণা, লোভ, স্বার্থ, সম্পদ সবই বিসর্জন দিতে হয়।

কিন্তু এমতাবস্থায়ও বেদুঈন আরব ব্যাঘ্রমতি, সিংহ কেশরী, যিন্দাদিল আরব, কল্পনাতীত ত্যাগ তিতীক্ষা এবং কোরবানীর মাধ্যমে সেই মহান শান্তির দাওয়াত কবুল করলেন। নরকের কীট দুষ্টু জীবন থেকে শাহান শাহী জান্নাতুল ফেরদাউসের অমীয় ভান্ডার কবুল করলেন।

কিন্তু কেন? যে বীরের জাতি, বাঘের জাতি, দুনিয়ার কারো সামনে মাথা নত করতে জানে না, মাথা হাসতে হাসতে বিলিয়ে দিতে জানে, রক্তের হোলি খেলে খুশীতে বিভোর হয়ে যায়। কিন্তু কাউকে মানতে, কারো কাছে নত হতে জানে না। সেই মানুষগুলো, বাহাদুরগুলো একটা এতীম, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন হারা সহায় সম্পদহারা, মানুষের কাছে মোমের মত গলে গেল, বরফের মত গলে পানি হয়ে গেল কেন? কিন্তু কেন এর জন্যই আমার কিছু।

আরবেরা দেখেছে, খুব গভীরভাবে দেখেছে, পুংখানুপুংখরূপে দেখেছে; মায়ের কোলে দেখেছে, শিশু অবস্থায় দেখেছে, যুবক অবস্থায় দেখেছে; এই একটি মানুষ, যার কথা ও কাজের মিল আছে। আচার-ব্যবহার ঠিক আছে, ভাল ও মন্দের বিচার আছে, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য আছে। গরীব-দুঃখীদের প্রতি মায়া-মমতা আছে, জালেমের প্রতি বজ্রের ন্যায় কঠোরতা, দয়া-মায়া, লজ্জা-শরম, স্নেহ-সহানুভূতি, শালীনতা, উদারতা, মহানুভবতা, পরমত সহিষ্ণুতা, ভদ্রতা-নম্রতা, গভীরতা, ব্যাপকতার মহান গুণে বিভূষিত হয়ে আছেন। তিনি যা বলেন, তা করে দেখান। তার জীবনের Thcoritical side বা বাহ্যিক দিক এবং Practical side বা বাস্তব দিক একই রকম। কাজেই এ পরশমনির আকর্ষণ কেউই রোধ করতে পারেনি। সবাই হাসিরমুখে, শান্তির সু-শীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অনুগামী হয়ে ধন্য হয়েছে। এ মহামানবের অন্তর্ধানের পর পর খোলাফায়ে রাশেদীন তারই পথে এককভাবে, আল্লাহর বিধানের সর্ব শাখার সুষ্ঠু খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে চিরশান্তি নিকেতনে রওয়ানা হয়ে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগে ইসলামের সর্ব শাখার কাজ এককভাবে একই হাতে সম্পাদিত হয়নি, অবস্থার পরিবর্তনে, পরিস্থিতির চাপে, ইসলামের সার্বিক কাজ বিভিন্ন শ্রেণীর মহান মনীষীবৃন্দ ভাগ করে নিয়ে জীবনের বিনিময়ে হলেও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন।

খোলাফায়ে রাশেদার মত যোগ্য ব্যক্তিত্বের অভাবে এককভাবে না হলেও বিভিন্ন কেন্দ্রে যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীগণের দ্বারা ইসলামের শিক্ষা, ইসলামের প্রচার, ইসলামের আমল অটুটভাবে, নিখুঁতভাবে পরবর্তীদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রান্তবর্তী সীমায় দাড়িয়ে আমরাও আজ অবিকৃত ও নিখুঁতভাবে ইসলামের সে মহান রূপ অবলোকন করছি। তাও সেই ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টার ফল, কোরবানীর নতীজা। আমরা সবাই সেই ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ এককভাবে পেয়ে ধন্য হতে চাই। কিন্তু এখন সমস্যা হলো এই যে, প্রত্যেকেই আমরা ইসলামের সার্বিক ও একক খেদমতের রূপ একই জায়গায়, একই ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে দেখতে চাই, তার ফল ভোগ করে ধন্য হতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মহান দৌলত বিভিন্ন শাখায় প্রতিপালিত ও বর্ধিত হয়ে আসছে এককভাবে কোথাও নেই। অথচ আমাদের কাম্য সার্বিক একক ইসলাম।

আমরা যে যতই দাবী করি না কেন ইসলামের সর্ব শাখার সমাবেশ, সর্বকাজের আঞ্জাম এককভাবে কোন দল বা গোষ্ঠীই সমাধা করতে পারছেন না। কেউ শিক্ষার সুষ্ঠু আঞ্জাম দিচ্ছেন তো প্রচারের কাজে তিনি মোটেই সক্ষম নন। আবার কেউ প্রচারের কাজে বহুদুর অগ্রসর হয়ে কাজ করছেন কিন্তু শিক্ষার আ্যমে তিনি একেবারেই পশ্চাৎপদ। কেউ হয়তো নিজে শিক্ষা দীক্ষা করে আধ্যাত্মিক দিকটার খেদমত সুন্দরভাবে করছেন। কিন্তু শিক্ষা প্রচার ইত্যাদি দিকগুলো তিনি সমাধা করতে পারছেন না। আবার আমাদের কোন কোন ভাই জেহাদ সংগ্রামে লিপ্ত আছেন; কিন্তু শিক্ষা প্রচার, আধ্যাত্মিকতার কেশাগ্রও তিনি স্পর্শ করতে সক্ষম হচ্ছেন না। মোটকথা, আমাদের চরম মুক্তি নাজাত এবং কল্যাণের জন্য প্রয়োজন সার্বিক ইসলামের খেদমত একই হাতে সমাধা হওয়া অথচ বাস্তবে দেখছি তা বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা যার যার প্লাট ফরমে থেকে পরস্পরকে ধিক্কার দিয়ে নিজেরটাকে একক মনে করে বা মনে মনে এককের পরিকল্পনা এটে পারস্পারিক ঝগড়ায় লিপ্ত হলে ইসলামের, মুসলমানদের, দেশের ও জাতির কোন উন্নতিতো হবেই না বরং যতটুকু এতকাল অব্যাহত ছিল তাও সমূলে ধ্বংস হয়ে মাঠে মারা যাবে।

কাজেই আমাদের জন্য উচিৎ হবে, কর্তব্য হবে, সর্বপ্রকার আমিত্ব এবং অহমিকা পরিহার করে পরিপূর্ণ ইখলাছের সঙ্গে এক আল্লাহর উপর ভরসা করে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ ভুলে গিয়ে দ্বীন ঈমান ও ইসলামের মহব্বতে যিনি বা যে দল যেখানে যতটুকু কাজ করছেন, অম্লান বদনে তা স্বীকার করে নিয়ে ঐ সমস্ত কাজকে আরো গতিশীল করে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার নিমিত্তে ক্রমে ক্রমে সমস্ত

কাজকে একই সূত্রে গ্রোথিত করে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপের বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্ব শান্তি স্থাপনে প্রাণ উৎসর্গ করা।

আর এজন্য প্রয়োজন, এমন একদল জীবন উৎসর্গকৃত যোগ্য বীর বাহাদুরের, যারা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সাথে সাথে সমস্ত নেতৃত্ব কর্তৃত্বের মোহের উর্ধ্বে থেকে খাদেম হিসাবে, সেবক হিসাবে সমস্ত মুসলিম জাতিকে একই প্লাট ফরমে আনার চেষ্টায় অবিরাম জীবনপাত করে যাবেন। একটি জাতির পতন ঘটাতে, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে বেশী মানুষের প্রয়োজন হয় না। যোগ্যতা না থাকলেও চলে কিন্তু একটি অধঃপতিত জাতিকে জাগাতে হলে, জগতের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে, লক্ষ লক্ষ যোগ্য ধী-শক্তি সম্পন্ন উৎসর্গকৃত প্রাণের আজীবন সাধনার প্রয়োজন।

এমন একজন উৎসর্গকৃত প্রাণ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব প্রেমিক অলিয়ে কামেল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উজ্জলতম সূর্য, আলেমে হক্কানী, মর্দে মু'মিন, মুজাহিদে আযম আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছাহেব জীবনের শেষ আরামটুকু বিসর্জন দিয়ে অসাধারণ ত্যাগ ও কোরবানীর মাধ্যমে বৈষয়িক, জাগতিক, ইহলৌকিক, পরলৌকিক, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সর্ব শাখায় অসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করে ইসলামের জ্ঞান, শিক্ষা প্রচারের ও আমলের জন্য হাজার হাজার মাদ্রাসা, মসজিদ, আঞ্জুমান, খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পর রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা সংস্কার নীতির বিভিন্ন শাখায় খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পরে জীবনব্যাপী গঠনমূলক প্রায় দুই শতাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং পবিত্র কালামে পাকের বিশদ ব্যাখ্যা নিজ হাতে লেখা সাড়ে ষোল হাজার পৃষ্ঠায় মহান হক্কানী তাফসীর লিখে যান। এই সমস্ত পথ নির্দেশক পুস্তকাবলীর সাহায্যে মুসলিম জাতিকে সঠিক পথে আনার জন্য হুকুম করে ডান্ডা মেরে নয়, যুক্তি, তর্ক, হেকমত, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সর্বোপরি খেদমতের মাধ্যমে আলো দানের জন্য ১৯৪০ সালে একটি জামায়াত প্রতিষ্ঠা করেন। তার নিজের দেওয়া সে জামায়াতের মধুমাখা নামটি খাদেমুল ইসলাম জামায়াত। এটা কোন সংকীর্ণ দল বা গোষ্ঠীর নাম নয়। এটা হবে বিশ্ব মুসলিম একদল, এক জামায়াত, এক স্বার্থ এই কথাটা বুঝানোর জন্য জানানের জন্য সর্বগুণে গুণান্বিত, জাতি, দেশ ও ইসলামের জন্য উৎসর্গকৃত একদল জানবাজ আল্লাহর রাসূলের আশেকের দল। যারা সমস্ত দলাদলি ফেরকাবন্দীর উর্ধ্বে থেকে সমস্ত রকম মুশরিকানা পন্থা ত্যাগ করে এবং জন সর্বনাশে ও দফায় দফায় দফা শেষ করা রাজনৈতিক কোন্দলের উর্ধ্বে থেকে খেলাফত নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে কাজ করে যাবে। তাদের মুখে থাকবে

বিশ্ব মুসলিম এক এবং নেক হও। বিশ্ব প্রভুর আরাধনা কায়েম কর। বিশ্ব জগতের কল্যাণ কামনা কর। মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো, আমানতদার হও, ধৈর্যশীল, কর্মঠ হও, কথা এবং কাজ এক কর। শুধু মানুষ কেন সর্ব জীবের খেদমত করে, খাদেম হয়ে আমিত্বকে বিলীন করে দাও। তাহলেই রাসূলের এ মহান বাণীর স্বার্থকতা ফুটে উঠবে। ফলে-ফুলে, গন্ধে, স্বাদে বিমোহিত হয়ে রাসূলের অমর বাণী ভাস্বর হয়ে উঠবে, সত্যতায় পরিণত হবে।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব (রহঃ) আপন জীবনকে ছোটকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের জন্য, আল্লাহর রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। কুরআন গলায় বেঁধে ছাত্র জীবন শুরু করেন। মৃত্যুর পরও কুরআনের মহব্বতে, কুরআন শোনার আকাংখায় কুরআনী হেফজখানার পার্শ্বেই শেষ শয্যায় শয়ন করেছেন। বাংলা, ইংরেজী, কোরআন, হাদীছ, হেকমত, বালাগাত, উছুল, তাফছীর পড়েছেন, মারেফতের দরিয়া মুজাহিদে জামানের দরবারে হাবুডুবু খেয়েছেন। রাজনীতি করেছেন, সমাজনীতি করেছেন, জেহাদ করে বাতিলের মোকাবেলা করেছেন দাওয়াত ও তাবলীগ করেছেন। সর্ব কাজের একটাই উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকায় জগতকে গড়ে তোলা আর এর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশী করা, রেজায়ে মাওলা। আর এজন্য প্রয়োজন মজবুত জামায়েতী যিন্দেগীর। যার মাধ্যমে রাসূলের মদীনার নকশায় সমাজ, রাষ্ট্র গঠন, জগতের শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি অর্জন করা। তাঁর আকাংখা সারাজীবন ইসলামের খাদেম হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত পৌছে যাওয়া। এজন্য তিনি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে গঠন করেছিলেন খাদেমুল ইসলাম জামায়াত। মাদ্রাসার নাম খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা, পোষ্ট অফিসের নাম খাদেমুল ইসলাম। দুই শতাধিক কিতাব লিখেছেন এবং সাড়ে ষোল হাজার পৃষ্ঠায় তাফসীর লিখেছেন খাদেমদেরকে গড়ে তোলা জন্য, খাদেমুল ইসলাম জামায়াত পরিচালনার জন্য। সবকিছুই উৎসর্গ করেছেন কওম ও মিল্লাতর খেদমতের জন্য। সন্তানদের হাত ধরে অছিয়ত করেছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে। এইসব কিতাবপত্র থেকে আমি একটা পয়সাও গ্রহণ করি নাই তোমরাও করবে না। এসব খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের, সমগ্র জাতির।

এ জামায়াতের তিনি চল্লিশটি শাখা কায়েম করেছেন কর্মক্ষেত্র হিসাবে সমস্ত মানুষকে শরীক করার জন্য। শাখাগুলো যেমন- খাদেমুল ইসলাম সাধারণ পরিষদ, ছাত্র পরিষদ, কৃষক পরিষদ, শ্রমিক পরিষদ, ব্যবসায়ী পরিষদ, আইনজীবী পরিষদ ইত্যাদি। চল্লিশটি পরিষদে সমস্ত মানুষের আল্লাহর রাসূলের

তরীকায় মদীনার নকশায় যিন্দেগী গঠন করা। কাজ মদীনার মসজিদের নকশায় কমপক্ষে মৌলিক দশ দফায় সমাজ গঠন ও কমপক্ষে মৌলিক দশ দফায় ব্যক্তি চরিত্র গঠন করা। জামায়াতের সর্বোচ্চ কর্মীর ডিগ্রী খাদেম। সংগঠনের রূপরেখা, মসজিদ সংগঠন, গ্রাম সংগঠন, ইউনিয়ন সংগঠন, থানা সংগঠন, জেলা সংগঠন, বিভাগ সংগঠন, প্রদেশ-দেশ ও আলমী সংগঠন। কর্মীদের শ্রেণীও পাঁচটি। সূরা অন্নাজিয়ার পাঁচ স্তর, ইসলামের পাঁচ বেনা, স্তরের নাম, মুতায়াল্লেক; মু'য়তামেদ, মুজাহিদ, মুবাল্লিগ, খাদেম। সিলেবাস- দুইশত কিতাব ও অন্যান্য বুযুর্গদের কিতাবাদি। উদ্দেশ্য দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি। কাজ- স্রষ্টার ইবাদত, সৃষ্টির খেদমত। অভিযান গায়ের ইসলামী সমাজ বিলুপ্ত করে ইসলামী সমাজ গঠন। পাশ্চাত্যের গোলামী খতম করে ইসলাম, খেদমতমূলক দেশ কায়েম। ব্যবহার নম্র, আচরণ ইকরাম, মুখে দাওয়াত, অন্তরে যিকির, বাহুতে জিহাদ, ব্যবহারে ক্ষমা, শ্লোগান আল্লাহু আকবার, বাতেলের মোকাবিলায় বজ্রের ন্যায় কঠোর, মুমিনের কাছে কুসুমের মত কোমল, চলার পথে আনুগত্য। গুণ অর্জনে নম্রতা-ভদ্রতা, শালীনতা, সহনশীলতা, মহানুভতা, ত্যাগ কোরবানী পরমত সহিষ্ণুতা, চিন্তায়, গভীরতা, খেদমতে বিলীনতা ইত্যাদি। এ জামায়াত মুসলমানদের জামায়াত। সারা পৃথিবীর ১৩০ কোটি মুসলমানের একটি জামায়াত। মদিনার নকশার নামাযের তরীকার জামায়াত (১) ইমাম (২) মুয়াজ্জিন (৩) মোতাওয়াল্লী (৪) মুসল্লিদের দল, মুসলমানদের দল। মাবূদ এক আল্লাহ, পথ প্রদর্শক ওলামায়ে হক্কানী, বিধান কুরআন-হাদীছের। খাদেমুল ইসলামের দশ দফা সমাজ বিপ্লবী কর্ম- (১) মসজিদ কেন্দ্রিক চার তরীকায় জামাত গঠন (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম; (৩) কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা, (৪) বয়স্ক মক্তব প্রতিষ্ঠা, (৫) শিক্ষিতদের জন্য দ্বীনি দারুল মোতায়ালা, (৬) কুরআন ফান্ড প্রতিষ্ঠা, (৭) ন্যায় বিচারালয় গঠন (৮) দাওয়াত, তেলাওয়াত, নামায, যিকিরের মজলিস প্রতিষ্ঠা, (৯) খেদমতে খালক, (১০) জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। মদীনার ব্যক্তিগত নূরাণী দশ দফা- (১) ঈমান-ইয়াকীন দৃঢ় করা, (২) আমালে ছালেহ, (৩) স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ের ঈমান আমল ঠিক করা। (৪) স্ত্রী ও মেয়েদের জন্য খাস পর্দা করা, (৫) প্রতিটি কাজ সুন্নত অনুযায়ী করা, (৬) মিষ্টি-মধুর ব্যবহার, (৭) পাড়া প্রতিবেশী সকলের খেদমত, (৮) ঘরে কুরআন ফান্ড প্রতিষ্ঠা, (৯) সপ্তাহে মসজিদের কাজ (১০) সর্বদা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য প্রস্তুত থাকা।

মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপনে আল্লামা ফরিদপুরী (রহঃ)

মসজিদ, মাদ্রাসা মক্তব স্থাপনে মাওলানার নজীর দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া খুবই মুস্কিল। তিনি জীবনে যেখানেই কিছু সময়ের জন্য গমন করেছেন সেই স্থানেই একটি মাদ্রাসা, মসজিদ বা কুরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে কিছুই করেননি সেখানে কমপক্ষে মসজিদ কেন্দ্রিক ইমাম, মোয়াজ্জিন ছাহেবের মাধ্যমে কুরআনের তালীমের ব্যবস্থা করে এসেছেন, শিক্ষিত কোন মুসল্লি বা শাগরেদের মাধ্যমে দ্বীনি কিতাব পড়ে শুনানোর ব্যবস্থা করেছেন। বড় বড় মাদ্রাসা যেমন- আশরাফুল উলূম মাদ্রাসা, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া, জামেয়া এমদাদিয়া ফরিদাবাদ, আজিজিয়া শামছুল উলুম চন্দ্রদিঘলিয়া, গোপালগঞ্জ, জামেয়া মোহাম্মদিয়া ছাড়াও কয়েক হাজার মাদ্রাসাও মসজিদ তিনি স্থাপন করেন। শামছুল উলূম নামে সারাদেশে আড়াই শতাধিক মাদ্রাসা মক্তব রয়েছে। এটা ছাড়া সারাদেশে শামছুল উলূম খাদেমুল ইসলাম নামেও অনেকগুলো মাদ্রাসা রয়েছে।

বায়তুল মোকারম মসজিদ স্থাপন

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম যে জায়গায় অবস্থিত উক্ত জায়গাটি পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন ব্যবসায়ীর মালিকানায় ছিল। তারা সেখানে একটি সর্বাধুনিক মার্কেট নির্মাণের চিন্তা ভাবনায় ছিলেন। হঠাৎ সরকার ঐ জায়গা একোয়ার নোটিশ জারী করেন। কোটি কোটি টাকার বিশাল জায়গা হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ব্যবসায়ীরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে নানা তদবীরে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে দোয়ার জন্য হুযুরের দারস্থ হলেন। হুযুর তাদেরকে অনেক শক্ত কথা শুনিয়ে দেন এবং বলেন, তোমরা কত শত মিল কল-কারখানা বার্মা ও অন্যান্য দেশে করেছিলে, সব ফেলে এসেছ, এদেশেও যা কিছু বড় বড় কল-কারখানা করেছ অল্পদিনের মধ্যে তাও ফেলে পালাতে হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর জন্য, দ্বীনের জন্য কিছুই কর নাই। এজন্য এদেশের মাতুব্বরীও ছেড়ে তোমাদের পালাতে হবে। এখন আমার কাছে কেন এসেছ? ব্যবসায়ীগণ কাকুতি-মিনতি করে পরামর্শ চাইলে হুযুর বললেন, আমি তোমাদের পরামর্শ দিতে পারি, যদি শোন তবে তোমাদের জমিতো নষ্ট হবেই না অধিকন্তু কেয়ামত পর্যন্ত লাভবান হতে পারবে। তারা সবাই হুযুরের কথা মান্য করার অঙ্গীকার করলে হুযুর বললেন, "তোমরা উক্ত জায়গায় বিরাট আকারের এমন একটি মসজিদ তৈরী কর, যা স্মরণীয় মসজিদে পরিণত হয় এবং উক্ত জায়গার বাকী সমস্ত অংশে আদর্শ মার্কেট তৈরী কর, যার সমুদয় উপার্জনে মসজিদের সমস্ত খরচাদি চলবে। তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত তোমরা লাভবান হতে পারবে। ব্যবসায়ীরা বলল, হুযুর ঐ জায়গার

কাছে যাওয়া বেআইনী, কিভাবে মসজিদ করবো। হযরত মুজাহিদে আযম বললেন, সরকারের নিকট খবর হওয়ার আগেই তোমরা রাতারাতি ঐ জাগয়া টিন দিয়ে ঘেরাও করে কিছু সিমেন্ট বালি দিয়ে একটা ভিত্তি স্থাপন করে মসজিদের একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দাও। এরপর দায়িত্ব আমার, সাইনবোর্ড লাগানোর পরে সরকার যদি ভাঙ্গতে আসে সেটা আমি ঠেকাবো ইনশাআল্লাহ্। তোমাদের দায়িত্ব শুধু ভিত্তি করে মসজিদের সাইনবোর্ড টাঙ্গানো, বাকী সব দায়িত্ব আমার, দেখবো সরকার কিভাবে মসজিদে হস্তক্ষেপ করে। ব্যবসায়ীগণ হুযুরের কথামত ঘেরাও দিয়ে রাতের মধ্যে মসজিদের ভিত্তি করে সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিল। সরকারী দায়িত্বশীল দফতর অবস্থা জেনে খবরাখবর নিয়ে জানতে পারলো মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের পরামর্শে মসজিদের ভিত্তি করা হয়েছে। কাজেই উঁচু মহলে অনেক কানাঘুষি হলো কিন্তু হুযুরের ভয়ে কেউ মসজিদে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করলো না। ব্যবসায়ীরা হুযুরের নির্দেশানুযায়ী প্রশংসনীয় এ কাজটি করেছিল। যা আজ আমাদের গর্বের বিষয়।

লালবাগ সিনেমা হল শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত

বর্তমানে শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ কেন্দ্রটি যে স্থানে অবস্থিত তার নিকটে লালবাগ মাদ্রাসার ছাত্রাবাস অবস্থিত। ছাত্রাবাসের পার্শ্বে উক্ত জায়গাটি ডোম মেথরদের ময়লার গাড়ী রাখার এবং ময়লা আবর্জনায় ভর্তি দুর্গন্ধময় জায়গা ছিল। ছাত্র এবং জনসাধারণের দুর্গন্ধে খুব কষ্ট হতো। মোনায়েম খান ছাহেব তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। তারই উদ্যোগে কিছু লোকের পরামর্শে সিনেমা হলটির নির্মাণ কাজ চলছিল। মহল্লার মধ্যে সিনেমা হল নির্মাণ হলে ছেলে-মেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে, এই ভয়ে মহল্লার গন্যমান্য মুরব্বীগণ নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য হুযুরের নিকট অনুরোধ করলেন। হুযুর সব শুনলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। এরপর হলের অর্ধেক নির্মাণ কাজ অর্ধেক হওয়ার পরও মুরব্বীগণ হুযুরকে বললেন, হুযুর কিছুই বললেন না। হল সম্পূর্ণ নির্মাণের পর উদ্বোধনের ঘোষণা হলে হুযুর মহল্লা বাসীদের ডেকে বললেন- আমি জীবিত থাকতে লালবাগে মোনায়েম খাঁন ছাহেব আমার বুকের উপর সিনেমা হল উদ্বোধন করলে একদিনের মধ্যে তার এক একটি ইট খুলে বুড়িগঙ্গায় নিক্ষেপ করা হবে। এ খবর গভর্ণর মোনায়েম ছাহেবের কাছে গেলে বুদ্ধিমান খাঁন ছাহেব ঠিক ঐ তারিখে লালবাগ এসে সিনেমা হলকে শায়েস্তা খাঁন কল্যাণ কেন্দ্র নাম দিয়ে জনগণের ব্যবহারের জন্য উদ্বোধন করে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করে গেলেন। মুরব্বীগণ খুশী হয়ে হুযুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর আগে কথা বলেননি কেন? হুযুর মুচকি হেঁসে বললেন, আগে বললে কাজ বন্ধ হয়ে জায়গাটি ময়লাযুক্ত থেকে যেত।

খুলনা হেলাতলা মোড়ের নাট্যশালা জামে মসজিদে রূপান্তরিত

হযরত ছদর ছাহেব হুযুর যখন খুলনায় তাশরীফ আনতেন তখন প্রায়ই বলতেন- লঞ্চ, ষ্টীমার থেকে খুলনায় অবতরণ করে নিকটে নামায পড়ার জন্য একটা মসজিদ হলে কতই না সুন্দর হতো। নিকটে কোন জায়গা আছে কি? কয়েকজনে বললো, হুযুর জায়গা তো নেই তবে দোলখোলার মোতাওয়াল্লী ছাহেবের একটি দোতলা বিল্ডিং আছে যার নীচের তলায় মোতাওয়াল্লী ছাহেবের গোডাউন এবং দোতলায় ছেলে নাটক ইত্যাদি করে থাকে। হুযুর মোতাওয়াল্লী ছাহেবকে ডাকালেন এবং মসজিদের কথা বললেন। মোতাওয়াল্লী ছাহেক হুযুরের অনুরোধে বিল্ডিংটি মসজিদের জন্য ছেড়ে দিলেন। যা অল্পদিনের মধ্যে একটি বিরাট জামে মসজিদে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এই মসজিদটি এখন খুলনার অন্যতম নামকরা মসজিদ। আল্লাহপাক জনাব মরহুম মোতাওয়াল্লী ছাহেব এবং হযরত ছদর ছাহেব (রহঃ)কে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন।।

আধ্যাত্মিকতায় মুজাহিদে আযম ফরিদপুরী (রহঃ)

আল্লামা হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে বিচরণ করেছেন। আধ্যাত্মিকতায় তিনি ছিলেন ছলফে ছালেহীনদের নমুনা, হযরতে ছাহাবায়ে কেরামের ঘ্রাণ পাওয়া যেত তাঁর থেকে। তাছাওওফ বা আধ্যাত্মিকতা তিনি পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং ছাত্র জামানায় তিনি মুজাদ্দিদে জামান, হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা থানভী (রহঃ) থেকে শিখেছেন। ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে সাহারানপুর ভর্তি হওয়ার পূর্বে থানভী (রহঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে প্রথম সাক্ষাতের প্রথম কথায়ই বায়য়াত হয়ে যান। সেই ছাত্র জীবনের প্রথম থেকে হযরত থানভীর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত থানভী (রহঃ)-এর দরবারে থেকে আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। ছাত্র বয়সে ৩১২ বার পায়ে হেঁটে থানভীর দরবারে গমন করেছেন। প্রথম চার বছর তিনি পায় হেটে সাত হাজার দুইশত আশি মাইল গমন করেছেন এবং শেষের দুই বছরে এক হাজার আটশত বাহাত্তর মাইল পায়ে হেঁটে আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। তাঁর জীবনের বাইশটি চিল্লা (রমজানসহ) থানভীর দরবারে আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) বলতেন, আমার শরীরে এমন কোন লোম কূপও বাকী নেই যেখানে হযরত থানভী ইনজেকশন ও অপারেশন করেননি। হযরত থানভী (রহঃ) হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে নিজের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত মনে করে বলতেন, তুমি আমার অন্তরের সমস্ত কথা সারাদেশে প্রচার করো।" কি দরজার

আধ্যাত্মিকতার মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হযরত মুফতীয়ে আযম মোঃ শফী ছাহেব ও হাকীমুল ইসলাম আল্লামা ক্বারী তৈয়্যেব ছাহেবকে থানভী (রহঃ) বলেছিলেন যে, ঐ সূর্যকে আমার কাছে আসতে দাও, তা না হলে আমার দরবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। হযরত থানভী (রহঃ) ব্যতীত সমকালীন পৃথিবীর প্রায় সব বুযুর্গ থেকে তিনি আধ্যাত্মিকতার প্রশিক্ষণ হাছিল করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী সমস্ত থানভী খোলাফা থেকে, হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী, হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ বুযুর্গদের তিনি ছুহবত উঠিয়েছেন।

দ্বীনের জন্য কুরবানী ও ত্যাগের ময়দানে

ত্যাগ এবং কুরবানীর ময়দানে তার স্থান এত উর্ধ্বে ছিল যে, কোন এক মুহাক্কেক বুযুর্গ বলেন যে, মাওলানা শামছুল হকের তুলনা শুধু তাঁর সাথেই চলে। তাঁর কুরবানী ও নিঃস্বার্থতা, যুহদ ও তাকওয়া পূর্ববর্তী কয়েক যুগের মধ্যেও খুজে পাওয়া মুশকিল। একবার জৈনপুরের পীর ছাহেব হযরত মাওলানা আব্দুল আউয়াল ছাহেব লক্ষাধিক জনতার সম্মুখে ওয়াজ করার সময় বলেন, তোমরা বেহেশতের ফেরেশতা দেখবা? সবাই বলল, হা, দেখবো। সেই মজলিসে হযরত মুজাহিদে আযম ছাহেবও উপস্থিত ছিলেন এবং মঞ্চের পিছনে বসেছিলেন। তিনিও জানেন না পীর ছাহেব কার কথা বলছেন। হঠাৎ পীর ছাহেব মুজাহিদে আযমকে কোলে তুলে জনগণের সামনে বললেন, এই দেখ বেহেশতের বরং তার চেয়েও উর্ধ্বের। কুরবানীর কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেললাম। দুনিয়ার কোন স্বার্থ লোভ মোহ তাকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। ফরিদাবাদে সাড়ে পাঁচ বিঘা জায়গা হাসতে হাসতে মাদ্রাসায় দিয়ে দিলেন অথচ মাদ্রাসার একটি সদস্যপদও নিজের জন্য রাখলেন না। তার কাশ্মীরী দুই শাগরেদ বাড়ীতে পাচালী ও বিল্ডিং করার প্রস্তাব দিলে তিনি হাসিমুখে গ্রামের অভাবী লোকের কথা উল্লেখ করে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তার ঢাকার প্রিয় শাগরেদ আলহাজ্জ শাকের মোহাম্মদ বলেন, আমরা ৫/৭ জন হুযুরের বাড়ীতে বিল্ডিং করার প্রস্তাব দিলে তিনি হাসিমুখে তা প্রত্যাখ্যান করে আখেরাতের বাড়ী দেখিয়ে দেন। লক্ষ লক্ষ টাকার হাদিয়া, বাড়ী গাড়ীকে তিনি বিপদজনক বিষধর সর্পের মত মনে করে দূরে থেকেছেন। এ ফিরিস্তি সীমাহীন বর্ণনার উর্ধ্বে। কাজেই সে দাস্তান বাড়িয়ে শুধু আমাদের লোভকেই তাজা করা হয়। লালবাগ মাদ্রাসায় বিরাট আলীশান বিল্ডিং আলীশান দফতরে হুযুর থাকতেন, পেশাব পায়খানার পার্শ্বে একটি অন্ধকার ছোট কামরায়। দ্বীনের কাজ ব্যতীত ফ্যান, বাতি জ্বালাতেন না। খানার খরচ ব্যতীত বাকী বেতন ফেরৎ দিতেন। মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ের বেতন নিতেন না।

মানব প্রেমে হযরত ফরিদপুরী

হযরত মাওলানা মানুষকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। নিজে না খেয়ে অপরকে খাওয়াতেন, পীর, হাদিয়ার জন্য পাগল থাকে কিন্তু হুযুর শাগরেদদের দাওয়াত করে খাওয়াতে পারলে খুশী হতেন, আপত্তি করলে অসন্তুষ্ট হতেন। মৃত্যুর পূর্বে সকাল বেলা চিনি মিশ্রিত কিছু ছানা খেতেন। কিন্তু আমার মত না-লায়েক শাগরেদ দৈনিক সকালে লিখতে হাজির হলে তিনি উক্ত ছানা অর্ধেকের বেশী আমার জন্য রেখে দিতেন এবং জোর করে খাওয়াতেন। বলতেন, তোমার ঘড়ি নেই নিজের কথা বলে করাচী থেকে ঘড়ি আনিয়ে আমাকে দিয়েছেন। একটু সর্দিভাব দেখে নিজের মাফলারটি খুশীর সাথে আমাকে দিয়েছেন। যা বিদেশ থেকে হুযুরকে কেউ হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। একদিন জমিতে কাজ করে তিনদিনের মজুরী নিয়েছে। হুযুর জেনে শুনে একেবারে হাসিমুখে দিয়েছেন। মানুষের মুখ মলিন দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কাউকেও ইছলাহের জন্য রাগ করলে অন্য সময় তাকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন। নিজের গাভীর জন্য নিজের হাতে খড়-ঘাস আদর করে মুখে দিয়েছেন। ঝড়-বন্যায় আক্রান্ত মানুষকে নিজ সন্তানের চেয়েও বেশী স্নেহ করতেন। কেউ কোথাও থেকে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। কত মানুষ, কত হাজার হাজার ছাত্রদের তিনি জামা-কাপড় ও নাস্তার ব্যবস্থা করেছেন। নিজে অসুস্থ অথচ গরীব ছাত্রের জন্য দুধ যোগান করে দিয়েছেন। "খেদমতে খালক" কিতাব লিখে হুযুর খেদমতের আলোচনা, ছাহাবায়ে কেরামের খেদমতের আলোচনা করতেন এবং বলতেন, 'খেদমতে খোদা মিলে'।

হযরত মুজাহিদে আযমের তাকওয়া ও পরহেজগারী

হুযুরের জীবনের যে দিকই উন্মোচণ করা হয় কানায় কানায় তা পরিপূর্ণতায় ভরপুর পাওয়া যায়। ওয়াজ-নছীহত করে মাদ্রাসায় চাঁদা দিয়ে আসতেন। কোথাও রাস্তা ভাড়া ছাড়া বেশী গ্রহণ করলেও অন্যভাবে তা পরিশোধ করে দিতেন। আহারের ব্যাপারে এত সহজ ও সাধারণ পন্থা অবলম্বন করতেন যে কেউ ভাল খাওয়াতে চাইলেও পারতেন না। বাজারের সবচেয়ে সস্তা মাছ যা মানুষে ফেলে দেয় সেই মাছ এবং কদুর তরকারী তিনি খেতে চাইতেন, মাছ গোশ্‌ত, মুরগী তিনি প্রায়ই খেতেন না। কেউ আড়ম্বরপূর্ণ খানার ব্যবস্থা করলে তিনি শুধু ভর্তা দিয়ে খানা খেতেন। একবার ঢাকায় আসার পথে ষ্টীমারে ভ্রমণের সময় অযুর লোটাটি মাদ্রাসার মাঠে ফেলে রাখা এক হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়ায় তিনি খোজ নিয়ে তার দাম দিয়েছেন। চাল পানি খাওয়ার জন্য বোর্ডিং থেকে ১০/১৫ টি চাউল ৫/৬ দিন খেয়েছেন। ঢাকা রওয়ানা হওয়ার সময় বোর্ডিং ম্যানেজারকে

ডেকে তার দাম দুই টাকা পরিশোধ করেছেন। আসলে তার দাম দুই পয়সাও ছিল না। একবার সভার সময় মাঠ পরিষ্কার করে পুরাতন কদু গাছ ইত্যাদি শেষ হয়ে প্রায় মরে গেছে বাহিরে গর্তের ভিতর ছাত্ররা ফেলে দিয়েছে। হুযুরের এক আদরের ভক্ত গওহরডাঙ্গার ক্যাশিয়ার ছাহেব জনাব মাষ্টার ওমর ছাহেব ঐ কদুগাছগুলোর তাজা পাতাগুলো কেটে কেটে একত্রিত করে গামচায় বেঁধে হুযুরের গাভীটার জন্য মাথায় করে নিয়ে গেলে হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাথায় কি? মাষ্টার ছাহেব বললেন, হুযুর মরা কদু গাছের কিছু পাতা তাজা ছিল যা ড্রেনে ফেলে দিয়েছিল। আমি কেটে কেটে হুযুরের গাভীর জন্য এনেছি, যদি খায়। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, কত দাম? মাষ্টার ছাহেব আশ্চার্য হয়ে বললেন, হুযুর এরতো কোন দাম নেই- দামে বিক্রি হয় না, ফেলে দিয়েছে, আমি কুড়িয়ে এনেছি। হুযুর বললেন, মিয়া ফেলে দিয়েছে তো মাদ্রাসার গাছ মাদ্রাসার গর্তে ফেলেছে, তা পচলেও মাদ্রাসার একটু মাটি বাড়বে। আমি শামছুল হকের কি অধিকার আছে মাদ্রাসার জিনিস স্পর্শ করার? তুমি তা মুহতামিম ছাহেবের কাছে নিয়ে একটা দাম ধার্য করে আন অন্যথায় আমার গাভীকে দিও না। মাষ্টার ছাহেব মাদ্রাসায় গিয়ে মুহতামিম ছাহেবকে অবহিত করলে তিনি ব্যাপারটি বুঝে ভয়ে ভয়ে চার আনা বা আট আনা দাম ধার্য করে দিলেন। হুযুর বাম পকেট থেকে আট আনা পয়সা বের করে দিয়ে তবে গাভীটির সামনে ঐ পাতাগুলো দিতে অনুমতি দিলেন। এইরূপ হাজার ঘটনা সামনে রয়েছে। মাদ্রাসার একটা ইট পড়ে থাকতে দেখলে হুযুর নিজ হাতে তা কুড়িয়ে এনে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দিতেন। মাদ্রাসার নৌকায় কোন মাল আনাইলে তিনি নৌকার ভাড়া দিয়ে দিতেন। মাদ্রাসার একটি গাছের পাতা গরুতে খেলে তিনি আহ্ আহ্ করে উঠতেন এবং পাতায় হাত দিয়ে আফছোছ করতেন এবং নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে বেড়া দিতেন। গাছের গোড়ায় মাটি না থাকলে পকেটের পয়সা দিয়ে মাটি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। যা আমরা তুচ্ছ ব্যাপার মনে করে কিছুই করি না। মাদ্রাসার নৌকায় লাফ মেরে উঠলে তিনি আহ্ করে উঠতেন। একটা কাঠ, বাঁশ, হুগলা-পাটি অযত্নে থাকলে ব্যথা পেতেন, দুঃখ করতেন; সবাইকে সাবধান করতেন।

সাহিত্য সাধনায় মুজাহিদে আযম

হযরত ছদর ছাহেব হুযুর আজীবন সাহিত্য সাধনা করেছেন। ছোটকালে তিনি অনেক কবিতাও রচনা করতেন। পাঁচটি ভাষায় অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আজীবন তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য সেবা করেছেন। তাও আবার নিজে পান্ডিত্য দেখাননি কোনদিন। সবাই বুঝে এমন সহজ সরল প্রচলিত ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন। কোন সময় মানুষের সহজবোধ্যের জন্য

সাধু-চলতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অথচ তিনি বলতেন, পাঁচটি ভাষা আমি ভাষাভাষীদের চেয়েও ভাল জানি। আমার সামনে পাঁচ ভাষায় কেউ কলম ধরতে সাহস পায়নি। তিনি বলতেন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ থেকে আমি ভাল বাংলা জানি। কারণ আমার উস্তাদ তাঁদের উস্তাদের থেকে বিজ্ঞ ছিলেন। আরবী, ফার্সী, উর্দূ তিনি ভাষাভাষী পণ্ডিতদের থেকে ভাল জানতেন। নিজে মাতৃভাষায় দুইশত কিতাব, হাজার হাজার প্রবন্ধ লিখেছেন। সাড়ে ষোল হাজার পৃষ্ঠার তাফসীর বাংলায় লিখেছেন। এজন্য পণ্ডিত প্রবর, আধুনিক পণ্ডিতদের পুরোহিত, আঠার ভাষায় এম, এ, হওয়া সত্ত্বেও ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছাহেব হুযুরকে উস্তাদ মানতেন, হাটু গেড়ে সামনে বসতেন। হুযুরের সামনে তিনি কোনদিন চেয়ারে বসতে চাইতেন না। হুযুর প্রতিটি ছাত্র শিক্ষককে সাহিত্যিক ও লেখক বক্তা বানাতে চেষ্টা করতেন। তার প্রতিটি মাদ্রাসায় সাপ্তাহিক জলছায় এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, মাসিক পত্রিকা, কমপক্ষে দেওয়াল পত্রিকায় বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ করে মাতৃভাষায় সকল ছাত্রদের দ্বারা প্রবন্ধ লেখাতেন। বাংলাদেশের যে কয়েকজন ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যিক আছেন এবং মারা গেছেন প্রায় সবাই হযরত মাওলানা শামছুল হক (রহঃ)-এর উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

মুজাহাদায় ও সময়ানুবর্তিতায় আল্লামা ফরিদপুরী

মুজাহিদে আযম আল্লামা ফরিদপুরীর সারাটা জীবনই মুজাহাদাময়। এ জন্যই তাকে মুজাহিদে আযম উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি কাজেই তিনি নফসের বিরোধীতা করে কাজে অগ্রসর হতেন। কারণ হাদীছে এসেছে সবচেয়ে বড় জিহাদ নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ। হাটা-চলায় তিনি যানবাহন রেখে পায়ে হাটার রাস্তা এখতিয়ার করতেন। বাংলার বুঁকে যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই লোকে সাক্ষ্য দিয়েছে, হুযুরের নির্দেশেই আমরা এই দেশে সেবার কমিটি আরম্ভ করেছি। অথচ সে জামানায় কোন যানবাহনই ছিল না। দূর্গম এলাকা কিভাবে যে তিনি সেখানে গিয়েছেন আল্লাহই জানেন। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা ঐ সব এলাকায় গমন করতে সাহস পাই না। অথচ পঞ্চাশ বছর পূর্বেই তিনি সেখানে হেদায়েতের কাজ চালু করেছেন। আহারেরে মুজাহাদা করে শুকনো রুটিকে সম্বল করে কাজ করে গেছেন। যার ফল আজ আমরা ভোগ করছি। পড়ার জামানায় মুজাহাদার রাস্তা অবলম্বন করে পড়াশুনা করেছেন। না বুঝে জীবনে পড়েননি। আরামের ঘি ভাতের, ফ্রি হোষ্টেলের বিলাসিতা ছেড়ে না খেয়ে পড়াশুনা করেছেন। কথাবার্তায় নীরবতার অবলম্বন করেছেন। বসায় আরামের বসা পরিহার করেছেন। শয়নে খালি বিছানায় মেঝেতে শয়নের অভ্যাস করেছেন। পোষাক পরিধানে সাধারণ পোষাক পরিধান করতেন। জীবনের ষাট

বছর পর্যন্ত মোজা পরিধান করেননি। সাধারণ লুংগী, পাজামা, গামছা ব্যবহার করতেন। মজলিসে সাধারণ জায়গায় বসতেন। সারাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেও মিটিং–এর সময় বক্তার তালিকায় নিজের নাম রাখেননি, সভাপতির চেয়ারে বসেননি, লোক ঠকিয়ে জেতার চেষ্টা করেননি, অন্যকে শিখিয়ে ভাল কথা বলিয়ে তাঁর প্রশংসা করে লোকের সামনে মানুষকে সম্মানিত করে তুলেছেন। লোক দেখান ইবাদত পরিহার করে গোপনে ইবাদত-বন্দেগী করেছেন। নিজেকে নাচিজ লিখেছেন। নিজে জ্ঞানগর্ভ বিষয় লিখে দিয়ে অন্যের নামে প্রচার করেছেন।

জীবনে সময়ের খুব বেশী মূল্য দিতেন। একটি মুহূর্তও বৃথা যেতে দেননি। জীবনে সুন্নতের বিপরীত করেননি। মন্ত্রী পরিষদের অনুষ্ঠানেও সবার সামনে মেঝেতে বসে খানা খেতে সংকোচ বোধ করেননি। চব্বিশ ঘন্টার জীবন ছিলো রুটিনে বাঁধা। জীবনে রুটিনের ব্যতিক্রম করেননি। রাত সাড়ে তিনটায় উঠতেন। এস্তেঞ্জা সেরে তাহাজ্জুদ পড়ে যিকিরে মশগুল হতেন। ফযরের পূর্বেই বড় জামায়াতের উদ্দেশ্যে মসজিদ মাদ্রাসায় গমন করে আযানের পূর্ব পর্যন্ত শিষ্যদের তালিম, যিকির বাতাতেন। জামায়াতে ইমামের পিছনে দাঁড়াতেন। নামায শেষে অজিফা পড়তেন, যিকির, মোরাকাবা করতেন। ইশরাকের নামায আদায় করে কামরায় আসতেন। সামান্য নাস্তা করে কিতাব লিখায় মগ্ন হতেন। সাড়ে আটটার মধ্যে কোন বড় লোক, প্রধানমন্ত্রী আসলেও সাক্ষাৎ দিতেন না। অপেক্ষা করতে হতো। সাড়ে আট বা আটটায় কিছুক্ষণ সাক্ষাৎ দিতেন। এরপর ছাত্রদের পড়ানোর কাজে লাগতেন। প্রথম জীবনে আসর পর্যন্ত পড়াতেন। মাঝে যোহরের সময় গোসল করে খানা খেয়ে কিছুক্ষণ আরাম করতেন। এরপর মজলিসে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করতেন। আসর পর্যন্ত জ্ঞানী গুণী আলেম উলামাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মুগ্ধ করতেন। কেউ জটিল কঠিন প্রশ্ন করলে সন্তোষজনক উত্তর দিতেন। সাধারণত তিনি কোন একটি মূল্যবান কিতাব মালফূজাত সামনে রেখে কাউকে কোন একটা বিষয় পড়তে বলতেন। তার ভিত্তিতে আলোচনা চলতো। আলোচনায় আল্লাহর মহব্বত, আখেরাতের বিষয়, জটিল মাসয়ালার সমাধান, বর্তমান পরিস্থিতিতে দায়িত্ব কর্তব্য, ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের গোঁমর খুলে দিয়ে জাতিকে সতর্ক করতেন। হাসির কথা সামনে আসলে মুচকি হাসতেন। কোন দুঃখের কথা সামনে আসলে গম্ভীর হয়ে মুখ কালো করে ফেলতেন, কোন কোন সময় আফছোছ প্রকাশ করতেন, বেদনা প্রকাশ করতেন। আসর বাদ সাধারণ সাক্ষাৎ দান করতেন। প্রথম জামানায় কিছু হাটা-চলার মধ্যে যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। সবসময় আযানের পূর্বে বা সাথে সাথে মসজিদে গমন করতেন। নফলের ওয়াক্ত হলে নফল সুন্নত পড়তেন। মাগরীবের পর আওয়াবীন ছয় রাকাত

কোন কোন সময় বেশীও পড়তেন। যিকির, মোরাকাবা করতেন। কোন কোন সময় মুরব্বীদের জরুরী কথাও শুনতেন। ইশার আযানের পূর্বেই বা সাথে সাথে মসজিদে গমন করতেন। ইশার সুন্নতের পরে দুই চার রাকয়াত নফল পড়তেন। নামায শেষে কামরায় এসে মাদ্রাসার বা দেশ বিষয়ক কোন জরুরী কথা থাকলে সমাধা করতেন। এরপর বাসায় বা কামরায় খানা খেয়ে একটু পরেই শুয়ে যেতেন। ফ্যামিলী সাথে রাখেননি বললেই চলে। অসুস্থ বা অতি প্রয়োজনে কাছে রাখতেন। আবার শেষ রাত্রে সালাত তিনটায় পড়তেন। এস্তেঞ্জা সেরে মেসওয়াক করে, অযু করে নামাযে দাঁড়াতেন। ছফরে ও বাড়ীতে হুযুর প্রায় একই নিয়মে চলতেন।

মুরীদান ও মুহিব্বীনদের সেবায় হযরত ছদর ছাহেব

মুরীদ সাধারণতঃ করতেনই না। এতদসত্ত্বেও তার প্রায় সাত লক্ষ মুরীদ ছিল। পৃথিবীর সবদেশেই কমবেশী মুরীদ ছিল। তিনি কাউকেও মুরীদ বলতেন না। দোস্ত, ভাই বা মুহিব্বীন বলতেন। মুরীদের মধ্যে অধিকাংশ বড় আলেম ও শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। বেকার ব্যক্তিকে মুরীদ করতেন না। আগে কাজের ব্যবস্থা করতে বলতেন এবং ঠিকমত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতেন। হক্কুল এবাদ, বান্দার হকের জন্য কঠোর নির্দেশ স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীর হককে এবং ডিউটিকে অগ্রাধিকার দিতেন। সবার সাথে মহব্বত রেখে ইছলাহ করতেন। মুরীদ খুব কমই করতেন। মুরীদদের সুন্নতের ইত্তেবা, ইবাদত-বন্দেগীর পাবন্দী, হক্কুল ইবাদের গুরুত্ব, রুজী-রোজগারের ব্যবস্থার জন্য তাকীদ করতেন। বেকারদের দেখতে পারতেন না। খেদমতে খালককে, ছাফাইয়ে মোয়ামেলাতকে, সুন্দর আচরণকে, মধুর চরিত্রকে, জেহাদের প্রেরণাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। প্রত্যেকের ওয়াজিব, ফরয, সূরা-কিরাত, দোয়া-দরূদ সামনে দাঁড় করিয়ে শুনতেন এবং শিক্ষা দিতেন। কুরআন তেলাওয়াত, অর্থ বুঝার জন্য গুরুত্ব দিতেন। হাদিয়া-তুহফা কবুলই করতেন না। সাধারণত হালাল, গভীর সম্পর্কের হলে কবুল করে উপস্থিত সবাইকে এবং আলেম, তালেবুল ইলমদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। সবার খবর নিতেন, ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করতেন। সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কারও উপকার হবে বুঝতে পারলে নিজের মান-অপমানকে উপেক্ষা করে সুপারিশ করে দিতেন। কোন কোন সময় নিজে হাজির হয়ে মানুষের জন্য সুপারিশ করতেন। সবাইকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ দিতেন। বাবুগিরির প্রতি নারাজ ছিলেন। মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার করতেন কিন্তু ক্ষমতাশালীদের সাধারণের পর্যায়ে রাখতেন। আলেমদের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে দিতেন। মুরব্বীদের তিনি খুব একরাম করতেন। ছোটদের আদর স্নেহ করতেন। পড়ুয়া ছাত্রদের বেশী কদর ক[illegible]তেন। বীর-বাহাদুরী পছন্দ

করতেন, কা-পুরুষ, বুজদেলদের ঘৃণা করতেন। জেহাদের জন্য উৎসাহ দিতেন। একবার একজন মুরীদ বিরাট একটি রুই মাছ হাদিয়া স্বরূপ এনে হাজির করলে তিনি দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। এতবড় মাছ বর্ষাকালে পাওয়া যায় না। এজন্য কোথা থেকে এনেছে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি বললো নিজ হাতে ধরে এনেছি। এরপর বললেন, এতবড় মাছটি তোমার বৃদ্ধা মা ও ছেলে-মেয়েদের সামনে থেকে কেন আনলে ফেরৎ নিয়ে যাও। লোকটি বললো, হুযুর- আরও দুটো বাড়ীতে রেখে এসেছি। হুযুর বললেন, তুমি সবচেয়ে বড়টি এনেছ। সে বললো, হা, বড়টি এনেছি। হুযুর বললেন, তোমার মার মনে চেয়েছিল বড় মাছটি নিজ হাতে কুটব, ছেলে মনে করেছিল আমি বড় মাছের মাথাটি খাব। তুমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে মনে কষ্ট দিয়ে এটা এনেছ, ফেরৎ নিয়ে যাও। লোকটি কেঁদে ফেললো। হুযুর দয়াপরবশ হয়ে বললেন, ঠিক আছে মাছটি তুমি বাড়ী নিয়ে যাও। তোমার মাকে কুটতে বলো। অতঃপর মাথা এবং লেজ বাদে কম তেলওয়ালা কয়েক টুকরা মাছ আমাকে দিয়ে যেও, আমি খুশী হয়ে দোয়া করবো অন্যথা করো না। এই ছিল হুযুরের হাদিয়া কবুলের বিবরণ। তিনি গওহরডাঙ্গার মুহতামিম ছাহেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আমার অগোচরে আমার বাড়ীর কারও হাদিয়া হরগেজ পাঠাবেন না। আমার বাচ্চাদের চোর বানাবেন না। যদি কেউ নিজের বাড়ীর তৈরী কোন হালাল হাদিয়া আনে আপনি কবুল করে ছাত্রদেরকে বন্টন করে দিবেন। আমার বাড়ীতে কখনও পাঠাবেন না।

সন্তানদের প্রতি মহব্বতে হযরত

ছেলে-মেয়ে সন্তানদেরকে তিনি আদর করতেন কিন্তু কোনদিনও প্রশ্রয় দিতেন না। একবার হুযুর হজ্জে যাবেন ষ্টীমারে উঠার জন্য আধা ঘন্টা পূর্বে মাদ্রাসায় এসে আসবাবপত্র ঠিক করে ষ্টীমারের অপেক্ষায় মাদ্রাসার প্রাইমারী স্কুলের আমগাছ তলায় একটি চেয়ারে বসে আছেন, হাতে লাঠি ও একটি গামছা। হাজার হাজার ছাত্র, গ্রামবাসী, মুরীদান উপস্থিত হয়ে বিদায় মোছাফাহা করে হুযুরকে ষ্টীমারে তুলে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। হুযুরের বড় ছেলে ভাই মোঃ ওমরের বয়স তখন ৭/৮ বছর। স্কুলের জানালার শিক ধরে কাঁদছে। একজন মুরীদ দৌড়ে গিয়ে দোকান থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট এনে ওমরের হাতে দিল। হুযুর মুরীদকে কাছে ডাকলেন। সে বেচারা কাঁপতে কাঁপতে হাজির হলো। হুযুর নরম ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, ওর হাতে কি দিলে? তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন, কয়েকখানা বিস্কুট। হুযুর বললেন কেন দিলে? তিনি বললেন, ছোট মানুষ কাঁদছে এজন্য দিয়েছি। হুযুর বললেন, এখানকার সব বাচ্চাকে দিয়েছ? তিনি বললেন, না। হুযুর বললেন, সবাই আমাকে বিদায় দিতে এসেছে শুধু তাকে কেন দিলে? আজ তুমি

বিস্কুট দিলে, কাল তুমি আসলে বিস্কুটের লোভে তোমার দিকে তাকাবে। ঐ দিন যদি দাও পরের দিন তোমার পকেট হাতিয়ে পয়সা নিবে, না পেলে অন্যের পকেট কাটবে, তুমি আমার ছেলেকে পকেটমার বানিয়ে দিবে? এরপর কড়া সুরে বললেন, যাও ওর হাত থেকে বিস্কুট জোরে কেড়ে আন।' হুকুম পালন করতে হলো। লোকটি বিস্কুট হাতে কাঁদছে হুযুরের সামনে দাড়িয়ে, হুযুর মৃদু কঠোর কোমল সুরে বললেন, এমন কাজ জীবনে কখনও করবে? লোকটি বলল, করবো না কোনদিন। তখন হযরত নরম সুরে বললেন, যাও বিস্কুটগুলো সমস্ত ছেলেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দাও। ওমরকেও একভাগ দাও, আর এমন কাজ করবে না এইটা ছিল হুযুরের আওলাদ প্রীতির একটি নমুনা। এইভাবেই তিনি জীবন পরিচালনা করেছেন। কুয়েত থেকে দুম্বার পাকান গোশত এসেছে হুযুর ছাত্রদেরকে আগে ভাগ করে দিলেন। বাড়ীতে আওলাদদের পাঠাননি।

জামাতার আদর আপ্যায়নে মুজাহিদে আযম ছদর ছাহেব

তিনটি জামাতা হুযুরের। সবাইকে সমান আদর করতেন। একবার মাদ্রাসা খোলার সময় হুযুর গওহরডাঙ্গায় ছিলেন। খোলার দিনে সবাই হাজির হচ্ছে। ওস্তাদগণ আসছেন, কিন্তু কেউ সকালে, কেউ দুপুরে, কেউ বিকালে, কেউ একদিন পর, কেউ বা দুইদিন পরে। যারা এক ঘন্টাও দেরী করে এসেছেন তাদেরকে হুযুর কঠোরভাবে ধমকালেন, মাদ্রাসা কি আয় রোজগারের জায়গা বানিয়েছ বা চাকুরী বানিয়েছ? এই বলে কঠোর ধমকি দিলেন, কোনই খাতের করলেন না। দুই দিন পরে হুযুরের মেঝো জামাতা বর্তমান মুহ্তামিম হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান ছাহেব মাদ্রাসায় আসেন। খবর পেলেন, সবাই দৌড়ে এসে অবস্থা জানালো। জনাব মাওলানা আব্দুল মান্নান ছাহেব ভয় পেয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে হুযুরের বাড়ীতে গেলেন। হুযুর তখন বাড়ীতে ছিলেন ভয়ে ভয়ে বৈঠক খানায় গিয়ে হুযুরের সাক্ষাৎ পেলেন। মন আৎকে উঠলো ভয়ে। সালাম দিয়ে মোছাফাহা করে দাড়ালেন। কিন্তু একি! হুযুর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আব্দুল মান্নান এসছ! তোমার শরীর ভাল ছিল? আমরাতো বাবা তোমার জন্য পেরেশান, তোমার আম্মাজী অধিক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তাড়াতাড়ি ভিতরে যাও, তোমার আম্মার সাথে দেখা কর। আশ্চর্য ব্যবহার দেখে খুশী হয়ে মাওলানা ভিতরে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে খুব খুশী হয়ে মাদ্রাসায় গিয়ে ছবক পড়াতে আরম্ভ করলেন। হুযুর মাদ্রাসায় এসে খানকার সামনে বসলেন। অন্যান্য মুরব্বী উস্তাদগণ এলেন। হুযুর একটা ছেলেকে দিয়ে মাওলানা আব্দুল মান্নানকে খবর দিয়ে বললেন, মাওলানা আব্দুল মান্নান যে

অবস্থায় আছে, এই মুহূর্তে আমার সামনে হাজির হতে বলো। খবর পেয়ে মাওলানা আব্দুল মান্নান ছাহেব ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে হুযুরের সামনে হাজির হলেন। লোকজন ভর্তি, উস্তাদগণ বসা, হুযুর বাঘের মত গর্জে উঠে বললেন, মাদ্রাসায় কেন দেরী করে এসেছ? এটা কি নানী বাড়ী পেয়েছ? বেরিয়ে যাও। এইভাবে একের পর এক বলে যেতে লাগলেন। উস্তাদগণ ভীত সন্ত্রস্ত। মাওলানা আব্দুল মান্নান ছাহেব ভয়ে এক কোনে মাটির সাথে মিশে যেতে লাগলেন। বেহুশ হওয়ার উপক্রম, চিন্তাভাবনা করার খেয়াল নেই, কিছু বলারও সাহস হারিয়ে ফেলেছেন, পাথরের মত পড়ে থাকলেন। অনেকক্ষণ পর হুযুর থামলেন, অন্য উস্তাদদের উদ্দেশ্য করে হাসিমুখে একেবারে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, নছিহত করতে শুরু করলেন। মাওলানা বেহুশের মত পড়ে থেকে কিছু সম্বিত ফিরে পেলেন এবং আস্তে আস্তে একপার্শ্বে সরে এসে অতি সন্তর্পণে মসজিদের ভিতর দিয়ে ঘামতে ঘামতে কামরায় ফিরে এলেন। এই ছিল হুযুরের জামাতা আদর। ছেলায়ে রেহেমী আত্মীয়তার হক। জামাই-এর স্নেহ আদর বাড়ীতে করলেন, দরদ দেখালেন, আর মাদ্রাসায় এসে দায়িত্বের খবর নিলেন। একেই বলে দর কাফে জামে শরীয়ত, দর কাছে ফুন্দানে এশ্‌ক্‌ এক হাতে শরীয়তের মানদন্ড, এক হাতে মহব্বতের হাতিয়ার।

নির্ভীকতায় ও নির্লোভতায় মুজাহিদে আযম

নির্ভিকতা এবং নির্লোভতা মুজাহিদে আযমের সত্ত্বাগত গুণ ছিল। কোন দিন তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতে জানতেম না এবং লোভ তাঁকে স্পর্শ করতে সাহসী হয়নি। পিতার খড়গ হস্ত তাকে কুরআনের শিক্ষা থেকে ফিরাতে পারেনি। পিতার বিরাট সম্পত্তি ও তাঁকে সামান্যতমও আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। পিতা ত্যাজ্য পুত্রের ভয় দেখিয়েছেন। তিনি মনে মনে হাসছেন। তিনি শুধু ভয় করতেন পিতার অবাধ্যতার। এজন্য পিতার হুকুম পালনের খাতিরে অনেক কাজ মনের বিরুদ্ধে অনেক সহ্য করেছেন। শেরে বাংলার বিশাল মিটিং বন্ধ করে আসরের নামায পড়ার কথা বলতে তিনি ভীতু হননি। কিন্তু স্টাইপেন্ড ও স্কলার শিপের হাজার হাজার টাকার প্রতি সোনার মেডেলের প্রতি তিনি চোখ তুলে চেয়ে দেখেননি। লিয়াকত আলী খানের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে তিনি গায়ের ইসলামী শাসনের বিরোধীতা করেছেন। যাকাত আইনের বিরোধীতা করেছেন। যুক্ত ভারত পন্থীদের খুনের হুমকীর তিনি পরোয়া করেননি। অন্যদিকে জিঞ্জিরার হাফেজ ছাহেবের দেয়া বাইশ হাজার টাকার প্রতি তিনি দৃষ্টিপাতও করেননি। আইয়ুব খানের দশ লক্ষ টাকার চেক, শেরে বাংলার হাজার হাজার টাকার দান তিনি হাসতে হাসতে ফেরৎ দিয়েছেন। আইয়ুব খানের ভীষণ মার্শাল 'ল' সান্ধ্য আইনকে

তিনি বৃদ্ধ অঙ্গুলি প্রদর্শন করেছেন। সামরিক শাসকদের সামনে নির্ভীকভাবে তাদের ধমক দিয়েছেন। সরকারের লক্ষ কোটি টাকার লোভকে তিনি মুচকি হেসে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আইয়ুব খাঁনের সামনা সামনি প্রেসিডেন্ট হাউজে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবকে ধোকাবাজ আখ্যায়িত করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। আইয়ুব খাঁন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের রক্তচক্ষুকে তিনি উপহাসের চোখে দেখেছেন। বাড়ী গাড়ী দালান কোঠার হাজার হাজার প্রস্তাবকে পুতুল খেলার মত পায়ে মাড়িয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

মদিনার মসজিদে সমস্ত মাযহাবের আলেমদের সামনে দরস দান ও বাদশাহ আব্দুল আজিজের পক্ষ থেকে ছদরুল উলামা খেতাব দান

হযরত ছদর ছাহেব হুযুর জীবনে পাঁচবার হজ্জে বায়তুল্লাহ আদায় করেন। দ্বিতীয় বারের হজ্জে তিনি মসজিদে নববীতে বিভিন্ন মাযহাবের উলামাদের সামনে আরবীতে দরস দিতেন এবং সব মাযহাবের উলামাদের জটিল জটিল প্রশ্নের উত্তর পানির মত দিয়ে দিতেন। এই খবর বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিন সৌদের কানে গেলে তিনি সমস্ত দেশের উলামাদের ডাকলেন এবং এ সাথে হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেবকে খাছভাবে দাওয়াত দিলেন। উলামাদের সামনে বাদশাহ মুসলিম শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন করলেন ওলামাগণ প্রত্যেকে কিছু কিছু জবাব দিলেন, বক্তৃতা করলেন। বাদশাহ আব্দুল আজিজ খুশী হতে পারলেন না। অবশেষে বাদশাহ মাওলানা ফরিদপুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দুইটি হাদীছ উল্লেখপূর্বক এক প্রাঞ্জল নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন। বাদশাহ এতে এতই খুশী হলেন যে, সিংহাসন থেকে নেমে এসে মাওলানাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ছদরুল উলামা, ছদরুল উলামা বলে বারবার সাবাসী দিলেন এবং পোষাক ও অনেক মূল্যবান উপহার পুরস্কার দিলেন। তার পর বিভিন্ন সমস্যার ইসলামী সমাধানের জন্য মাওলানার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। এই কারণে আরবের বহু বড় বড় বুযুর্গ হযরতের ভক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন সৈয়দ আলবী অন্যতম ছিলেন।

কারামতে মুজাহিদে আযম (রহঃ)

মুজাহিদে আযম কারামাতের প্রতি কোন সময়ই বেশী গুরুত্ব দিতেন না এবং স্বপ্নের ব্যাপারেও বেশী উৎসাহ দেখাতেন না। তিনি সুন্নতের পাবন্দীকেই কারামতের চেয়ে উর্ধ্বে স্থান দিতেন এবং সবাইকে এরজন্য তাকীদ করতেন। একবার ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে জিন্নাহ ছাহেব দেশের বিশিষ্ট পাঁচজন ইসলাম

বিশেষজ্ঞ আলেমকে গভর্ণর জেনারেল ভবনে দাওয়াত দেন। মাওলানা ফরিদপুরী তাদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। উক্ত মজলিসে সরদার আব্দুর রব নিশতার ঈসমাইল চন্দ্রাগড়, পীরজাদা আব্দুস সাত্তার সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। খাবার সময় চেয়ার টেবিল ও কাটা চামচে সজ্জিত ডাইনিং রুমে সবাইকে হাজির করা হলো। চেয়ার টেবিল ও কাটা চামচ দেখে মাওলানা জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কি এখানে খানা খেতে হবে? খান ছাহেব বললেন, জি হা- এইখানেই ব্যবস্থা করেছি। হযরত মাওলানা ছাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে বিসর্জন দিয়ে আমি এভাবে খানা খেতে অপারগ। মুজাহিদে আযমের জবাব শুনে জিন্নাহ ছাহেবসহ সবাই হতবাক হয়ে গেলেন এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অবশেষে ডাইনিং টেবিল চেয়ার কামরার এক পার্শ্বে গুছিয়ে রেখে কার্পেট বিছিয়ে ফরাশ দিয়ে খাবার ব্যবস্থা করা হলো। এটাই ছিল রাসূল (সাঃ) প্রেমের নিদর্শন অলৌকিক কারামত। কারামতে আউলিয়ায়ে হক। এর নিদর্শন এটাই। হুযুরের জীবনে অবশ্য অনেক অলৌকিক ঘটনা জানা যায়, তবে তার মত অসাধারণ শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, সুসাহিত্যিক, দার্শনিক, সু-বক্তা, সাধক, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, সমাজ সংস্কারক, সমাজ সংগঠক, অর্থনীতিবিদ, মুজাহিদ, আলেমে দ্বীন, খাটি নায়েবে নবীর জন্য হাজারও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে, হাজারও লোভ প্রলোভনের মধ্যে অটল অবিচলভাবে হকের উপর দৃঢ়পদ থেকে, সুন্নাতের চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম না করে বীর বিক্রমে দ্বীনের ঝান্ডাকে বুলন্দ করে বাতিলের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়ে কুরবানী ও ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে মুখে পরম বন্ধু মাওলার নাম উচ্চারণ করতে করতে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করা। তার উজ্জ্বল কারামতের নিদর্শন। তবুও আমরা এখানে তাঁর জীবনের মাত্র কয়েকটি ঘটনাই উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ্।

একবার তিনি গওহরডাংগার দক্ষিণ পার্শ্বে মধুমতির অপর পাড়ে খুলনার আড়ুয়া বর্ণি কোন কাজে গমন করেছিলেন। সেখান থেকে ফিরতে গভীর রাত হয়ে গেল। তখনকার মধুমতি নদীর অবস্থা ভয়াবহ ছিল। এক মাইলের অধিক চওড়া, বাতাস ভয়াবহ তুফান, রাত একটা অথচ হুযুরের বাড়ী আসতে হলে নদী পার ব্যতীত গত্যন্তর নেই। নদীতে কোন নৌকা নেই নিঝুম অন্ধকার। অনেক খোজ করে একদিকে একটি নৌকা পাড়ে বাধা লক্ষ্য করে সেখানে গেলেন। দেখলেন নৌকা ঠিকই আছে কিন্তু মাঝি নৌকার মাঝে শুয়ে আছে। ডাকলে সাড়া দিল কিন্তু নদী পার করতে কিছুতেই রাজী হলো না। হুযুর অনেক অনুরোধ করে সে জামানার একটি টাকা দিতে চাইলেন। এখনকার অনেক টাকা। টাকার লোভে

মাঝি নরম হলো কিন্তু তুফানের কথা চিন্তা করে আবার থমকে চুপ করে থাকল। একদিকে কয়েক দিনের কামাই অপরদিকে ভীষণ তুফান দীর্ঘপথ। হুযুর বললেন, বাবা কষ্ট হবে না আল্লাহ চাইলে চলুন। মাঝি রাজী হলো। হুযুর নৌকায় উঠে ছৈয়ের ভিতর দিয়ে অপর পার্শ্বে যাওয়ার পূর্বেই মাঝিকে টাকাটি হাতে দিয়ে অপর পার্শ্বে গেলেন। মাঝি লগী উঠিয়ে নৌকার দড়ি খুলে বৈঠা বাহির করে মাটিতে ফেলে জোরে ধাক্কা দিয়ে নৌকা নদীর দিকে চালিয়ে দিলেন কিন্তু একি! ঠন করে নৌকা অপর পাড়ে ভিড়ে গেল। হুযুর পাড়ে নেমে গেলেন এবং বললেন, বাবা আস্তে আস্তে অপর পাড়ে চলে যাও। মাঝি হা করে তাকিয়ে রইল। হুযুরের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগল, কি হলো? বৈঠার একটানও দিলাম না অথচ এক মাইল পথ অতিক্রম করে অপর পাড়ে এসে গেলাম। ইনি কে? কোন ফেরেশতা নয়তো? মাঝি অনেক্ষণ হতবাক হয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে নৌকা ঘুরালো। দক্ষিণ পাড়ে আসতে তার প্রায় আধা ঘন্টার মত লেগে গেল এবং পরিশ্রান্ত হয়ে ঘামিয়ে গেলেন। এই ঘটনা উক্ত মাঝি বহু লোকের কাছে বলেছেন।

ডুমুরিয়া শ্বশুর বাড়ী থেকে নদীতে আসার সময় ছেলে মেয়ে সহ নৌকা ডুবির বিবরণ– ঘটনায় জানা যায়– একবার বর্ষাকালে হুযুরের শ্বশুর বরিশাল জেলার বর্তমান পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার ডুমুরিয়া গ্রামের জনাব মরহুম রাহাত আলী মোল্লার বাড়ী থেকে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে সহ নৌকা যোগে মধুমতি নদী দিয়ে বাড়ীতে ফিরছিলেন। পথে মাঠিভাংগার পরে নদীর অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বাতাস প্রবল বেগে বইতে ছিল। হঠাৎ নৌকা কাত হয়ে ডুবে গেল। মাঝি ছিল গওহরডাংগার অধিবাসী মরহুম মোহাম্মদ মিয়া। তিনি গুন হাতে পানিতে লাফিয়ে পড়ল, আম্মা ছেলে মেয়ে নৌকার ভিতর, বাহির হতে পারেননি। হুযুর নদীর ভিতর একটু কাছে দাড়িয়ে আছেন। মনে হয় যেন পায়ের নীচে শক্ত মাটিতে দাড়িয়ে আছেন, পানি বুক পর্যন্ত। এদিকে নৌকা সোজা হয়ে পানি সমান সমান হয়ে জেগে আছে, ডুবেও না, ভাসেও না। আম্মা, বাচ্চারা ভিজে গেছে কিন্তু নৌকার মাঝে বসে ভয়ে কাপছে, কাঁদছে। মাঝি সাতরিয়ে হুযুরের কাছে এলে হুযুর তাকে হাত দিয়ে ধরে ফেললেন। মাঝিকে বললেন, রশি, গুন নৌকায় বেঁধে আমাকে ধরে কুলের দিকে টেনে নিয়ে চলো। মাঝি রশি বেঁধে হুযুরকে ধরে রাখলো। হুযুর আস্তে আস্তে হেটে কুলের দিকে অগ্রসর হলেন। কুল অনেক দূরে ছিল। অনেকক্ষণ পরে হুযুর নৌকাসহ মাঝিকে নিয়ে কুলে উঠলেন, নদীর ভিতর সর্বদা হুযুরের বুক পর্যন্ত পানি ছিল। হুযুর হেটে হেটে কুলে উঠলেন। মাঝি মোহাম্মদ মিয়া নৌকা কুলে টেনে নিলেন। আম্মা ও বাচ্চারা কুলে অবতরণ করলো। ইতিমধ্যে অনেক লোক এসে গেল। কয়েকজন মাঝি ও নৌকা চালিয়ে নিকটে এলো। সবাই মিলে নৌকাটার পানি সেচে তক্তা পাটাতনগুলো গুছিয়ে ঠিক

করলো এবং হুযুর সবাইকে নিয়ে নৌকায় উঠলেন। মাঝিরা বলাবলি করতে লাগল, এ কোন দেবতা হবে। এখানে প্রায় সত্তর হাত গভীর পানি, পূর্বেও অনেক নৌকা এখানে ঘোলার মধ্যে ডুবেছে। কোন নৌকা পাওয়া যায়নি, মানুষও মরেছে। অথচ নৌকাটি ছিল হুযুরের নিজ পয়সায় কিনে দেওয়া ডুবন্ত কাঠের নৌকা যা পানি উঠলে মাটিতে গিয়ে ঠেকে। এই ঘটনা সারাদেশে এখনো লোকে বলাবলি করে।

একবার হুযুর কয়েকজন লোকসহ গভীর রাতে পাটগাতী পূর্ব দিক থেকে মাদ্রাসার দিকে আসছিলেন। হুযুর মাঝে ছিলেন হঠাৎ মাদ্রাসার দিক থেকে বিশাল এক অগ্নিকুন্ড সামনে হাজির হলো। সামনের লোকগুলো পিছনে ফিরে হুযুরকে জড়িয়ে ধরলো। হুযুর তাদেরকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়ে সামনে অগ্রসর হতেই অগ্নিকুন্ড দূরীভূত হয়ে গেল। হুযুর সবাইকে নিয়ে মাদ্রাসায় পৌছে গেলেন।

কোন এক সময় হুযুর রমজানের পর থানাভবন থেকে বাড়ীতে এসেছেন। তখন হুযুরের বাড়ীর মসজিদই গ্রামের একমাত্র মসজিদ ছিল। গভীর রাত। সবাই গভীর নিদ্রামগ্ন। সে সময় হুযুরের বাড়ীর জনৈক ব্যক্তি পেশাবের জরুরতে বাহিরে এসেছেন। হাজত পুরা করে বাড়ীর মধ্যে গমন করবে এমন সময় মসজিদের দিকে দৃষ্টি পড়লো। তিনি দেখতে পেলেন মসজিদ ভর্তি সাদা টুপি, সাদা পোষাক পরিহিত মানুষে মসজিদ কানায় কানায় ভর্তি। লোকটি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একবার মসজিদের দিকে একবার ঘরের দিকে হাটতে লাগলেন। মসজিদের মেহরাবের দিকে হুযুরকে কথা বলতে দেখতে পেলেন। সে ব্যক্তি হুযুরকে দেখে সাহস করে মসজিদের দিকে অগ্রসর হলো। তখন মসজিদ থেকে লোকগুলো হঠাৎ উধাও হয়ে গেল, একজনকেও আর দেখা গেল না। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন কে? লোকটি নিজের নাম বললো। হুযুর বললেন, কেন বাহিরে এসেছ? সে বললো পেশাব করতে। হুযুর বললেন, যাও। সে ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। উলামাগণ একথা শুনে কেউ কেউ বললেন হুযুরের কাছে হাজার হাজার জ্বীন মুরীদ হয়েছে, তারা হয়ত হুযুরের নছিহত শুনতে এসেছিল। লোক দেখে চলে গিয়েছে, কেউ বলল জ্বীন আলেমগণ হুযুরের কাছে হাদীছ পড়তে এসেছিল। মাঝে মধ্যে তারা এরূপ এসে হুযুরের কাছে কিতাব পড়ে। কিন্তু কেউই হুযুরের কাছে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায়নি।

হুযুর ঢাকা অবস্থানকালে ঢাকা থেকে বহু দূরে কোন এক এলাকায় বড় একটি গ্রামে জ্বিনের খুব উপদ্রব হলো। সন্ধ্যা হলে সারা গ্রামে ইট, পাথর পড়তে থাকে। অনেক তদবীর করেও কোন উপকার হয়নি। ভয়ে রাত্রিবেলা গ্রামে একটি লোকও থাকতো না। সন্ধ্যার পূর্বে গরু-বাছুর বেধে খানা খেয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে রাত্রি যাপন করতো। ভয়ে রাত্রিবেলা গ্রামের দিকে কেউ তাকাতো না,

শুধু হাড়ুত, হুড়ুত ইট পাথরের আওয়াজ শুনতো। রাতে সে গ্রামে কোন চোর, ডাকাতও ঢুকতো না। গ্রামের হাজার হাজার লোক মিলে বিভিন্ন তদবীর কারকের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে হয়রান হয়ে অবশেষে কয়েকজন আলেমের পরামর্শে হুযুরের খেদমতে হাজির হয়ে কান্নাকাটি করে সব ঘটনা বললো। হুযুর সব শুনে বললেন, বাবারা আমিতো কোন তদবীর জানিনা। আমি কি করবো? তারা অনেক কান্নাকাটি করে হুযুরকে কিছু একটা করার জন্য অনুরোধ করলে হুযুরও দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে আরবীতে ছোট একটা কাগজ লিখে দিলেন। তাতে আরবীতে লিখে দিলেন যার অর্থ- হে জ্বীন ভায়েরা! আপনারা এ সমস্ত আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দিচ্ছেন কেন? আর কষ্ট দিবেন না। হুযুর লোকদেরকে বলে দিলেন- এ কাগজটি একটা ছোট তক্তার উপর আঠা দিয়ে আটকিয়ে একটা বড় বাশের মাথায় দড়ি দিয়ে তক্তাটিকে বেঁধে দিয়ে গ্রামের মাঝখানে টানিয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে। লোকেরা ঐ দিন রাতেই তক্তা বড় একটি বাশের মাথায় টানিয়ে দিল। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আর কোনদিন ঐ গ্রামে জ্বীনের উপদ্রব দেখা যায়নি।

হুযুর একবার ঢাকা থেকে বাড়ীতে তাশরীফ আনলেন। মাদ্রাসার উস্তাদ, ছাত্রগণ অভিযোগ করলো, হুযুর রাত্রে কুকুরে মাদ্রাসায় খুব যন্ত্রণা দেয়। বোর্ডিং এবং ভাতের পাত্রগুলো চেটে নাপাক করে দেয়, কি করা যায়? হুযুর হুকুম দিলেন, পাগলা কুকুর গুলোকে মেরে ফেলো। শত শত ছাত্ররা লেগে গেল। অনেকগুলো কুকুর মারা হলো। এর মধ্যে গ্রামের মেম্বর আলতাফ হোসেন মিয়ার পোষা কুকুরটা মারা পড়লো। গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। আলতাফ হোসেন ছাহেবের ছেলেরা মাদ্রাসায় এসে কুকুরটা নেড়ে চেড়ে দেখে কেদে ফিরে গেল। অবশেষে জনাব আলতাফ হোসেন কুটি মিয়া মেম্বর ছাহেব রাগান্বিত হয়ে হুযুরের কাছে অভিযোগ করতে এলো। হুযুর বাড়ীতে ছিলেন। মেম্বর ছাহেবের রাগ দেখে হুযুর আস্তে তাকে বলে দিলেন, আপনার কুকুর মারেনি, আপনি বাড়ীতে যান। আপনার কুকুর বাড়ীতে আছে। মেম্বর ছাহেব রাগে দুঃখে ব্যথিত মনে বাড়ীর দিকে চললেন। পথে লোকের কাছে বলতে বলতে গেলেন যে, কুকুর মেরে ফেলেছে ছাত্ররা আমার ছেলেরা দেখে গেছে সে কুকুরকে, তা বাড়ী যাবে কি করে। মেম্বর জনাব আলতাফ হোসেন ছাহেব বাড়ীর নিকটে পৌছামাত্র ছেলেরা দৌড়ে এসে খবর দিল, আমাদের কুকুরটা বাড়ীতে ফিরে এসেছে, মেম্বর ছাহেব স্তম্ভিত ও নিজের ব্যবহারের জন্য কুকুরটাকে দেখলেন এবং লজ্জিত হয়ে পরে হুযুরের খেদমতে হাজির হয়ে অনেক উজরখাহী করে মাফ চেয়ে নিলেন। হুযুর হাসিমুখে মাফ করে দিলেন। ছাত্ররা পরে

মরা কুকুরগুলোর মধ্যে খোজ করে কোথাও ঐ কুকুরটাকে খুজে পেল না। সবাই বুঝলো আল্লাহ তাঁর পেয়ারা বান্দার সম্মানের জন্য দয়া করে কুকুরটিকে জীবিত করে দিয়েছেন।

হযরত মুজাহিদে আযম তখন ব্রাহ্মনবাড়ীয়া মাদ্রাসায় পড়াতেন। ছুটিতে বাড়ীতে এসে দেখলেন ভাই ব্রাদার সবাই জেল হাজতে। গ্রামে মারামারি হয়ে একজন লোক খুন হয়েছে। খুনী আসামী হুযুরের বংশের সাতজন সবাই হাজতে বিচার চলছে, হুকুমের তারিখ সামনে। সবার ধারণা মামলায় একজন বা দুইজনের ফাসী হবে এবং অন্য সবার জেল হবে দীর্ঘ মেয়াদী। সবাই হাহাকার করছে, কান্নাকাটি করছে। হুযুর বাড়ীতে আসেন, মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন, কিতাব অধ্যয়ন করেন, কোন হা হুতাশ নেই। মনে হয় যেন কোন চিন্তাও নেই। হুযুরের আম্মাজান আমেনা খাতুন তখনও জীবিত আছেন, বৃদ্ধা হয়ে গেছেন এবং মামলার কারণে আরও বেশী পেরেশান হয়ে পড়েছেন। হুযুর ব্যতীত আপনজন সবাই জেলে। রাত-দিন কাঁন্নাকাটি করেন। হুযুরের নির্লিপ্ততা দেখে তাঁর আম্মা অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হলেন। একদিন হুযুর নামায পড়ে কেবলমাত্র ঘরে এসেছেন। আম্মা কাছে এসে রাগান্বিত স্বরে বললেন, শামছু তোমার কোন চিন্তা নেই? ভায়েরা হাজতে, তাদের নাকি জেল ফাঁস হবে, এই অবস্থা দেখার আগে আমার মৃত্যু হওয়াও ভাল ছিল। এ কথা বলে হুযুরের আম্মা কাঁদতে আরম্ভ করলেন। হুযুর আম্মাকে অনেক বুঝিয়ে ধৈর্য্য ধারণ করতে বললেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বললেন। যে আল্লাহ এরাতো ইচ্ছা করে খুন করেনি খুন করতে চায়নি হঠাৎ করে লোকটি মারা গেছে, সেও ভালই ছিল। আল্লাহ তুমি এদের ক্ষমা করে দাও, মুক্তি দিয়ে দাও। এই বলে হুযুর আপন কাজে লেগে গেলেন। হুযুরের আম্মার সান্ত্বনা হলো না, তিনি হুযুরকে ফরিদপুরে যেতে বললেন। হুযুর মাতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, ঠিক আছে আম্মা আমি ফরিদপুর যাব। কিন্তু দুই তিন দিন হতে হতে মামলার হুকুমের দিন এসে গেল। হুযুর মামলার হুকুমের দিন সকাল বেলা খানা খেয়ে ফরিদপুর রওয়ানা দিলেন। সে সময় পায়ে হেটে ফরিদপুর যাতায়াত করতে হতো, কোন প্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না এবং ফরিদপুর যেতে হলে ২/১ দিন আগেই রওয়ানা দিতে হতো। পুরা একদিনে যাওয়া কষ্টকর ছিল। অথচ হুযুর বাড়ী থেকে ফরিদপুর যাত্রা করলেন সকাল ৮/৯ টার দিকে, হুযুরের আম্মা যাওয়ার সময় রাগ করে কথাও বললেন না। হুযুর আবার ঐ দিনই বিকাল বেলা বাড়ীতে ফিরে এলেন। হুযুরের আম্মা হুযুরকে দেখে মনের দুঃখে হুযুরের সাথে কথাও বললেন না। মনে করলেন শামছু কত দূরে গিয়ে আবার পথের থেকে কি মনে করে ফিরে এসেছে। ফরিদপুর গেলে হয়ত সন্ধ্যা পর্যন্ত

পৌঁছাতে পারতো এবং কমপক্ষে কি রায় হলো জেনে আসতে পারতো, তাও গেলনা। এজন্য মনের দুঃখে হুযুরের সাথে কথাই বললেন না। রাত হলো সবাই ঘুমে, হুযুরের আম্মার চোখে ঘুম নেই হা-হুতাশ করছেন। এমন সময় বাহিরে আওয়াজ হুযুরের ভাই ও অন্যান্য সরাই ফরিদপুর থেকে বেকসুর খালাশ হয়ে বাড়ীতে এসেছে। সবাই হুযুরের আম্মার কাছে দাড়াল এবং বললো সাড়ে এগারটায় আমরা বেকসুর খালাশ পেয়েই বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিয়েছি পথে দাড়াইনি, বিশ্রাম করিনি। মাঝে মধ্যে খুশীতে দৌড়েছি। হুযুরের আম্মা খুশী হলেন কিন্তু হুযুরের উপর রাগ। বলতে লাগল আল্লাহ তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু শামছুল হকের কারবারে আমার খুব ব্যথা লেগেছে। তাকে কত বললাম দুই তিন দিন আগে ফরিদপুর গিয়ে তোমাদের জন্য একটু চেষ্টা করতে, কিন্তু সে দুই তিন দিন আগেতো গেলই না বরং আজ সকালে ৮/৯ টার সময় ফরিদপুর যাওয়ার কথা বলে কোথা দিয়ে ঘুরে ফিরে আসরের সময় আবার বাড়ীতে ফিরে এসেছে। এজন্য আমি রাগ হয়ে তার সাথে কথাই বলিনি। সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, কি আবোল তাবোল আপনি বলেন, কোর্টে আমরা যখন কাঠগড়ায় দাঁড়ান, ঐ সময় দেখলাম শামছু জজের কাছে এক সাথে বসে আমাদের সম্পর্কে কি যেন বুঝাচ্ছে, আমরা তো তার চেষ্টায়ই খালাশ পেয়েছি। অন্যথায় আমাদের তো ফাঁসীর হুকুম হতো, উকিল ছাহেব ভারাক্রান্ত মুখে সেই কথাই বলেছিল, আমরা তো চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু আমাদের বেকসুর খালাশের কথা শুনে বাহিরে এসে শামছুকে অনেক খোজ করলাম কিন্তু পেলাম না। মনে করলাম শামছু হয়তো জজের বাসায় বেড়াতে গিয়েছে। এজন্য আমরা আর দেরী না করে চলে এসেছি। শামছু হয়ত কাল পরশু এসে যাবে, চিন্তা নাই। হুযুরের আম্মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, এ কি শুনলাম? শামছুকে আমি বিশ্বাসই করিনি যে, সে ফরিদপুর গিয়ে কিছু করেছে। তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, আরে শামছু দেখি ঘরে শুয়ে আছে। সবাই অবাক হয়ে একে অপরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কারও মুখে আর কথা ফুটলো না।

কোন এক বছর গওহরডাঙ্গার জলছার প্রথম দিনে হুযুর যশোর ছিলেন। জনাব মরহুম আলহাজ্ব মাষ্টার আব্দুর হক ছাহেব যিনি হুযুরের আজীবন খাদেম ও পি, এ হিসাবে সাথে ছিলেন। হঠাৎ হুযুর মাষ্টার মরহুমকে ডেকে বললেন, মাদ্রাসার সভা হচ্ছে আজ প্রথম দিন তুমি তাড়াতাড়ি করে খুলনা গিয়ে রাতের ষ্টীমারে গওহরডাংগা চলে যাও, আমিও সভায় আসতেছি। এ কথা বলে হুযুর মাষ্টার ছাহেবকে খুলনা পাঠিয়ে দিয়ে নিজে যশোর থেকে গেলেন। মাষ্টার ছাহেব হুযুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুযুর আপনি এবার সভায় যাবেন না? হুযুর বললেন, হা

আমিও যাব। মাষ্টার ছাহেব হুযুরকে যশোর রেখে ব্যস্ত হয়ে খুলনা চলে আসলেন। কারণ রাতের ষ্টীমার ধরতে হবে অন্যথায় দ্বিতীয় দিনের সভাও ধরা যাবে না। আর মনে মনে চিন্তা করলেন, হুযুর কখন যাবেন জানি না কিন্তু সভায় আর এ বছর যেতে পারলেন কৈ? মাষ্টার মরহুম আব্দুল হক ছাহেব (রহঃ) ব্যস্ত হয়ে খুলনা এসে রাতের ষ্টীমারে উঠলেন এবং ষ্টীমারের অনেক সভা যাত্রী প্যাছেঞ্জারদেরকে বললেন, হুযুর এ বছর বোধ হয় সভায় আসতে পারবেন না। ষ্টীমার সকাল সাতটায় গওহরডাংগা ভিড়লো। ষ্টীমার থেকে নেমেই শুনতে পেলেন, হুযুর গতকাল বিকাল তিনটার দিকে সভাস্থলে পৌছে গেছেন। মাষ্টার বিশ্বপীর, যিন্দাপীরের খবর খুশীতে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে মাদ্রাসায় হাজির হয়ে দেখলেন সত্যিই মুজাহিদে আযম খানকা শরীফে স্বশরীরে বসে আছেন। লোকজনের সাথে কথা বলছেন। এজন্যই মাষ্টার ছাহেব ছিলেন ফানাফিশ শায়েখ (পীর পাগল)।

ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে গোপালগঞ্জের কাঠি গ্রামের কয়েকজন মুরব্বী গওহরডাংগা হুযুরের কাছে এসে বললেন, আমাদের একটি যুবতী মেয়ে বিবাহের রাতে পাগল হয়ে গেছে; কাপড় গায় রাখেনা, খায় না, আমরা এবং জামাতা বেচারা খুব পেরেশান। জামাই গার্জিয়ানদের চাপে পুনঃ বিবাহ করতে যাচ্ছে; হুযুর একটা তদবীর দেন, আমরা মরে যাচ্ছি। হুযুর বললেন, বাবারা আমি কোন তদবীর জানি না, করিও না। আপনারা অন্য কোথাও যান এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। তিনিই একমাত্র ভাল করার মালিক। মানুষের ভাল-মন্দ করার কোনই ক্ষমতা নেই। একথা শুনে লোকগুলো পেরেশান হয়ে একটু দূরে গেল এবং ফিরে এসে আবার হুযুরকে অনুরোধ করলো। হুযুর একটু কঠোরভাবে বললেন, আল্লাহর কাছে বলুন আমি দোয়া করি। এই কথা বলে একজন হুযুরকে বলে দিলেন, এই লোকগুলোকে বুঝিয়ে বিদায় করে দাও। হুযুর তাদেরকে অনেক বুঝিয়ে বিদায় করে দিলেন। তারা মনক্ষুণ্ন হয়ে দেশে ফিরে চললো। বাড়ীর কাছাকাছি যাওয়ার পর দেখতে পেলো, বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা তাদের আসতে দেখে দৌড়ে কাছে এসে খবর দিল আমাদের বোন ভাল হয়ে গেছে। দুপুরের বাদে সে নিজে কাপড় চেয়ে পরেছে, গোছল করে সমপূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। আগের মত চলা ফেরা করছে। এটাই ছিল হুযুরের একটি কারামত।

একবার ৭০ সালে গোলমালের সময় রমজানে মাদ্রাসায় খতম তারাবী হবে কি না? এ নিয়ে খুব জটিলতার সৃষ্টি হলো। তারাবী খতম হলে একদল মুসলিম লীগের তারা নামায পড়তে এলে মুক্তি বাহিনী তাদের ধরবে, আর একদল আওয়ামী লীদের তারা এলে রাজাকাররা ধরবে। মাদ্রাসার বড় হাফেজ ছাহেব জনাব হাফেজ আব্দুল হক ছাহেব জীবনভর গওহরডাংগায় খতম পড়িয়েছেন।

ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হিফজ খানার দোতলার চিলে কোঠায় উঠে কুরআন বুকে নিয়ে পড়তে ছিলেন এবং চিন্তা করতে করতে হঠাৎ অন্ধকারের মত ভাব হলো এবং তন্দ্রার মত অবস্থা হলো। হঠাৎ হাফেজ ছাহেব দেখেন ছদর ছাহেব হুযুর সামনে দাঁড়ান। তিনি বলছেন, হাফেজ ছাহেব চিন্তা করবেন না। বিকালে গ্রামের মুরব্বীদের ডেকে বলবেন, এবার খতম তারাবী হবে কি না? বাস এতটুকু বলে আর কোন কথা বলবেন না। এরপর আর হুযুরকে দেখা গেল না। মাদ্রাসার পক্ষ হতে সকল মুরব্বীদের ডেকে ঐ কথা বলা হলো। মুরব্বীদের মধ্য থেকে বলা হলো নিশ্চয়ই খতম তারাবী হবে। এরপর মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে জনাব আলেম মিয়া মাতব্বর ছাহেব বললেন, খতম হবে সবাই নামায পড়বে, আমাদের পক্ষ থেকে কেউ আওয়ামী লীগের কোন লোককে কিছু বলবে না, ধরবে না। অতঃপর আওয়ামী লীগের মুরব্বী জনাব খলিলুর রহমান খাঁন ছাহেব বললেন, আমিও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলছি, মুসলীম লীগের সমস্ত মানুষ খতমে তারাবী পড়বে, আওয়ামী লীগের মুক্তি বাহিনীর কোন লোক মুসলীম লীগের লোকদের কোন ক্ষতি করবে না,, ধরবে না। অতঃপর আগের মতই স্বাভাবিকভাবে শান্তির সাথে তারাবী হলো। উভয় পক্ষ যার যার লোকদের সাবধান করে দিল। কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করলো না।

হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন ছাহেব বলেন, "হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছাহেব আমাকে তাজীম করেন, আদর সম্মান করেন কিন্তু আমিতো কারো কাছে মাথা নত হওয়ার মানুষ নই। শুধু দুইটি কারণে আমি মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের কাছে নত হই, তাকে মুরব্বী মানতে মনে চায়- (১) তিনি আমাকে সম্মান করে নিজে জায়গায় যত্ন করে বসান কিন্তু যখন তার মজলিসে বসি আমার সমস্ত বুদ্ধির তরতীব এলোমেলো হয়ে যায়, আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই- এর দ্বারা বুঝে আসে, আমি আইয়ূব খাঁর সামনে টেবিলে পা দিয়ে বসা মানুষ কাউকে ভয় করি না। আর ফরিদপুরী ছাহেব আমার তাজীম করেন অথচ আমার কথার তরতীব তার সামনে ঠিক রাখতে পারি না কেন? নিশ্চয়ই তার মধ্যে খোদাপ্রদত্ত এমন কোন শক্তি আছে, যে কারণে আমার মত লৌহমানব পাঠানের ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয় তাকে এজন্য মান্য করি ভক্তি করি একটি ঘটনার জন্য। ঘটনাটি পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যাহতি পরের ঘটনা। করাচীতে সরকারী দাওয়াতে পূর্ব পাকিস্তানের বড় বড় সমস্ত বুযুর্গ আলেম একটি প্লেনে যেতে ছিলেন। তাতে হাফেজ্জী হুযুর আমি ও অন্যান্য সবার সাথে ছদর ছাহেব হুযুরও ছিলেন। প্লেন সবাইকে নিয়ে কলিকাতার কাছাকাছি যাওয়ার পর হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায়। পাইলট মাইকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, হযরত উলামায়ে

কেরাম আমাদের প্লেন ২/৩ মিনিটের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহকে যা ডাকার ডেকে নেন। ২/৩ মিনিট পরে প্লেনের স্টার্ট বন্ধ হযে মাটিতে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই আল্লাহকে যা ডাকার ডেকে নেন। বাঁচার সব চেষ্টা ব্যর্থ। সবাই কান্নাকাটি তওবা করতে আরম্ভ করলো। প্লেনের ভিতর শোরগোল, রোনাজারি আরম্ভ হলো। মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খাঁন বলেন, আমি জনাব মাওলানা শামছুল হক ছাহেবের পার্শ্বে বসে ছিলাম, দেখলাম তিনি গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে আছেন। কোন কান্নাকাটি, হা-হুতাশা নেই, স্থিরভাবে বসে আছেন। ২/১ মিনিটের মধ্যে প্লেন স্থির হয়ে গেল, পরক্ষণেই দশ হাজার ফিট উপর থেকে পড়তে লাগলো। হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল আর আমি দেখলাম– ছদর ছাহেব আল্লাহু আকবার বলে শাহাদত আঙ্গুল উর্ধ্বে তুলে দাড়িয়ে গেলেন। প্লেন মাটিতে মেশার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আস্তে সোজা হয়ে গেল এবং কে যেন হাতে ধরে আস্তে মাটিতে রেখে দিল একটু ঝাকিও লাগল না। পাইলট চীৎকার করে বললো আল্লাহর রহমতে আমরা রক্ষা পেয়েছি; বেঁচে গেছি। আমাদের প্লেনের কোনই ক্ষতি হয়নি। অতি অল্প সময়ে আমরা প্লেন ঠিক করে যাত্রা করতে পারবো। হযরত মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ খান ছাহেব বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বুঝে নিলাম এবার জীবনের সকলে রক্ষা পেলাম ছদর ছাহেব হুযুরের জন্য অন্য কারো হাউ মাউ কান্নাকাটিতে কিছুই হয়নি। হুযুরের আল্লাহ আকবার-ই আমাদের রক্ষা করেছে। এজন্য মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীকে মান্য না করে থাকতে পারি না।

এই ঘটনা লিখে এ বিষয়ে শেষ করছি কারণ আরও হাজারও ঘটনা আছে। কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আরও লেখা থেকে বিরত হলাম। ঘটনাটি যশোর জেলার আঃ করিম নামে একজন হাজী ছাহেবের। তিনি এক বছর হজ্জে গমন করেছিলেন। সে সময় বোম্বাই থেকে জাহাজে নিজ দায়িত্বে জেদ্দা যেতে হতো। আবার জাহাজে চড়ে বোম্বাই এসে দেশে আসতে হতো। বৃটিশ আমলে সরকারের কাছে টাকা জমা দেওয়া লাগতো না। উক্ত হাজী আব্দুল করীম ছাহেব হজ্জ সমাধা করে ফেরৎ টিকিটের টাকাগুলো পোটলা বেধে কাছে রেখেছিল হঠাৎ একদিন টাকার পুটলীটা কোথাও যেন হারিয়ে গেল। অনেক খোজ করেও আর তার সন্ধান পাওয়া গেল না। হাজী ছাহেব কাঁদতে লাগলেন এবং লোকের কাছে বলতে লাগলেন। তিনি চিন্তা করলেন টাকা না পেলে আর দেশে আসতে পারবেন না। বাল-বাচ্চাদেরও আর দেখতে পারবেন না। এই ভেবে কাঁদতে ছিলেন। কয়েকজন হাজী ছাহেব পরামর্শ দিলেন হেরেম শরীফে বাংলাদেশের বিখ্যাত বুযুর্গ আলেম হযরত মাওলানা শামছুল হক ছাহেব আছেন। আপনি সেখানে গিয়ে হুযুরের কাছে সাহায্য ও পরমার্শ চান তবে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বায়তুল্লাহর পার্শ্বে হুযুরের কাছে এসে সব ঘটনা বিস্তারিত বললো। হুযুর বললেন, বাবা আমারও সবার মত টিকিটের টাকা কয়টি আছে ঠিক আছে আপনি আমার টিকিটের টাকা কয়টি নিয়ে দেশে যান, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে এখানে থেকে যাই যদি আল্লাহ কোন রাস্তা করে দেন। লোকটি কেঁদে বললেন, হুযুর আপনি এখানে থাকবেন। আমি আপনার টাকা নিয়ে দেশে যাব এ কিছুতেই হতে পারে না। আপনি আমাকে দোয়া করেন এবং পরামর্শ দেন কি করবো। হুযুর গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে বললেন ভাই ছাহেব আল্লাহ সবই করতে পারেন, মানুষ কিছু করতে পারে না, মানুষের ক্ষমতায় কিছুই নেই, মানুষ পারে মাওলার দরবারে চাইতে। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন। আপনি আজ শেষ রাত্রে উঠে ভালভাবে মেসওয়াক করে অযু করে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর কাছে খুব কেঁদে দেশে যাওয়ার ব্যবস্থার জন্য দোয়া করবেন এবং পরে এই ছোট দোয়াটি আকাশের দিকে চেয়ে আল্লাহর কাছে বলতে থাকবেন এবং পড়তে থাকবেন, আল্লাহর মেহেরবানী হলে দেশে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা হবে। ঐ হাজী ছাহেব তাহাজ্জুদ পড়ে দোয়া করে আকাশের দিকে তাঁকিয়ে পড়তে লাগলেন। হুযুর বলে দিয়েছিলেন ভাই দোয়া পড়ার সময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন না একটু হাটাচলা করতে থাকবেন। ঐ হাজী ছাহেব নামায পড়ে দোয়া করে আকাশের দিকে তাঁকিয়ে দোয়াটি পড়তে থাকলেন এবং হাটা চলা করতে লাগলেন। হুযুর বলে দিয়েছিলেন, আযান না শোনা পর্যন্ত মাথা নীচের দিকে নামাবেন না। হাজী ছাহেব দোয়ার সাথে সাথে এক পা দু'পা করে হাটতে থাকলেন। আধা ঘন্টা বা কিছু কম সময়ের মধ্যে আযান কানে এল, আযান শেষ হলে তিনি নীচের দিকে মাথা নামালেন। গর্দান ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। গর্দান সোজা করে নীচের দিকে তাঁকিয়ে দেখলেন পায়ের নীচে দুর্বা ঘাস অনুভব করলেন এবং আবছা অন্ধকারে হাত দিয়ে দেখলেন। মনে মনে বললেন, আরব দেশে তো দুর্বা ঘাস নেই। শুধু বালি আর পাথর। কোথায় এলাম। আমার ছদর ছাহেব হুযুর কোথায়? চারিদিকে তাঁকিয়ে কলাগাছ দেখলেন। হাজী ছাহেব হতভম্ব হয়ে পড়লেন। উত্তর দিকে তাঁকিয়ে ঘাটলা বাঁধা দেখতে পেলেন মনে হলো একটা পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আরো একটু ফর্সা হলে তিনি দেখলেন। এ যেন হাজী ছাহেবের নিজের বাড়ীর পুকুর। বিশ্বাস হয় না আরও উত্তর দিকে তাঁকালেন নিজের বাড়ী-ঘর, দরজা, গরু, বাছুর দেখতে পেলেন। তবুও মনকে বিশ্বাস করাতে পারলেন না। পশ্চিম দিকে তাঁকালেন মসজিদের মিনার দেখতে পেলেন। যেখান থেকে আযান শুনেছেন। দেখলেন এযে তাদেরই মসজিদ। ফর্সা

হয়ে গেছে। মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলেন। যে আগে নামায পড়ে সেই পরে দেখা যাবে কি হলো। মসজিদে গেলেন অযুতো আছেই। সবাই তাঁকে দেখে চীৎকার করে বলে উঠলেন, আরে হাজী ছাহেব কখন বাড়ী এসেছেন? এবার আর বিশ্বাস না করে পারলেন না। বললেন, আসুন নামায পড়ি পরে সব বলবো কখন এলাম। নামায বাদ বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। সবাই হতবাক হয়ে শুধু তাকিয়েই থাকলো। কারো মুখ দিয়ে কথা ফুটলোনা। তারপর সবাই রাত দিন শুধু ছদর ছাহেব হুযুরের কথা বলতে লাগলেন।

হযরত ছদর ছাহেব সারা জীবনের চব্বিশ ঘন্টার ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও প্রায় দুইশতের উর্ধ্বে জাতি গঠনমূলক কিতাব ও সাড়ে ষোল হাজার পৃষ্ঠার তাফসীর স্বহস্তে লিখেছেন।

হুযুরের জীবনের সর্বশেষ ঈদ

১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৬৯ সালের ২১ শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ১৩ মাস হুযুর হায়াত পেয়েছিলেন। এ সময় তিনি পূর্বের মতই রুটিন মাফিক জীবন যাপন করেছেন। হাজার অসুস্থ্যতার মধ্যেও রুটিনের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা আরও বর্দ্ধিত রূপ লাভ করেছে।

এই সময়ে তিনি পবিত্র কালামে পাকের তাফসীর লেখার বাকী কাজ সমাপ্ত করেন এবং ভুল সংশোধন নামে একটি কিতাব লিখেন।

জীবনের সর্বশেষ ঈদুল ফিতর যখন ঘনিয়ে আসল আমরা তখন হুযুরকে ঈদের ময়দানে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন আয়োজনে লেগে গেলাম। হুযুর বলে পাঠালেন এবার আমি ঈদের মাঠে যেতে পারবো না।" কারণ তিনি তখন ভালভাবে হাটতে চলতে অক্ষম ছিলেন, চোখেও খুব কম দেখতেন। হুযুর বললেন "এখন আমার উপর ঈদের নামায ওয়াজেব নয়।" আমরা আবদার করলাম হুযুর ঈদের নামাযে না গেলে আমাদের কলিজায় সহ্য হবে না। আমরা ঈদগাহে যেতে দারুন ব্যথা অনুভব করব। যে কোন ভাবে হুযুরকে আমরা ঠেলা গাড়ীতে করে ঈদগাহে নিয়ে যাব। হুযুর বললেন, "দেখ বাবা ঠেলা গাড়ীতে গেলে লোকের ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। অতএব আমার উপর যখন ঈদের নামায ওয়াজিব নয়, লোকের ক্ষতি করে আমি ঈদগাহে যাবো না।" আমরা কাকুতি-মিনতি করে আরজ করলাম, "হুযুর প্রয়োজন হলে আমরা সকলে গাড়ী সহ হুযুরকে কাঁধে করে ঈদগাহে নিয়ে যাবো, লোকের ফসলের কোন ক্ষতি কোনক্রমেই হতে দিবো না।" হুযুর বললেন, এ কাজে তোমাদের খুব কষ্ট হবে।

আমরা বললাম, এতে আমাদের কোনই কষ্ট হবে না। হুযুর আবেগ জড়িত দরদভরা কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা হয়ত একাজে কোন কষ্ট মনে করবে না, কিন্তু আমারও তো একটা আত্মা আছে। তোমাদের কষ্ট দেখলে আমি অন্তরে যে খুব ব্যথা পাবো এটা ঠেকাবে কিভাবে! আমার আত্মার কষ্টতো তোমরা দেখবে না, আমি অনুভব করবো, কষ্ট পাবো।' আমরা মলিন মুখে কাঁদতে কাঁদতে চুপ হয়ে দাড়িয়ে থাকলাম। অনেকক্ষণ এভাবে সকলে চুপচাপ থাকল। অতঃপর হুযুর বললেন, ঠিক আছে, চলো ঈদগাহে আমাকে নিয়ে চলো, হয়তো ইহাই আমার জীবনের শেষ ঈদের নামায হতে পারে।' আমরা খুশীর সাথে আস্তে আস্তে ঠেলাগাড়ীতে হুযুরকে নিয়ে ঈদগাহে গেল্যাম। ঐ বছর হুযুর আমাদের হিফজখানার বড় হাফেজ ছাহেবের দ্বারা ঈদের নামায পড়ালেন। পূর্ব থেকেই কোন্ কোন্ ছুরা পড়তে হবে হুযুর জনাব হাফেজ আব্দুল হক ছাহেবকে বলে দিয়েছিলেন এবং কিরূপ টোনে কিভাবে পড়তে হবে বাতিয়ে দিয়ে কয়েকবার নিজে শুনে নিয়েছিলেন। ঐ আয়াতে হযরত ইব্রাহীমের ঘটনা, হাজেরা ইসমাঈল (আঃ)-এর বনবাসের ঘটনা বর্ণিত ছিল। নামাযের সময় হুযুর বসে নামায আদায় করছিলেন। ঐ আয়াত যখন ইমাম ছাহেব পড়ছিলেন যে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে বলছেন, "মাওলাগো আমার স্ত্রী পুত্রকে ঘাষ পানি বিহীন ধু-ধু পাথর, বালুকাময় বিয়াবনে তোমার ঘরের কাছে রেখে গেলাম। এই সময় আমি হুযুরের পার্শ্বে ছিলাম, দেখলাম হুযুর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন এবং পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছেন। নামায শেষে মুনাজাতের পূর্বে হুযুর দেশবাসী সকলকে কাছে আসতে বললেন, বিশেষ করে যুবক ও নেতৃবৃন্দ মাতব্বরগণকে। জনাব মরহুম মানিক মিয়া ছাহেব, জনাব নূরু মিয়া ছাহেব, বিশ্বাস মোস্তাইন বিল্লাহ, জনাব লুৎফর রহমান শেখ সকলেই সামনে এসে হুযুরের সাথে মিশে বসলেন এবং একে একে মোছাফাহা করলেন, দোয়া নিলেন। হুযুর যেন জীবনের শেষবারের মত দেশবাসী আদরের সন্তানদের বুকে জড়িয়ে নিয়ে শেষ মহব্বত দান করে মাদ্রাসা দেশ ও খাদেমুল ইসলামের কাজকে তাদের হাতে সোপর্দ করে শেষ বিদায় নিলেন। ঐ সময় পাটগাতি ইউনিয়নের খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের আমীর ছিলেন জনাব শেখ আলতাফ হোসেন লক্ষণ মিয়া এবং সেক্রেটারী ছিলেন বিশ্বাস মোস্তাইন বিল্লাহ এবং সদস্য ছিলেন বিভিন্ন গ্রামের মুরব্বীগণ। দোয়া বাদ হুযুরকে নিয়ে আমরা মাদ্রাসায় চলে আসলাম। এটাই ছিল হুযুরের জীবনের শেষ ঈদ।

হুযুরের সন্তান-সন্ততি

ইন্তেকালের সময় হুযুরের দুই ছাহেবজাদা, তিন কন্যা ও আমাদের পীর আম্মাজীকে রেখে তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। বড় ছেলে ভাই

হযরত মাওলানা হাফেজ মোঃ ওমর ছাহেব বর্তমানে খাদেমুল ইসলাম জামায়াতের আমীর, গওহরডাঙ্গার মুরব্বী উস্তাদ, হযরত হেকিম আক্তার ছাহেবের সুযোগ্য খলীফা, দুই কন্যা সন্তানের জনক, গওহরডাঙ্গা বাড়ীতে থাকেন। ছোট ভাই হযরত হাফেজ মাওলানা মুফতী রুহুল আমীন ছাহেব ও হেকিম ছাহেব হুযুরের খলীফা, তার প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে এমদাদিয়া ও মাদ্রাসার নাজেম উত্তরায় থাকেন, পাঁচ সন্তানের জনক দুই ছেলে তিন মেয়ে। হুযুরের বড় জামাতা পাটগাতির আলহাজ্জ আব্দুল হালিম ছাহেব, আমাদের বড় বোন বেগম রশিদা খাতুন, মেঝো জামাতা গওহরডাঙ্গার প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান ছাহেব। মেঝো মেয়ে মফিদা খাতুনকে নিয়ে গওহরডাঙ্গা আছেন। হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের ছোট জামাতা এ্যাডভোকেট মোসলেম উদ্দিন খুলনা বারের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। আল্লাহর শোকর মুজাহিদে আযমের সমস্ত সন্তানগণ সবাই আল্লাহর দ্বীনের পথে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর মুরীদান, মুহিব্বীন ও ছাত্রগণ ও খোলাফাগণ

মুজাহিদে আযম হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের এই বিষয়টি ছিল একটি গুপ্ত ভাণ্ডার। এর সন্ধান ছিলনা কারো কাছে। এটা শুধু তিনিই জানতেন এবং যিনি তার মুরীদ খলীফা বা শাগরেদ ছিলেন এই দুই পক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একবার দুইজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ লালবাগ এসে হুযুরের কাছে মুরীদ করার জন্য অনুরোধ করলেন। হুযুর তাদেরকে হযরত হাফেজ্জী হুযুরের কাছে যেতে বললেন এবং বললেন 'তিনি বড় বুযুর্গ, হযরত থানভী (রহঃ)-এর বড় খলীফা।" তারা কিছুতেই অন্য কোথাও যেতে রাজি হলেন না। তারা বললেন, হুযুর! আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি এবং তিনি আপনার হাতে বায়য়াতের নির্দেশ দিয়েছেন।" অবশেষে হুযুর তাদেরকে শেষ রাতে বেগম বাজার মসজিদে হুযুরের হুজরায় হাজির হতে বললেন।' শেষ রাতে তারা হাজির হলে প্রথমে শপথ নিলেন তার কাছে মুরীদ হয়েছে একথা জীবনে কারও নিকট বলবেন না এবং বায়য়াত করে বিদায় করলেন। কাজেই এ ব্যাপারে বেশী কিছু বলা একেবারেই অসম্ভব। তবে ৬৫ সালের যুদ্ধের সময় তার একটি ইশতেহারে তিনি লিখেছিলেন, 'আমার সাত লক্ষ মুরীদান ও মুহিব্বীন ও দেশবাসী সমস্ত মুসলমান যেন জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।' একথা থেকে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে বুঝা যায়, তার অসংখ্য মুরীদ ও খোলাফা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। এজন্য আরব আজম যেখানেই আমরা যাই, তার মুরীদান ও মুহিব্বীনদের সাক্ষাৎ মেলে। সবাই

যার যার দেশে দ্বীনের জেহাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বত্র লক্ষ্য করলে দিনের আলোর মতো পরিদৃষ্ট হয় কি মাদ্রাসার খেদমত, মক্তবের খেদমত, খানকার পীর-মুরীদীর খেদমত, দাওয়াত ও তাবলীগের খেদমত, জেহাদ ও রাজনীতির খেদমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির খেদমত, সমাজ সংস্কার ও জাতি গঠনের খেদমত, মিশনারী ও বাতিলের মোকাবিল্লার খেদমত, সাহিত্য ও ভাষা চর্চার খেদমত, গবেষণা ও খেদমতে খালকের খেদমত অধিকাংশ স্থানেই মুজাহিদে আযমের হাতে গড়া শাগরেদদের দ্বারা নেতৃত্বের খেদমত চলছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বড় বড় মাদ্রাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীছ ও উস্তাদগণ তারই ছাত্র। যেমণ- ঢাকার জামেয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া, গওহরডাঙ্গা কামরাঙ্গীচর মাদ্রাসা-ই নূরিয়া, ফরিদাবাদ জামেয়া এমদাদুল উলূম, পীর জঙ্গী শামছুল উলূম মাদ্রাসা, জামেয়া মোহাম্মদিয়া মোহাম্মদপুর, মীরপুর দারুর রশাদ মাদ্রাসা, বারীধারা মাদ্রাসা, আরজাবাদ মাদ্রাসা সর্বত্রই শায়খুল হাদীছ ও মোহতামেমের কাজ হুযুরের শাগরেদদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকার বাহিরে খুলনা, যশোর, রাজশাহী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল সর্বত্রই বড় বড় মাদ্রাসাগুলো প্রায় সবই হুযুরের শাগরেদ কর্তৃক পরিচালিত। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান আরব আজম সব জায়গায়ই হুযুরের শাগরেদদের দ্বীনের খেদমত চালাতে দেখা যায়। দাওয়াত ও তাবলীগের মুরব্বী হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব, মরহুম হযরত মাওলানা আলী আকবার ছাহেব, মরহুম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী, হযরত হাফেজ মাওলানা জোবায়ের দামাত বরকাতুহুম, মরহুম হযরত মাওলানা লুৎফর রহমান ছাহেব, মাওলানা জমির উদ্দিন ও অন্যান্য মুরব্বীগণের খেদমতে তাবলীগের কাজে সহযোগিতা হচ্ছে। পীরের খানকাসমূহ ছহীহভাবে যেখানে যেখানে কাজ হচ্ছে প্রায় সর্বত্রই হুযুরের শাগরেদগণ চালাচ্ছেন। হযরত ক্বারী আঃ ওহাব ছাহেবের নূরাণী, আলহাজ্ব আব্দুল মালেক ছাহেবের নূরাণী, হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়েত ছাহেবের নাদিয়া, নুরিয়া, মোমেনবাড়ী ক্বারী ইব্রাহিম ছাহেব (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির সমস্ত কুরবানী খেদমতই হুযুরের শিষ্যগণের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। রাজনীতি ও খেদমতে খালক ও সমাজ সংস্কারের খেদমত হুযুরের সাক্ষাৎ শাগরেদদের দ্বারা চলিতেছে। তা নেজামে ইসলাম হোক, খেলাফত আন্দোলন হোক, খেলাফত মজলিস হোক, ইসলামী ঐক্যজোট হোক, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনই হোক, খাদেমুল ইসলামই হোক মারকাজুল ইসলামই হোক, জামায়াতে ইসলামই হোক সব দলের নেতা প্রায় সকলেই হুযুরের নিজ হাতে গড়া নেতা কর্মীবৃন্দ। সাহিত্যের ময়দানে জনাব মুহিউদ্দীন খানই হোক, জনাব মাওলানা আমিনুল ইসলামই হোক, মরহুম কবি গোলাম মোস্তফাই হোক, চাই

ডক্টর শহিদুল্লাহ মরহুম ছাহেবই হোক সকলেই হুযুরকে গর্বের সাথে মুরব্বী হিসাবে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন। মোটকথা পৃথিবীর যেখানে যতটুকু ইসলামের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে যত প্রকার দ্বীনি ইসলামী কাজ হচ্ছে চাই বাতিলের মোকাবেলায় হোক, কলমের মোকাবেলায় হোক, তলোয়ারের মোকাবেলায় হোক মুজাহিদে আযমের রূহানী শেরকত, তার হাতে গড়া মানুষগুলোর মাধ্যমে সর্বত্রই সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

ছাত্র ও খলীফা

এখানে আমরা নমুনা স্বরূপ হযরতের মাত্র কয়েকজন শাগরেদ ও খলীফার নাম উল্লেখ করছি মাত্র।

হুযুরের শাগরেদদের মধ্যে হযরত মাওলানা মরহুম হেদায়তুল্লাহ ছাহের, সাবেক প্রিন্সিপ্যাল লালবাগ, হযরত মাওলানা শাইখুল হাদীছ আজিজুল হক ছাহেব প্রিন্সিপ্যাল শায়েখ জামেয়া রহমানিয়া, হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব, প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল গওহরডাংগা মাদ্রাসা, হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান ছাহেব, প্রিন্সিপ্যাল গওহরডাংগা মাদ্রাসা, হযরত মাওলানা আব্দুল মজিদ মরহুম ঢাকা হুজুর, হযরত মাওলানা মরহুম ছালাহ উদ্দিন ছাহেব হযরত মাওলানা মরহুম মমতাজ উদ্দিন ছাহেব প্রিন্সিপ্যাল মোহতামেম সাত কাছেমিয়া মাদ্রাসা হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব, প্রাক্তন মোহতামেম বাহিরদিয়া ফরিদপুর, হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ ছাহেব প্রাক্তন ইমাম কোর্ট মসজিদ গোপালগঞ্জ, হযরত মাওলানা হাফেজ জামিল আহমদ ছাহেব উদয়পুর, হযরত মাওলানা মাজহারুল ইসলাম ছাহেব খতিবে বাংগাল, হযরত মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী ছাহেব বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল লালবাগ মাদ্রাসা, হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব, প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, হযরত মাওলানা তাহেরুদ্দীন ছাহেব মরহুম এভাবে লিখতে গেলে হাজার পৃষ্ঠায়ও শেষ হবে না। এজন্য এখানেই শেষ করছি এবং হযরতের খোলাফাগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে ক্ষান্ত করছি।

হযরতের খোলাফায়ে কেরাম

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীর ছদর ছাহেব (রহঃ)-এর সর্ব প্রধান খলীফা গওহরডাংগা মাদ্রাসার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব (রহঃ), মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেব ; প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল বাহিরদিয়া মাদ্রাসা, হযরত মাওলানা খলিলুর রহমান ছাহেব, মাদারীপুর, হযরত মাওলানা আনোয়ারুল হক ছাহেব মাদারীপুর, হযরত

মাওলানা মরহুম মোমতাজ উদ্দিন ছাহেব প্রতিষ্ঠাতা সাত কাছেমিয়া মাদ্রাসা, হযরত মাওলানা হাফেজ জামিল আহমদ ছাহেব (রহঃ), হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ ছাহেব; প্রাক্তন ইমাম খতিব, গোপালগঞ্জ কোর্ট মসজিদ, হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ ছাহেব মরহুম বড়নাল কালিয়া, যশোর, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব, প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল বাহিরদিয়া মাদ্রাসা। হযরত মাওলানা কাজি আব্দুল মান্নান ছাহেব (রহঃ) খাদেমুল ইসলামের সাংগঠিক সম্পাদক। এই সব ব্যক্তিত্ব ছাড়াও দেশী বিদেশী বহু বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কেরাম হুযুরের খোলাফাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে আমাদের তেমন কোন এলেম নেই। একবার গওহরডাংগা থেকে আমরা চরমোনাই-এর মরহুম আল্লাহর কুতুব হযরত মাওলানা ইসহাক ছাহেবের ওয়াজের সরল সহজ বয়ানের খুব প্রশংসা ছদর ছাহেব হুযুরের কাছে করলাম, হুযুর বললেন, বড় আল্লাহ ওয়ালা মোখলেছ মানুষ, তিনাকে দাওয়াত করে এনে পাটগাতি বাজার এবং টুংগীপাড়া শেখ ছাহেবের বাড়ীতে ওয়াজের মাহফিল কর।' আমি উদ্যোগী হয়ে পাটগাতী বাজারের জনাব ডাঃ আব্দুল কাদের ছাহেব ও অন্যান্য মুরব্বীগণের সমন্বয়ে কমিটি করে মরহুম চরমোনাইর পীর ছাহেব হুযুরকে কয়েকটি প্রোগামে দাওয়াত দিলাম। হুযুর খুশীর সাথে কবুল করলেন। মরহুম শেখ ছাহেবদের বাড়ীতে এবং পাটগাতী বাজারে সভার পর পীর ছাহেব হুযুর বাজার মসজিদে ফযরের বাদ অবস্থান করছিলেন। আমি ভোরে সাক্ষাৎ করলাম। হুযুর আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভাই আমাকে হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের কাছে নিয়ে চলুন, সাক্ষাৎ করবো।' পীর ছাহেব কেবলা হুযুরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করার জন্য বড় একটি পেপে খরিদ করালেন। পীর ছাহেব হুযুরের শরীর ঐ সময় ডাইবেটিস ও ব্লাড প্রেসারে খুব দুর্বল ছিল। যানবাহনের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। পীর ছাহেব হুযুর আমার গলার উপর এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, আমি হাত দিয়ে হুযুরকে জড়িয়ে ধরে আধা কোলের মত করে আমার উপর ভর রেখে আস্তে আস্তে হুযুরকে নিয়ে ছদর ছাহেব হুযুরের বাড়ীর দিকে চলতে লাগলাম। মাঝে হুযুর একটু বসে বিশ্রাম নিলেন। আস্তে আস্তে ছদর ছাহেব হুযুরের বাড়ীতে গেলাম। ইতিপূর্বে অনেক পীর ছাহেবকে হুযুর সাক্ষাৎ দানে অস্বীকৃতিও দান করেছেন অসুস্থ্যতার জন্য। মরহুম পীর ছাহেব হুযুরের বিশ্রামের ব্যবস্থা আমি বৈঠক খানার সামনে কুরছীতে করে হযরত ছদর ছাহেব হুযুরের কাছে গেলাম এবং মরহুম পীর ছাহেব হুযুরের আগমনের সংবাদ দিলাম। হুযুর আরাম করছিলেন। খবর পেয়েই খুশী হলেন এবং উঠে বসলেন, জামা গায় দিলেন এবং আমার সাথে বাহিরে পীর ছাহেব হুযুরের কাছে আসলেন। ছালাম, মোছাফাহা বাদে হুযুর পীর ছাহেব হুযুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। পীর ছাহেব হুযুর উত্তর

দান করে শেষে বললেন, হুযুর আমি আল্লাহর বান্দাদের একটু জোরে যিকির করাই এতে অনেক আলেম নানা রকম ফতওয়া দেয়, নাজায়েজ বলে, এখন আপনি হুকুম দিয়া দেন আমি কি করবো যিকির করাবো কি না?' হযরত ছদর ছাহেব হুযুর পীর ছাহেব হুযুরকে বুকে জড়ান অবস্থায়ই পিঠে হাত রেখে বললেন, "না, না আপনি জোরে যিকির করাবেন। এ জামানায় এর দরকার আছে, এ ব্যাপারে, আমি আপনাকে খাছ এজাজত ও অনুমতি দিলাম। এরপর উভয়ে খুশী হয়ে বসে অনেক কথা বললেন। পীর ছাহেব হুযুর পেপের হাদিয়া সহস্তে হুযুরের কাছে পেশ করলেন। হুযুর খুশীর সাথে কবুল করলেন। উপস্থিত উলামায়ে কেরাম বলতে লাগলেন, হযরত ছদর ছাহেব পীর ছাহেব হুযুরকে শেষ জীবনে খেলাফত দান করে গেলেন।

জ্যোতি রেখে শামস যখন ডুবিল

যে স্মৃতি ভুলার নয়, ভুলা যায় না, যে স্মৃতির রোমন্থনে হৃদয় ফেটে যেতে চায়, অন্তর দগ্ধীভূত হয়, কলিজা শুকিয়ে খাক হয়ে যায়, আজ সে স্মৃতিকেই বাধ্য হয়ে কলমের আঁচড়ে জাগাতে হলো, লিখতে হলো, ব্যথার বিসুবিয়সের জ্বালা মুখকে লাভার স্রোতে প্রবাহিত করতে হলো। বাস্তবের সহস্রাংশের একাংশ যদিও প্রকাশ করা সম্ভব হবে না তবুও ভাইদের মুখলেছানা দাবীর মুখে আমার আনাড়ী হাতের কানাকড়িসম কিঞ্চিত আভাস দিতে চেষ্টিত হলাম।

জীবন সায়াহ্নে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, কুরবানী ও মেহনত পরিশ্রমের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অসুস্থতার মধ্যেও তিনি দৈনন্দিন জীবনের রুটিনের কোন পরিবর্তন করেননি। ডাক্তারদের হাজার অনুরোধ ও পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে সামান্যতম কমি করতে রাজী হননি। তিনি বলতেন, আল্লাহর খুশীর কাজই যদি স্বাস্থ্যের কারণে বন্ধ করতে হয় তবে এ স্বাস্থ্য, এ জীবন দিয়ে কি হবে, আল্লাহর রাস্তায় শেষ হয়ে যাক।

অসুস্থ অবস্থায় সর্বদা তিনি পানাহ চাইতেন, আল্লাহ হাসপাতালের নোংরা, মানবতাহীন জাহান্নামী পরিবেশে যেন আমার মৃত্যু না হয়। তিনি বলতেন গ্রামের পরিবেশে বিনা চিকিৎসায়ও মৃত্যু ভালো, হাসপাতালের নারকীয়, হৃদয়হীন চিকিৎসার পরিবেশের চেয়ে। কারণ হাসপাতালে মানুষ ঈমান নিয়ে মরতে চাইলেও পরিবেশে ঈমানকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

তিনি ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে অসুস্থ অবস্থায় দেশের বাড়ীতে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভক্ত, অনুরক্ত, শিষ্য, শাগরেদ ও গুণগ্রাহীরা এ সিদ্ধান্তে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। চোখে তাদের পানি দেখা দিল, অন্তর বিদীর্ণ হয়ে

গেল। দেশে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে একদিন সবাইকে উদ্দেশ্য করে এক মর্মস্পর্শী ভাষায় লালবাগ শাহী মসজিদে বললেন, "মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না, থাকবেও না, মাওলার দরবারে হাজির হতে হবে। আমিও চিরকাল বেঁচে থাকবো না, এ দুনিয়া থেকে চলে যাব মাওলার দরবারে। হাসিমুখে মাওলার দরবারে হাজির হতে পারি এই দোয়া চাই। পীর মানুষের ওস্তাদ, ভাল-মন্দ কুরআন, হাদীসের দৃষ্টিতে বুঝাতে পারেন। লাভ ক্ষতির মালিক আল্লাহ। মানুষ মানুষের লাভ ক্ষতির কিছুরই মালিক নয়। পীর, ওস্তাদ মানুষের মুক্তি দিতে পারে না, মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। কবর পূজা শিরক, কবরকে সিজদা করা, ভাল-মন্দ হাজত পেশ করা শিরক। তিনি বলেন, খবরদার! খবরদার!! আপনারা কখনো এই সমস্ত গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হবেন না। এক আল্লাহকে মান্য করে চলবেন। ভাল-মন্দের মালিক তিনিই। পীর পূজা, কবর পূজায় লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে। আমার শরীরের যে অবস্থা হয়তো আপনাদের সাথে পুনঃ মোলাকাত নাও হতে পারে। আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিবেন এবং দোয়া করবেন আমিও আপনাদের দুজাহানের কামিয়াবীর জন্য দোয়া করি। আমীন।"

মুজাহিদে আযম-এর সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী কথা কয়টিতে সবার চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে এল। দুঃখ ব্যথিত হৃদয়ে সবাই একে একে বিদায় নিলেন। মুজাহিদে আযম ঢাকার স্মৃতিকে কষ্টের সাথে হৃদয়ে চেপে নিজের জন্মভূমি গওহরডাঙ্গা ফিরে এলেন। গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার ওস্তাদগণ হযরত মুহতামিম ছাহেব ও দেশবাসী তাদের প্রাণের মানিক, হৃদয়ের ধন হকের সূর্যকে আপন ঘরে ফিরে পেয়ে খুশীতে বিভোর হয়ে গেলেন। মুজাহিদে আযমের অসুস্থতায় সবার মনে যদিও দুঃখের কালো ছায়া তথাপি যেন সান্ত্বনা যে, তিনি আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন। এটাই বড় সৌভাগ্য।

হাজারও অসুস্থতার মধ্যেও হযরতের দৈনন্দিন রুটিন সঠিকভাবে চলতে থাকল। মাদ্রাসার শিক্ষকদের পড়াশুনা, আগ্রহ শতগুণে বেড়ে গেল, ছাত্রদের মোতালায়ার যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার হলো, দেশবাসী দলে দলে তাদের সর্বজনমান্য উক্তির পাত্রকে দেখতে লাগল মূল্যবান নছিহত শুনতে লাগল।

মুজাহিদে আযমের রুটিন সাধারণতঃ শেষ রাত থেকে আরম্ভ হতো। রাত ৩টায় উঠে তিনি ইস্তেঞ্জা ইত্যাদি থেকে ফারেগ হয়ে তাহাজ্জুদে লিপ্ত হতেন। কোন কোন দিন তাহাজ্জুদ শেষে আরাম করতেন বা উপস্থিত মুরীদদের ছবক বাতাতেন এবং মূল্যবান প্রশ্নের জওয়াব দিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি ইস্তেঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে অযু করে মাদ্রাসার মসজিদে তাশরীফ নিয়ে আসতেন এবং সেখানে তাহাজ্জুদ শেষ করে ভক্তবৃন্দের কথা শুনতেন, ছবক দিতেন এবং যিকির

মোরাকাবায় লিপ্ত থাকতেন। ফযরের নামাযের আযানের বাদ জামায়াতে নামায শেষ করে খানকায় আসতেন এবং কুরআন তেলাওয়াত, মোনাজাতে মকবুল এক মঞ্জিল এবং অন্যান্য দোয়া ইত্যাদি করার পর ইশ্‌রাক পড়তেন। ইশরাক বাদ কোন কিছু হালকা নাস্তা করতেন, কোন দিন করতেন না। এমতাবস্থায় লিখনীর কাজ শুরু করতেন। আল্লাহর কালামের তাফসীর, জাতি গঠনমূলক পুস্তকাদি প্রণয়ন, যুগের সমস্যার ইসলামী সমাধান ইত্যাদি প্রায় দুইশত কিতাব তিনি এ সময় প্রণয়ন করেন। লিখার সময় সবাই জানতো দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র প্রধান আসলেও তাঁর লিখার সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। এসময় তিনি অন্য কোন কথা বলতেন না। লিখার থেকে অবসর নিয়ে নাস্তা করতেন এবং সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে মাদ্রাসায় চলে যেতেন। ছাত্র-শিক্ষকদের পড়াতেন, বুঝাতেন এবং বাহিরের আগন্তুকদের সাক্ষাৎ দিতেন এর মধ্য থেকে বহিরাগত শত শত পত্রের জবাব নিজ হাতে লিখে ডাকে পাঠাতেন। যোহরের পূর্বে গোসল করতেন এবং নামায পড়ে কিছু খানা খেতেন সামান্য কয়েক লোকমা আহার করে ওলামা, তোলাবা জ্ঞানী ও শিক্ষিত সর্বশ্রেণীর মানুষের মজলিসে বসতেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দিতেন এবং মূল্যবান নছিহত করতেন, কোন কোন সময় কোন কিতাবকে সামনে রেখে আলোচনা চলতো। আসরের জামায়াত শেষ হয়ে গেলে আবার মজলিস শুরু হতো এবং মাগরিবের আযান পর্যন্ত চলতো। মাগরিব বাদ আওয়াবীন পড়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। বিশেষ কোন দ্বীনি কাজ হলে আওয়াবীন বাদ উক্ত কাজও করতেন। এশার নামায জামায়াতে পড়ে মাদ্রাসার দৈনিক রিপোর্ট শুনে আগামী দিনের প্রোগাম জেনে নিয়ে তিনি বাড়ীতে তাশরীফ নিতেন। খানা খাবার পরে সংসারের খবরা-খবর সামান্য জেনে নিয়ে আরাম করতে যেতেন। শেষ রাত্রে ঠিক সময় মত আবার আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলে জেগে উঠতেন। অসুস্থ্ অবস্থায় দেশের বাড়ীতে এসে সাধারণতঃ রুটিন এভাবে চলতো।

অসুস্থ্ অবস্থায় তিনি যখন মাদ্রাসা পর্যন্ত হেটে আসতে অক্ষম হতেন সে সময় একটা ঠেলাগাড়ীতে মাদ্রাসায় হাজির হতেন। যখন গাড়ীতে চলতেও কষ্ট হতো সে সময় তিনি বাড়ীর মসজিদে নামায পড়তেন এবং ঐ সময় ফযর বাদ বাড়ীর মসজিদে সালেকীন, মাদ্রাসার ছাত্রদের ভীড় জমে যেত। ফযর বাদ তিনি ঐ সময় মুসলিম শরীফ, মসনবী শরীফ পড়াতেন। মাঝে মধ্যে তিনি বলতেন, মসনবী শরীফ পড়ে নাও। একথা আর কোন দিন হয়ত শুনাব না। মাঝে মধ্যে তিনি কারীমা, পান্দেনামা, গোলেস্তা, বোস্তা, কসদুসসাবীল, তরবিয়তু সসালেক কিতাবও বুঝিয়ে দিতেন। মসজিদ থেকে গিয়ে কিছু নাস্তা করতেন এবং নাস্তা বাদ লিখার কাজ শুরু করতেন। শেষ জীবনে তাফসীরের বাকী কাজ শেষ করেন এবং

ভুল সংশোধন কিতাবটি লিখেন। যোহর বাদ কিছু বিশ্রাম করে আবার মজলিস শুরু হতো। আসর বাদ তরবিয়াতুচ্ছালেক, মালফুজাতে থানভী (রহঃ) ইত্যাদি আলোচনা হতো। এইভাবে মুজাহিদে আযম নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রুটিন মাফিক চলতেন এবং প্রত্যেককে রুটিন মোতাবেক চালাতেন। প্রত্যেকটি মুরীদের নামায, অযু, দোয়া-দরূদ সামনে দাঁড় করিয়ে শুনতেন এবং ঠিক করে দিতেন।

ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে তিনি গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেবকে বললেন, "মুহতামিম সাহেব জীবনে আল্লাহর কালামের মহব্বত ছাড়তে পারি নাই, মৃত্যুর পরেও এ মহব্বত ছাড়তে পারবো না, এজন্য মাদ্রাসার হিফজখানার দক্ষিণ পার্শ্বে একটু জায়গা আমাকে কবরের জন্য ভিক্ষা দেন। আমি ওখানে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর কালাম শুনবো, আল্লাহর কালামের মহব্বত আমি মরে গেলেও ছাড়তে পারবো না।" উত্তরে মুহতামিম ছাহেব বললেন, এ জায়গা হুযুর দান করেছেন আর আমাদের আকাংখা হুযুর মাদ্রাসায় শুয়ে থাকলে আমরা বেশী সুখী হবো। কাজেই জায়গা চাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। হুযুর বললেন, এসব মাদ্রাসার, কাজেই আপনারা অনুমতি দান করলেই আমি হিফজখানার দক্ষিণ পার্শ্বে একটু জায়গা পেতে পারি।

ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে মাদ্রাসার একজন শিক্ষককে একটি মাসয়ালার তাহকীকের জন্য বলেছিলেন। কিন্তু হুযুরের শরীর এত অসুস্থ ছিল যে ডাক্তার, লোকের সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এজন্য ঐ মাওলানা ছাহেব হুযুরের কাছে যেতে পারেন নাই। হঠাৎ সামান্য সুস্থতা বোধ করায় কোন কাজে আমাকে সংবাদ দিলে ঐ মাওলানা সাহেবও আমার সাথে গমন করেন। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে আর কে আছে? আমি উত্তর দিলাম অমুক মাওলানা সাহেব। সাথে সাথে হুযুর তাকে প্রশ্ন করলেন, মাসয়ালার কিতাবটি এনেছ? তিনি বললেন, হুযুরের স্বাস্থ্য বেশী খারাপ এজন্য আনি নাই। মুজাহিদে আযম বললেন, আমি মরে গেলেও কিতাব দেখার আগ্রহ থেকে যাবে। মুজাহিদে আযমের ইন্তেকালের পূর্বদিন তাঁর অবস্থা বেশী খারাপ হয়ে পড়লো। সারাদিন সবাই পেরেশানীর মধ্যে অতিবাহিত করলো, রাত্রেও অবস্থা এক প্রকার অপরিবর্তিত থাকে। গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মুহতামিম ছাহেব এবং ওস্তাদগণ ও আমরা সবাই অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে রাত অতিবাহিত করলাম। রাতেই পরামর্শ হলো ফযর বাদ খতমে জালালী পড়তে হবে। ফযর বাদ খতম শুরু হলো। হযরত মুহতামিম ছাহেব ছদর ছাহেব হুযুরের খবর নেওয়ার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি হুযুরের বাড়ী গিয়ে দেখি হুযুরের বড় ছেলে ভাই হাফেজ ওমর ছাহেব হুযুরকে অযু করাচ্ছেন আমি

মাদ্রাসায় এসে দেখি খতমের খবর শুনে হযরত ছদর ছাহেব হুযুর নিজেই আম্মা সাহেবানকে হুকুম দিয়ে ছেলেদের জন্য কয়েকটি পাত্রে পায়েস রান্না করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যু শয্যায় শায়িত থেকে মানুষের হককে এরূপ অগ্রাধিকার দিতে আমি কোন মানুষকে দেখিনি। ফযরের নামায বাদ খতমে ইউনুস পড়ার পরে আমরা সবাই হুযুরের বাড়ীতে গেলাম। তিনি তখন নামায পড়ে বারান্দার চৌকিতে শুয়ে আছেন। শ্বাসটা কিছু বেড়ে গিয়েছে এবং পেটে লিভারের কিছু কিছু বেদনা অনুভব হচ্ছে। রবারের থলেতে গরম পানি ভরে সেকা দেওয়া হচ্ছে। আমি ঐ রবারের থলেটা নিয়ে কিছুক্ষণ সেকা দিলাম এবং দুইজন লোককে পাটগাতি বাজারে ডাক্তার আব্দুল কাদেরকে আনতে পাঠালাম। ডাক্তার আব্দুল কাদের ছাহেবকে হুযুর খুব ভালবাসতেন। কিছুক্ষন পরে অবশ্য কবিরাজ আব্দুল ওয়াদুদ ছাহেবও এসেছিলেন। হুযুর কবিরাজ আব্দুল ওয়াদুদ ছাহেবের ঔষধ খেতেন। ডাক্তার আব্দুল কাদের ছাহেব আসার পূর্বেই হুযুর যে চৌকিতে শয়ন করেছিলেন, শীতের জন্য ঐ চৌকিটা সহ হুযুরকে উঠানের রৌদ্রে নেওয়া হল। কিন্তু শ্বাস কষ্ট ও পেটে সামান্য ব্যথা ব্যতিত হুযুর সুস্থ ছিলেন এবং কথাবার্তা বলতে ছিলেন। ডাক্তার আব্দুল কাদের ছাহেব হাজির হওয়ার পূর্বেই জনাব আব্দুল আলীম মুরব্বী, মাতব্বরসহ বেশ কয়েকজনকে নিয়ে হুযুরকে দেখতে আসলেন। হুযুর শায়িত অবস্থায়ই আমাদেরকে বললেন, মুরব্বীদেরকে বসতে দাও। একটু পরেই ডাক্তার আব্দুল কাদের ছাহেব আসলেন এবং মুজাহিদে আযমকে পরীক্ষা করে কয়েকটি ট্যাবলেট খেতে দিলেন। হুযুর নিজ হাতে ট্যাবলেট কয়টি মুখে দিলেন এবং পানি পান করলেন। হুযুরের শরীরের বেচাইনি কিছু বেড়ে গেল। শ্বাসে ও ব্যাথার কিছুটা যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। রৌদ্র বেড়ে গেলে আবার হুযুরকে চৌকিসহ বারান্দায় নেওয়া হল। এসময় বেলা সাড়ে বারোটা। সারা উঠানে ছাত্র, শিক্ষক এবং গ্রামের লোক ভর্তি। হুযুরের বড় ছেলে হাফেজ ওমর তখন কাঁদছিলেন। হুযুর ওমরকে সান্ত্বনা দিয়ে কাঁদতে নিষেধ করলেন এবং অত্যন্ত দরদ ভরা কণ্ঠে বললেন, ওমর কেদনা, আমি তোমাকে দু'টি অছিয়ত করছিঃ

(১) তোমার আম্মা আমার যে খেদমত করেছে এর কোন তুলনা হয় না, তুমি জীবনভর তোমার আম্মার খেদমত করবে।

(২) তুমি হাফেজ হয়েছ এমন খাঁটি আলেম হবে এবং তোমার ছোট ভাই রুহুল আমীনকে হাফেজ ও আলেম বানাইবা। অতঃপর আলেম, তালেবে-ইলম ও জনতার দিকে লক্ষ্য করে শাহাদাত আঙ্গুলী উর্দ্ধে তুলে বললেন, আপনাদেরকে আমি একটা অছিয়ত করছিঃ

'আপনারা এক আল্লাহর উপর ভরসা করবেন এবং পূর্ণ ইখলাসের সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করে যাবেন। অতঃপর তিনি হাত নামালেন এবং সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই যোহরের নামায পড়ে আসেন এবং মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বললেন, সবাই নামায পড়ে আসো, আমার নিকটে কারো থাকা লাগবে না। তখন হুযুরের মাথা পশ্চিম দিকে। হুযুর বললেন, আমার মাথার বালিশ একটু উঁচু করে দাও। অতঃপর তিনি শুয়ে যোহরের নামায পড়লেন। সবাই নামায পড়ে এল। হুযুর বললেন, আমার মাথাটা একটু ডান দিকে কাত করে দাও এবং সাথে সাথে নিজেই ডান দিকে মুখটা কাত করে নিলেন এবং স্পষ্টভাবে পড়তে আরম্ভ করলেনঃ "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী অরহামনী অ-আল-হিকনী বিররফিকিল আ'লা।' আ'লা শব্দটি বলার সাথে সাথে চক্ষু বন্ধ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ঐ দিনটি ছিলো ২১ শে জানুয়ারী ১৯৬৯, বেলা ২.৩০ মিনিট। মৃত্যুর বহু পূর্ব হতেই হুযুর বিভিন্ন নবী আলাইহি ওসাল্লামগণ মৃত্যুকালে যে দোয়া পড়েছেন ঐসব দোয়া শুনতেন এবং পড়তেন। সর্বশেষ যে দোয়াটি পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এই দোয়াটিই রাসূলে মাকবুল (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে পড়েছিলেন। "ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাহি রাজেউন।"

সারাদেশে খবর হলে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নামে। পরের দিন ১১ টায় জানাযার সময় ঠিক হলো কিন্তু জনতার চাপে এক ঘন্টা পূর্বেই বেলা ১০ ঘটিকায় গওহরডাঙ্গার মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ ছাহেবের ইমামতিতে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে আসরের নামাযের পর অনেক বেড়া দেয়ে লাশ মোবারক কবরে রাখা হলো। তখন কবর থেকে অপূর্ব জান্নাতী ঘ্রাণ বের হতে লাগল। এ ঘ্রাণ কয়েক মাস ছিল। পরে লোকে কবর থেকে মাটি নিয়ে রোগ মুক্তির সন্ধান পেল। তাও অনেক চেষ্টা করে দেওয়াল দিয়ে পাহারাদার নিয়োজিত করে বন্ধ করা হয়।

ইন্তেকালের পূর্বে এ মহান সমাজ সংস্কারক জাতির উদ্দেশ্যে যে, মূল্যবান অছিয়ত করে গেছেন, সেটার গুরুত্ব অনুধাবন করে পাঠকের খেদমতে আমরা তা তুলে ধরলাম-

অছিয়ত নামা

১। আমি চিরন্তন আল্লাহকে এক জানিয়াছি। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক মানি নাই। পীর বা পয়গম্বর, দেবতা বা অবতার কাউকে কখনও আল্লাহর শরীক জানি নাই। মানুষের পূজা পাইবার যোগ্য এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে জানি নাই। সম্পদ দানকারী, বিপদ হরণকারী, মকছুদ-মুরাদ পূর্ণকারী, মানুষের জীবনের কাম্য, লক্ষ্য, আরাধ্য, পূজনীয়, মানুষের উপর হুজুম জারী করিবার অধিকারী এক আল্লাহকে জানিয়াছি- তাছাড়া অন্য কাউকে জানি নাই। হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (ছাঃ)-কে আমি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়গম্বর মানিয়াছি। তাঁর পরে আর কোন নূতন পয়গম্বর আসে নাই এবং আসিবে না। কেয়ামত পর্যন্ত মোহাম্মাদুর রছুলুল্লার আদর্শ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও কোন আদর্শকে আমি গ্রহণযোগ্য মানি নাই, চাই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হউক, চাই আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হউক, চাই অর্থনৈতিক ব্যাপারে হউক, চাই সমাজ-নৈতিক ব্যাপারে।

কেয়ামতের পুনর্জীবিত হওয়াকে, হিসাব-নিকাশকে, বেহেশত-দোজখকে আমি অকাট্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছি। ইহাই আমার অছিয়ত। ইহাই পালন করিতে হইবে সারাজীবন। ইহাই প্রচার করিতে হইবে সারাজীবন। ইহাই সত্য। এই সত্যের জন্য জীবনকে তুচ্ছ মনে করিয়া দরকার হইলে মরণকেও বরণ করিতে হইবে।

২। তকদীরও আমি বিশ্বাস করিয়াছি, তদবীরও বিশ্বাস করিয়াছি কিন্তু তকদীরের অর্থ এ নয় যে, মানুষের কিছু করিতে হইবে না, বা মানুষকে ক্ষমতাহীন করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে- অর্থ এই যে, সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ, সর্বজ্ঞ এক আল্লাহ। আল্লাহ মানুষকে অনেক ক্ষমতা এবং অনেক জ্ঞানের অধিকার দান করিয়াছেন- সে এত অনেক যে, প্রায় সীমাহীন বলিলে চলে- মানুষের সেই ক্ষমতা খাটাইয়া স্বীয় জীবনের উন্নতি সাধন করিতে হইবে- ইহাকেই বলে তদবীর। যে তদবীর-চেষ্টা না করিবে, সে খোদার হুকুম লংঘনকারী হইবে। যে তদবীরকে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে, অনুভূতিকে, কর্মশক্তিকে, ইচ্ছাশক্তিকে কুপথে পরিচালিত করিবে সে আল্লাহর কাছে দায়ী হইবে এবং পাপের শাস্তি ভোগ করিবে। যে তদবীরকে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিকে, কর্ম শক্তিকে সুপথে পরিচালিত করিবে সে খোদার নিকট পেয়ারা হইবে এবং পুরস্কার পাইবে। আমি এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছি এবং

এইরূপ বিশ্বাস লোককে করিতে অছিয়ত করিতেছি। খবরদার! খবরদার!! তদবীর ছাড়িবে না। ইহ-সংসারের কাজেও না পরলোকের কাজেও না! খবরদার! খবরদার!! আল্লাহর সর্বশক্তিমানত্বকে, সর্বজ্ঞত্বকে অবিশ্বাস করিবে না- ইহারই নাম তকদীর। অদৃষ্টবাদ আর তকদীর এক না। অদৃষ্টবাদে মানুষকে অর্কমা, অলস, অক্ষম করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে, তকদীর অর্থাৎ আল্লাহর সর্বশক্তিমানত্বে এবং মানুষের বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তির অধিকারী হওয়ার বিশ্বাসে, মানুষকে যেহেতু তাহার সীমাবদ্ধ শক্তিকে সর্বক্তিমানের অসীম শক্তির সহিত যোগ করিয়া দিতে শিখায়, কাজেই তাকে সৎসাহসী কর্মী এবং উৎসাহী করিয়া তোলে।

৩। আল্লাহ একটুও মন্দ নয়, এক বিন্দুও নয়, শুধু ভাল, সম্পূর্ণ ভাল। পূর্ণ ভাল যে না হবে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র মন্দ থাকবে বা পূর্ণ ভাল না হবে সে খোদা হওয়ার যোগ্য নয়। এই জন্যই যেহেতু, এক আল্লাহই পূর্ণ ভাল, শুধুই ভাল, বিন্দুমাত্র মন্দ আল্লাহর মধ্যে নাই, আল্লাহর পূর্ণত্বে, ভালত্বে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই, সে জন্যই এক আল্লাহই মানুষের খোদা অর্থাৎ পূজার যোগ্য, তাছাড়া অন্য কেউ পূজার যোগ্য নাই। আল্লাহ সমালোচনার উর্ধ্বে, আল্লাহর কার্য সমালোচনার উর্ধ্বে, আল্লাহর বাণী সমালোচনার উর্ধ্বে। আল্লাহ সম্পূর্ণ ন্যায়, বিন্দুমাত্র অন্যায় বা অত্যাচার আল্লাহর মধ্যে নাই। আল্লাহ সত্য, বিন্দুমাত্র মিথ্যা আল্লাহর মধ্যে নাই। আল্লাহ পূর্ণ দয়ালু-দয়াময়, বিন্দুমাত্র নিষ্ঠুরতা-নির্দয়তা আল্লাহর মধ্যে নাই। এই যা কিছু বললাম এর চেয়েও উর্ধ্বে আল্লাহ। যা কিছু কল্পনা করতে পারি আমরা, তার চেয়েও উর্ধ্বে আল্লাহ, এক আল্লাহই আমার প্রেমপাত্র, বড় হতে বড় আল্লাহ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি ঃ ভাল হতে ভাল আল্লাহ, মন্দ হতে মন্দ আমি। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য যাকে যতটুকু ভালবাসার আল্লাহ হুকুম করেছেন, ততটুকু ভালবেসেছি আমি। কিন্তু আসল ভালবাসা আমার এক আল্লাহর সঙ্গে-ইহাই আমার অছিয়ত।

৪। আল্লাহর রাসূল সমালোচনার উর্ধ্বে, আল্লাহর রাসূলের কার্যকলাপ সমালোচনার উর্ধ্বে। আল্লাহর রাসূলের বাণী ও আল্লাহর ওহী, সমালোচনার উর্ধ্বে অবশ্যি কোরানের ওহীকে শব্দে শব্দে যখন তখন লিখিয়া লওয়া হইয়াছে এবং শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোকের মুখস্থ হইয়া আমাদের নিকট লিখিত ও মুখস্থভাবে পৌঁছিয়াছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু রাসূলের বাণী হাদীছের ওহী সবগুলোকে যখন তখন লেখা হয় নাই বা সবগুলোকে শব্দে শব্দেও মুখস্ত করা হয় নাই কিন্তু কোরানের পরে যথাসম্ভব গুরুত্ব হাদীছের ওহীকে দেওয়া হইয়াছে। এমনকি ইঞ্জিল, তাওরাতের ওহীকেও অতদূর গুরুত্ব তৎকালীন ঈছায়ী

লোকেরা দেয় নাই, যতদূর গুরুত্ব হাদীছের ওহীকে উম্মতে মোহাম্মাদীর লোকেরা দিয়াছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের গুপ্ত এবং প্রকাশ্য শত্রুরা চিরকালই ষড়যন্ত্র করিয়াছে কিন্তু সে ষড়যন্ত্র যাবৎ না ইসলাম পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাবত কামিয়াবী হাসিল করিতে পারে নাই। অবশ্যি আমরা যখন অলসতা এবং বিলাসিতায় গা-ঢালা দিয়া পড়িয়াছি তখন অবশ্য শত্রুদের ষড়যন্ত্র আমাদের মধ্যে ক্রিয়া করিতে পারিয়াছে, তখন আমরা নিজেরাই নিজেদের এবং ইসলামের ক্ষতি করিয়াছি, শত্রুদের চেয়েও বেশী। শত্রুরা অনেক কৃত্রিম কথাকে ধারাবাহিক কৃত্রিম সূত্র গঠন করিয়া এমনকি ছাহাবা তাবেয়ীনদের নাম লাগাইয়া হাদীছ বলিয়া চালু করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মাদীর মধ্যে এমন এমন কৃতি মহাপুরুষ, মোহাদ্দেছ, ইমাম পয়দা ইহয়াছেন যে, তাঁহারা সমস্ত কৃত্রিম কথা ও সনদগুলোকে বাছিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। পানিকে পানি, দুধকে দুধ, তাঁহারা প্রমাণ করিয়া তাওরাত, ইঞ্জিলের চেয়ে শতগুণে দৃঢ় সনদের উপর ভিত্তি করিয়া সিহাহ ছিত্তাহ হাদীছ তাঁহারা সংকলন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ছহীহ বোখারী শরীফ, ছহীহ মুসলিম শরীফ, নাছায়ী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ এবং মোয়াত্তা ইমাম মালেক এমন সাতখানি হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে জাহেরী শরীয়তের ইমামগণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক আইন-শৃংখলাগুলোকে এবং কোরআন হাদীসের অর্থগুলোকে এবং বাতেনী তরীকতের ইমামগণ অধ্যাত্মিক ও নৈতিক অর্থগুলোকে কোরআন হাদীছ মন্থন করিয়া উভয়ের সামঞ্জস্য দেখাইয়া এত মজবুতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহাদের সমসাময়িক সমতুল্য বিদ্বানগণও শতের মধ্যে এক জায়গায় নয়, সহস্রের মধ্যে এক জায়গায় হয়ত সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং তাঁহারা সমালোচনা করিয়া বিষয়গুলোকে আরও অধিকতর মজবুত করিয়া দিয়াছেন।

সুতরাং আমি ইসলাম সমুদ্রকে, জগতের জাতিনিচয়ের ও ধর্মসমূহের ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম গ্রন্থাবলীকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, যেরূপ হযরতের আহলে-বায়েত স্ত্রী, কন্যা, জামাতা, নাতীগন এবং আছহাবগণ সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চান নাই বা সত্যের সামনে নিজের জীবনের মায়া করেন নাই এবং যতটা এই সত্য ত্যাগ ও সাধনা, তাঁহারা স্বীয় জীবনে কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্বে বা পরে আর কেহই জগতে তদ্রুপ পারে নাই। এইজন্য তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাদের সমসাময়িক সমতুল্যদের সমালোচনার যোগ্য হইলেও নিম্নস্তরের

তাঁহাদের সমালোচনা করা অনধিকার চর্চা বৈ কিছুই নয়। এইরূপে পরবর্তী ইমাম মোহাদ্দেছগণের সমালোচনা শুধু তাঁহারাই করিবার অধিকারী যাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় ত্যাগ, সততা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তদ্ব্যতিরেকে অন্য কাহারও তাঁহাদের সমালোচনা করা ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নয়। আমি এই কথা কয়টি এই জন্য বলিতেছি যে, আখেরী জামানাতে এমন লোক পয়দা হবে বা হয়েছে যারা হযরত ওসমানের, হযরত আয়েশার, হযরত আলীর বা হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) সমালোচনা করিবে। খবরদার! তাদের ধোকায় কেহ পড়িবেন না। আমি হযরত ওসমানকে, হযরত আলীকে, হযরত মোয়াবিয়াকে সকলকে সম্মান করিয়াছি এবং সবকে সম্মান করার অছিয়ত করিতেছি। হযরত ওসমান ইসলামের বিরুদ্ধে আত্মীয়দের রিয়ায়েত করেন নাই। হযরত মোয়াবিয়া ইসলামের ক্ষতির জন্য বা ইসলামের ইসলামী গণতন্ত্রকে বাতিল করিবার বেদায়াত-রাজতন্ত্র জারী করিবার উদ্দেশ্যে ইয়াজিদের জন্য অছিয়ত করেন নাই। তাঁর নজরে তিনি অন্য কাউকে যোগ্যতর পান নাই। এইরূপে মোহাদ্দেছগণকে বিশেষ করে ইমাম বোখারীকে, আয়েম্মায়ে মোজতাহেদীনকে, আয়েম্মায়ে তরীকতকে আমি ভক্তি করিয়াছি, মান্য করিয়াছি এবং তদ্রূপই আমি অছিয়ত করিতেছি। তাঁহাদের ঋণ আমরা পরিশোধ করিতে পারিব না। একজন মুসলমান নামধারী, মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণকারী এমন পয়দা হইয়াছে এবং আরও হইবে যে, তারা ধর্মের স্তম্ভগুলোকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া "ধর্মের অট্টালিকাকে রক্ষা করিতেছি" ধর্মের বাহকদেরে কতল করিয়া "ধর্ম মানিতেছি" বলিয়া দাবী করিবে এবং ইমামগণের, মোহাদ্দেছগণের, আলেমগণের, পীর-মাশায়েখগণের সমালোচনা করিবে। খবরদার! তাদের ধোকায় পড়িবে না। আবার তাহারা একদল অযোগ্য লোককে পীর সাজাইয়া, আলেম সাজাইয়া, এমন কি নবী ও মোহাদ্দেছ সাজাইয়া পেশ করিবে। তাদের নৈতিক দূর্বলতা এবং জ্ঞানের দূর্বলতা, ধর্মের দূর্বলতা, কর্মের দূর্বলতাগুলোকে সত্যিকার আলেম ইমামগণের উপরে চাপাইয়া সত্যিকার আলেমদের, ইমামদের থেকে বদ-এ'তেকাদ করিতে চাহিবে। খবরদার! এই শ্রেণীর ধোকা থেকে বাঁচিয়া থাকিবে। আখেরী জামানা-দাজ্জালী ধোকা-ফেরেবের জামানা।

আমি হযরত ওসমান থেকে এই উপদেশ লাভ করিয়াছি যে, নিজের জীবন দিয়াও ইসলামের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। হযরত আয়েশার থেকে এই উপদেশ লাভ করিয়াছি যে, মিথ্যা দোষারোপের পরোয়া না করিয়া নিজের চরিত্রকে পবিত্র রাখিতে হইবে, মজলুমের ইনছাফের জন্য খাড়া হইতে হইবে এবং বুঝের ভুল হইলে ভুলের উপর জিদ না করিয়া যখন বুঝে আসিবে তখনই ভুল

স্বীকার করিয়া তওবা এস্তেগফার করিতে হইবে। হযরত আলীর থেকে এই উপদেশ লাভ করিয়াছি যে, মতবিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু মতবিরোধের কারণে বা যুদ্ধের কারণে যার যে মর্যাদা আছে, তার সে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না– তার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। যেমন, হযরত আলী যুদ্ধক্ষেত্রেও হযরত আয়েশার যোগ্য মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। হযরত আলীর মর্তবা, হযরত মোয়াবিয়ার তুলনাতে এত উর্ধ্বে ছিল যে, হযরত আলী প্রথম অবস্থায় সন্ধির কল্পনাও করিতে পারেন নাই, শেষ অবস্থায় সন্ধির ইচ্ছা করিয়াছেন কিন্তু স্বীয় জীবনে পুরা করিয়া যাইতে পারেন নাই। হযরত হাসান সে সন্ধি কাজে পরিণত করিয়া নিজে হার মানিয়া কওমের যুদ্ধ বিগ্রহের সমাপ্তি করিয়াছেন। হযরত হোসাইন হকের জন্য, ইসলামী নেযাম কায়েম করার জন্য জীবন দিয়াছেন। আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন, আমরাও যেন হকের সামনে জীবনের মায়া না করি। হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত হোসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবয়ের প্রমুখ মোছাল্লাম বুযুর্গানে যখন শত্রুর হাতে শহীদ হইয়াছেন তখন আমরা শত্রুর হাতে জীবন যাওয়াকেই বা অপমান মনে করিব কেন? আর জীবনেরই বা মায়া করিব কেন? পরবর্তী ইমামগণও মুসলমান নামধারী শত্রুদের দ্বারা নির্যাতিত হইয়াছেন কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হককে, সত্যকে ছাড়েন নাই। ইহাই আমার অছিয়ত। যদি কেহ ইমামগণের বা হযরত মোয়াবিয়ার সমালোচনা করিতে চান তবে আগে হযরত মোয়াবিয়া ইসলামের জন্য যা কিছু করিয়া গিয়াছেন; ইমামগণ যে সাধনা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ততটুকু গুণ অর্জন করিয়া তারপর যেন সমালোচনা করেন। অন্যথায় অনধিকার চর্চা করিয়া নিজের বাতুলতার পরিচয় দিবেন না। রোম সম্রাট যখন হযরত আলীর বিরুদ্ধে হযরত মোয়াবিয়াকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল, হযরত মোয়াবিয়া তখন কি উত্তর দিয়াছিলেন? স্মরণ করুন! হযরত মোয়াবিয়া রোম সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যে সব দেশ জয় করিয়াছিলেন আজ সমালোচকগণ সেই সব দেশ রক্ষাও ত করিতে পারিতেছেন না! কোন মুখে সমালোচনা করেন? শরম লাগে না? মোটকথা, সমালোচনা করিতে হইলে আগে সমতুল্য হউন, তারপর সমালোচনা করুন। অন্যথায় সমালোচনা হইবে অনধিকার চর্চা এবং বাতুলতা।

৫। আমি তকলীদও মানিয়াছি, এজতেহাদও মানিয়াছি। তকলীদ মানিয়াছি কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস মানি নাই। তাহ্কীক করিয়া যাঁহাকে আল্লাহ ও রাসূলের জ্ঞানে, প্রেমে, বুদ্ধিতে এবং এত্তেবা ও এনাবাতে উপযুক্ত পাইয়াছি তাঁহার তকলীদ

মানিয়াছি এবং এজতেহাদকে কেয়ামত পর্যন্ত জারী-জীবন্ত মানিয়াছি, কিন্তু এজতেহাদের জন্য শর্ত এই যে, পূর্ববর্তী সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে এবং কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তির উপর এজতেহাদ করিতে হইবে। এজমাকেও আমি মানিয়াছি এবং কেয়ামত পর্যন্ত জারী জীবন্ত মানিয়াছি, কিন্তু শর্ত এই যে, এজমায়ে-লাহেক, এজমায়ে ছাবেকের খেলাপ না হয়। দলিল, যে আয়াতের দ্বারা এজমা ছাবেত হয় সেই আয়াতই।

৬। আমি তরীকত ও তাছাওওফকে মানিয়াছি। কিন্তু শরীয়তের অর্থাৎ কুরআন হাদীছের খেলাফ কোন তরীকতকে আমি মানি নাই। তরীকত অর্থাৎ শরীয়তের আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক দিক এবং আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করা কিন্তু শরীয়তের সীমার ভিতর থাকিয়া।

৭। আমি হানাফী। কিন্তু একতঃ কুরআন-হাদীসের হাওয়ালা দিয়া চলেছে অন্যান্য যে সব মাজহাব যেমন- শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী এমনকি আহলে হাদীছ। তাঁহাদের সবকেই আমি এহতেরাম করেছি। যেহেতু, তাঁহারা কেহই এত্তেবায়ে-হাওয়া করেন নাই- সকলেই এত্তেবায়ে-হুদা করেছেন। এই এখতেলাফকে আমি এলেমের তারাক্কী মনে করেছি, ইহাকে শেক্কাক বা তাফ্‌রীকে উম্মতে মরহুমাহ্ বলার আমি পক্ষপাতি নই। দ্বিতীয়তঃ আমি শুধু অন্যান্য ইমামগণের জবানী এহ্‌তেরামই করি নাই বরং তাঁহাদের উসূলকে আমি মোতালাও করেছি, অন্যান্য ভাইদেরকেও মোতায়ালা করার জন্য অছিয়ত করি। শুধু মোতায়ালাই করি নাই বরং তাঁদের ছহীহ্ হাদীস অনুসারে যে জিনিসগুলো আমার জওক্কে আমি পছন্দ করেছি তাহা আমি গ্রহণও করেছি আমলও করেছি- আমল করাকে আমি হানাফিয়াতের খেলাফ মনে করি নাই- যেমন, আমি ছুরা ফাতেহা পড়াকে সকলের জন্য ওয়াজেব মনে করি। অবশ্য ইমাম যখন উচ্চস্বরে পড়েন, তখন মোক্তাদি শুধু চিন্তা দ্বারা দেলের খেয়ালের দ্বারা পড়িবে। ইমাম যখন চুপে চুপে পড়েন তখনও দেলের ধ্যানের দ্বারাই পড়িবে কিন্তু অনিচ্ছাকৃত কিছু জবানী তালাফ্‌ফুজ, মুখনিঃসৃত হইয়া গেলেও তাহা হারাম হইবে না। ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি এইরূপ ধ্যানকে কোথাও হারাম বলেন নাই। এইরূপ, আমীন যদি একটু আওয়াজের সহিত কেহ বলিয়া ফেলে তবে তাহাতে, তাহার হানাফিয়াত টুটিয়া যাইবে না বা রুকু হইতে উঠিয়া কেহ একটু আওয়াজ করিয়া "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ, হামদান কাছীরান তবিবাম্মুবারাকান ফি-হ্" বলিয়া ফেলে বা দুই সিজদার মাঝখানে "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি, অরহামনী, অহ্‌দিনী, অ-আফিনী, অরঝুক্‌নী" বলে, তবে তাহাতে হানাফিয়াত টুটিয়া যাইবে না বরং

বলা উচিৎ, তাহাতে হানাফিয়াত আরও মজবুত হইবে। এইভাবে আমি কত্‌য়ে-নেঝাকে পছন্দ করিয়াছি। এইরূপে আমি চিশ্‌তিয়া তরিকায় আমল করিয়াছি কিন্তু অন্যান্য বুযুর্গানের তরীকাকে আমি অত্যন্ত এহ্‌তেরাম করিয়াছি। একদল লোক চিশ্‌তীয়া তরীকার জন্য গান-বাদ্য, নর্তক-কুর্দ্দনকে লাঝেমী বা চিশ্‌তীয়া তরীকার তা'লীম বলিয়া মনে করে আবার একদল লোক নক্‌শ্‌বন্দিয়া তরীকার জন্য পীরের ধ্যানকে লাঝেমী বা নক্‌শবন্দিয়া তরীকার তা'লীম বলিয়া মনে করে- আমি এই উভয়কেই গলত মনে করি। অবশ্যি এলাজের জন্য অর্থাৎ খোদা রাসূলের এশ্‌কের জজ্‌বা পয়দা করার জন্য বাদ্যবিহীন ইসলামী গজল বা সাময়িকভাবে অছ্‌অছা দূর করার জন্য পীরের খেয়ালকে আমি না-জায়েজ মনে করি না- ইহারই অন্তর্গত আমি মনে করি। এইরূপে রাসূলের এশ্‌কে মত্ত হইয়া খাড়া হইয়া বা বসিয়া গজল বা কাছিদা পড়াকে, মওলুদ শরীফ পড়া-পড়ানকে আমি শুধু জায়েজ মনে করি না বরং অত্যন্ত জরুরী মনে করি। কেননা এই অছিলায়ই সাধারণ লোকে হযরতের জন্মবৃত্তান্ত, জীবন বৃত্তান্ত, সত্য ধর্মের জন্য কষ্ট সহ্য বৃত্তান্ত এবং রাসূলের অন্যান্য গুণাবলী, কার্যাবলী, ছানা-ছেফাত, মো'জেজাত জানিয়া রাসূলের পরিচয় পাইয়া রাসূলকে এবং রাসূলের তরীকাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতে শিখিবে। তবে মুর্শেদী কাওয়ালী ইত্যাদির নামে গান বাদ্যের ব্যবসাকে, মৌলুদ, জেয়ারতের ব্যবসাকে অর্থাৎ এইসব কাজ করিয়া পয়সা উপার্জন করাকে এবং পয়সা উপার্জনের জন্য এইসব কাজ করাকে আমি হারাম মনে করিয়াছি। নাচ-নৃত্যকে আমি সর্বাবস্থায় হারাম মনে করিয়াছি, বাদ্যকেও সর্বাবস্থায় হারাম মনে করিয়াছি যদিও উহা আল্লাহর জিকিরের নামে হয়। শুধু যুদ্ধের বা ঘোষণার জন্য মোটা বাদ্য ঢোল-তবলের বাদ্য হারাম নয়। চিকন বাদ্য-হারমোনিয়াম সেতারা, দোতারা, বেহালা ইত্যাদির বাদ্য কোন অবস্থায়ই জায়েজ নাই। এইরূপে স্বামী যদি নির্জনে বিনা বাদ্যে বিনা নেশাপানে নিজের স্ত্রীর নাচ দেখে বা নির্জনে বিনা নেশাপানে নিজের স্বামীকে নাচ দেখায় তবে তাহাও হারাম নহে। আল্লাহ রাসূলের প্রেমের প্রেরণা, ইসলাম ধর্ম ও জেহাদের প্রেরণা বা ইসলামের শত্রুদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় যে কবিতা, গজল, তারানা বা সাহিত্য রচনার দ্বারা তাহা ইসলামে নিষিদ্ধ নহে। আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত জরুরী মনে করি মাজহাব মানিয়া চলাকে, একটি মাজহাব ধরিয়া চলাকে এবং জেন্দা একজন সাচ্চা বে-গরজ, মোত্তানাদ, কামেল-মোকাম্মেল নায়েবে রাসূল, শায়েখ ধরিয়া আল্লাহর মুরীদ, আল্লাহর আশেক হইয়া জাহের বাতেন ইল্‌ম ও আমলের তরবিয়ত লইয়া তাঁহার ছোহ্‌বত ও

উপদেশ লইয়া চিরজীবন মোজাহাদার জীবন যাপন করাকে। বিনা মোজাহাদায়, বিনা ছোহ্‌বতে হাজার বড় আলেম, হাজার বড় বিদ্যান হইলেও অন্তরচক্ষু খুলে না- আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। অবশ্যি শরীয়ত অ-প্রামান্য গায়রে মানছুছ জিনিসের রছম ভাল নয়। গায়রে মোহাক্কেক শায়েখ ধরা উচিত নয়।

৮। আমি, "তাফ্‌রিক বাইনাল মু'মিনীন" অর্থাৎ মোমেনদের এত্তেহাদ একতা ভঙ্গকরণকে এত বড় হারাম এবং "বিফাক বাইনাল মু'মিনীন" অর্থাৎ মোমেনদের মধ্যের জোড়-মিল মহব্বত রক্ষা করণকে এত বড় মনে করিয়াছি যে, মাশায়েখদের মাছালেক, আছাতেজাদের তাকরীর এমনকি ইমামগণের মাজাহেবকেও আমি এর চেয়ে অনেক নীচে মনে করি। কিন্তু কুরআন হাদীছের খেলাফকে কিছুতেই কোন মূল্যেই বরদাশ্‌ত করিতে পারি না। দুইটি মাজহাব বা দুইজন ইমাম হইলে তাঁহাদের পরস্পর বিরোধীতা করিতেই হইবে, ইহার ক্বায়েল, (কথক) আমি নই; এইরূপে দুইজন আলেম বা দুইজন পীর হইলেই তাঁহাদের পরস্পর বিরুদ্ধাবাদী দুইটি দল করিতেই হইবে ইহারও পক্ষপাতী আমি নই। ইমামগণ, আল্লাহ ও রাসূলের বাণী উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাতে হয়ত কেউ কত দূর, কেউ কতদূর পৌছিয়াছেন- সকলেরই মকছুদ একই কিন্তু কেউ ইচ্ছা করিয়া কাহারও বিরোধীতা বা উম্মতের ফেরকাবন্দী তাঁহারা করিয়া যান নাই বা তাঁহারা প্রেরণা বা অনুমতি দিয়া যান নাই। এইরূপে, যত পীর এবং যত আলেম আছেন, সকলেরই একই মকছুদ হওয়া উচিৎ যে, আমরা কেহই আমার বান্দা বা আমার উম্মত বানাইতেছি না বা আমার একটি বিরোধী দল সাজাইতেছি না। সকলেরই একই মকছুদ যে, মানুষ এক আল্লাহর বান্দা, এক নবীর উম্মত হউক, সব মোমেন-মোসলমান ভাই ভাই হউক। অবশ্যি যাহারা আল্লাহকে, আল্লাহর রাসূলকে, আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীস না মানে, সকলে একতাবদ্ধ হইয়া তাদের বিরুদ্ধাচারণ করিতে হইবে এবং সেই বিরুদ্ধাচারণও হবে হকের জয়ের জন্য, সত্য ও ন্যায় ধর্মের জয়ের জন্য- নিজের স্বার্থ বা মানুষের নিপীড়ণের জন্য নয়। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে যুদ্ধংদেহী বা বিরোধীতার জয্‌বা আছে তাহা ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় খরচ হইবে- ইসলাম ভক্তদের মোকাবেলায় নয় এবং ঐ শক্তিও খর্ব হইয়া যাইবে না।

৯। ইংরেজ কাফেরগণ, ইসলাম ও মুসলিম জাতির যত ক্ষতি করিয়াছে এবং করিতেছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বুনিয়াদী ক্ষতি এই করিয়াছে যে, তারা 'ধর্মহীন শিক্ষার ধারা' আমাদের দ্বারা গ্রহণ করাইতে পারিয়াছে। ইংরেজ কাফের বলতে আমি আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া- সব নাছারা ধর্মহীন এবং

ধর্মদ্রোহীদেরে বুঝাইতেছি। কারণ শিক্ষার দ্বারাই মানুষের মন-মস্তিষ্ক তৈরী হয় এবং মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ মন-মস্তিষ্কেরই অনুসারী হয়। ধর্মহীনতার পরিণাম ধর্মদ্রোহীতা। সুতরাং ধর্মহীন শিক্ষা জারী করিয়া বিরাট বিরাট সংখ্যক মুসলিম সন্তানকে বিনা রক্তপাতে তারা শুধু ইসলামহীন, ধর্মহীন করে নাই, ইসলামদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী করিয়া লইয়া গিয়াছে। বহু সংখ্যক মুসলিম সন্তানের মন মস্তিষ্ক আজ তাদেরই রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া নিজস্ব সত্তা ভুলিয়া গিয়া Inferiority complex এর শিকার হইয়া তাদেরই বুলি বলিতেছে। এই সর্বনাশা রোগের প্রতিকার Direct attact এর দ্বারা অসম্ভব বলিয়া পক্ষপাতি, তাছাড়া অন্য কোন শিক্ষা ধারার পক্ষপাতী নই। কিন্তু দরছে নেজামীর হাকীকত আজকাল লোকেরা বুঝিতেছে না। পুরান জামানার একটি শখ্ছিয়াতকে হাকীকত মনে করিতেছে। দরছে নেজামীর হাকীকত এই যে, শুধু 'মা'কুলাত' অর্থাৎ যুক্তি ও তর্কশাস্ত্র বা জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শুধু 'মানকুলাত' অর্থাৎ কুরআন হাদীস পড়ান উচিত নয় বরং মানকুলাত এবং মা'কুলাত একত্রে পড়ান উচিত। কারণ "মানকুলাতের উদ্দেশ্য, আল্লাহ যা বলিয়াছেন এবং রাসূল যা বলিয়া, করিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন সেইটাকে ভালমত বুঝিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে, মা'কুলাতের অর্থ- এমন সব বিদ্যা পড়িতে, পড়াইতে হইবে। যদ্দারা মানুষের আকল বাড়ে, নতুন নতুন আবিষ্কার করিতে পারে। মানকুলাত, স্থিতিশীল এবং সত্য ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ভিত্তিক। মা'কুলাত প্রগতিশীল এবং যুক্তিভিত্তিক। সত্য-ভক্তি, অটল বিশ্বাস ব্যতিরেকে যেমন, শুধু যুক্তিতে কোন একটি কাজও সাধিত হয় না বরং শুধু যুক্তি অনেক সময় মানুষকে বিপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ, যুক্তি না থাকিলেও মানুষ অনেক সময় অন্ধ বিশ্বাসে এবং অসত্য ভক্তিতে পতিত হইয়া গোমরাহ হয়। কাজেই যুক্তি এবং ভক্তি- মানকুলাত ও মা'কুলাত একত্রেই দরকার। অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে, মানকুলাতের অর্থ, আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীসের সরাসরি অর্থ এবং সূক্ষ্মতত্ত্বের বাইরে নয়। সূক্ষ্মতত্ত্বও, যে সব আয়েম্মায়ে এজাম, ছুফিয়ায়ে কেরাম বাহির করিয়াছেন- যা তা মনগড়া বাজে গল্প বিশ্বাস করা যাইবে না, যাকে তাকে ভক্তি করা যাইবে না। মা'কুলাতের কোন সীমা নাই-জামানা যেমন বাড়িতে থাকিবে, মা'কুলাতও তেমন বাড়িতে থাকিবে- যদ্দারা আকল বাড়ে। তারিখ, ইতিহাস, জিওগ্রাফি, অংক, জ্যামিতি, এ্যালজ্যাবরা, বৃক্ষ-বিজ্ঞান, পশু-বিজ্ঞান, শাসন পদ্ধতি, বিচারপদ্ধতি, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, সমাজনৈতিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান, আরও না জানি কত বিজ্ঞান আবিষ্কার হয়-

এইসব দ্বারাই আকল বাড়ে। যার দ্বারা যতটা সম্ভব শিক্ষা করা দরকার' এবং এইসব বিজ্ঞান যেন আল্লাহর মারেফত বাড়ায়, আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের দ্বার উদঘাটন করে এবং আল্লাহরই অধীনতা স্বীকার করায়, সমস্ত বিজ্ঞানের মুখ সেই দিকেই ফিরাইতে হইবে। খোদামুখী বিজ্ঞানই বিজ্ঞান। নাস্তিকতার বিজ্ঞান, বিজ্ঞান নয়, ধৃষ্টতা ও অন্ধতার বই আর কিছুই নয়। কাজেই হাদীস ও কোরআনের আলোর দ্বারা সমস্ত মা'কুলাতকে- যুক্তিতর্কশাস্ত্র, সাধারণ বিজ্ঞানকে আলোকিত করিতে হইবে এবং হাল ধরিয়া রাখিতে হইবে। কাজেই দরছে নেজামীই একমাত্র ঔষধ।

১০। আমি প্রত্যেক মুসলমান ভাইকে, বিশেষ করে যাহারা আমার ওয়াস্তায় আল্লাহর দ্বীনকে, নবীর তরীকাকে পেয়ে আল্লাহর মুরীদ হয়ে আল্লাহকে পেতে চেয়েছে তাদের আমি অছিয়ত করিতেছি- ছেলে মেয়ে আল্লাহর আমানত। এই আমানতে খেয়ানত করবেন না। ছেলে মেয়ে হলে প্রথমতঃ ডাইন কানে আজান বাম কানে একামত বলিবেন তারপর কোন বুযুর্গ আলেমের দ্বারা 'তাহনীক' করাইবেন অর্থাৎ কিছু খোরমা তাঁহার দ্বারা চিবাইয়া তাহার লালা বিছমিল্লাহি বরকত বলিয়া ছেলের মুখে দিবেন। তারপর সপ্তম দিবসে কোন বুযুর্গ আলেমের দ্বারা ভাল নাম রাখিবেন এবং আক্বীকা করিবেন। তারপর স্নেহের সহিত, মমতা ও ভালবাসার সহিত ছেলে লালন-পালন করিবেন। ছেলের স্বাস্থ্যের দিকে এবং চরিত্রের দিকে খুব দৃষ্টি রাখিবেন। ছেলেকে ভালাবাসাও একটি তায়াত- নেকী মনে করিবেন। তারপর যখন ছেলে-মেয়েরা কথা বলতে শেখে তখন আল্লাহ্, আল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ ইত্যাদি মা, নানী, বাপ, ভাই, দাদা-দাদী সবাই তাদেরকে শুনাইয়া শুনাইয়া বার বার জেকের করিবে তাতেই ছেলেমেয়েরা বলা শিখিবে এবং তাহাদের মনে গাথিয়া যাইবে। তারপর ছেলে মেয়ে যখন পাঁচ বৎসরের হয় তখন কোন বুযুর্গ আলেমের কাছে দিয়া আলিফ, বা, তা, ছা, পড়া ও লেখা শিখাইবে। এই সময় ছেলে মেয়ের খুশীর জন্য এবং দোয়া পাওয়ার জন্য তাওফীক মোতাবেক কিছু মিষ্টি মুখ করিয়া দিবে। পরে কোন নেক চরিত্র মেহেরবান ওস্তাদের কাছে পড়িতে দিবে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে অবশ্য অবশ্য কায়দা, ছেপারা, কুরআন শরীফ লইয়া এক দেড় ঘন্টা মসজিদে-মক্তবে পড়িতে যাইবে। যদি স্কুলে পড়ে তবুও অবশ্য অবশ্য সকালে ফজরবাদ এক দেড় ঘন্টা মসজিদের মক্তবে পড়িবে নিশ্চয়ই। এইরূপে শুদ্ধ করিয়া কুরআন শরীফ পুরা পড়িবে, ওদিকে প্রাইমারী স্কুলে বাংলা, অংক শিখিবে। কিন্তু খবরদার! যে স্কুলের মাষ্টারদের চরিত্র ভাল নয়, নামায রোজা নাই-নাচ,

গান-বাদ্য, থিয়েটার হয় সেই স্কুলে হরগেজ হরগেজ ছেলে মেয়ে দিবেন না। মেয়ে ৮/৯ বৎসরের হইয়া গেলে আর স্কুলে যাইতে দিবেন না বা কোন যুবক পুরুষের কাছেও পড়িতে যাইতে দিবেন না। আর যদি ছেলেকে হাফেজ বানাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে ভাল ওস্তাদের কাছে দিবেন। হাফেজ হওয়ার পর প্রাইমারী বাংলা পড়াইবেন। এইরূপে কুরআন শরীফ পুরা বিশুদ্ধরূপে পড়া হইয়া গেলে এবং প্রাইমারী শেষ হইলে পরে যদি পুরা দরছে-নেজামী না পড়াইতে পারেন তবে অন্ততঃ এই কিতাবগুলো অবশ্য অবশ্য কোন ভাল ওস্তাদের কাছে পড়াইবেন, দরছে নেজামী পড়াইলে তবুও এই কিতাবগুলো আগে অবশ্য অবশ্য কোন ভাল ওস্তাদ দিয়া পড়াইয়া দিবেন। কুরআন শরীফের পর লাহোর আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম কৃত উর্দূ পহেলী, দুসরী, তিসরী ও চৌথী তারপর পূর্ণ বেহেশ্‌তী জেওর, অন্ততঃ রাহে নাজাত, মেফ্‌তাহুল জান্নাত। যাহারা উর্দূ না পড়িতে পারে অন্ততঃ বাংলা বেহেশ্‌তী জেওর, তালিমুদ্দিন, হায়াতুল মুসলিমীন, এলেমের ফযিলত, নামাযের ফযিলত, জেকেরের ফযিলত, কছদুচ্ছাবিল পড়িবেন ও পড়াইবেন। তারপর ফার্সী পহেলী, কারিমা, লাতায়েফে ফার্সী, পান্দেনামা-আত্তার, গুলেস্তাঁ, বোস্তাঁ, অবশ্য অবশ্য কোন ভাল ওস্তাদ দিয়া পড়াইবেন। তারপর আরবী আদবের কিতাব– রওজাতুল আদব, মুফিদুত্তলিবীন, কসাসুন্নাবিয়্যিন, ঝা-দুত্ত-লিবীন, কালয়্যূবী; নাফহাতুলয়্যমান, ছরফের কেতাব– ইলমুছ ছরফ ১ম, ২য়, ৩য়; নহোর কিতাব– নহোমীর, হেদায়েতুন্নাহো, মোস্তাদ্‌রক ইত্যাদি পুরা পড়াইয়া, ফিকহুস্‌সুনান, বুলুগুলমারামা, মাশারিকুল আনওয়ার, রিয়াজুচ্ছলিহীন অথবা মেশকাত শরীফের সাদা তরজমা 'তরকিব' ও সরলার্থ সহ এবং কোরআন শরীফের সাদা তরজমা তরকীব ও সরলার্থ সহ পড়াইয়া দিবে। তারপর ছেলে যেদিকে যাইতে পারে, এই পর্যন্ত হইলে আশা করা যায় যে, ইনশাআল্লাহ ঈমানের হেফাজতের ছামান হইয়া গেল। কেহ কেহ ধোকা দিতে পারে যে, চারটি ভাষা ছেলে কেমনে শিখিবে? কিন্তু আমি বহু অভিজ্ঞতার পর বলিতেছি যে, এই পর্যন্ত এতটুকু পড়া কোন ছেলের পক্ষেই কঠিন হইবে না। এই সঙ্গে হাতের কাজ বাংলা, অংক শিখাইতে হইবে। তারপর যদি ছেলে স্কুল-কলেজের আগুনের মধ্যে ঝাপ দেয়ও তবুও আশা করা যায় যে, সে আগুনে তাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু খবরদার! খবরদার!! মেয়ে কস্মিনকালেও স্কুল-কলেজে দিবে না। সহ-শিক্ষার স্কুল-কলেজ মেয়েদের জন্য জঘন্য ও বদ্‌তর।

১১। আমি তাবিজ ২/১ টা লিখিয়াছি বটে কিন্তু মাশ্‌গালাও করি নাই মাক্‌সাবাও বানাই নাই অর্থাৎ পেশাও করি নাই, রোজগারের পন্থাও বানাই নাই।

মোদাররেছী করিয়াছি, কোন সময় টাকা লইয়াছি, কোন সময় লই নাই কিন্তু কোন সময় লইবার চাই নাই বা রুজির পন্থা বানাই নাই। জীবনভর মাদ্রাসার করিয়াছি এবং মাদ্রাসা করাকে বৃহদোত্তম নৈকট্য লাভের, ইসলামকে সজীব রাখার এবং হামেশার জন্য সর্বোত্তম অছিলা মনে করিয়াছি কিন্তু কখনো মাদ্রাসা করাকে রুজির পন্থা বানাই নাই। কিতাব লিখিয়াছি, ওয়াজ তাবলীগ করিয়াছি, মুরীদ করিয়াছি লোকে হালাল মাল হইতে মহব্বতের সঙ্গে হাদীয়া দিলে তাহাও গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু কখনো কিতাব লিখাকে, ওয়াজ ও তাবলীগকে বা পীর-মুরীদিকে রোজগারের পন্থা বানাই নাই বা টাকার জন্য, টাকার আশায় এই কাজ করি নাই। আল্লাহর মেহেরবাণী! নিয়্যত, লোভ বা আশা কক্ষণো করি নাই বরং আল্লাহ দিয়াছেন বহুত। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী, কেহ না দিলে কখনো দেলে কষ্ট বা তঙ্গী হয় নাই। হাদিয়া দেওয়া-নেওয়া যেহেতু ঈমানী মহব্বতের আলামত সেই জন্য হাদিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কোন স্থলে রছম বা রেশওয়াতের, আশংকা হইলে লই নাই। হাদিয়া হইল, হালাল মাল হইতে কোন হীনস্বার্থের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে, মহব্বতে দেওয়ার নাম। পক্ষান্তরে রছম, লাজে-শরমে বা সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহর উদ্দেশ্যের নিয়্যত ব্যতিরেকে দেওয়ার নাম রেশওয়াত। এবং হীনস্বার্থের উদ্দেশ্যে বেতন ভোগী কর্মচারীকে তাহারই দায়িত্বের কর্তব্য কাজ করাইয়া নেওয়ার জন্য অথবা যে কাজের পরিবর্তে কিছু নেওয়া শরীয়তে জায়েজ নাই বা যে কাজ তাহার ক্ষমতায়ই নাই তেমন কাজ করাইয়া নেওয়ার জন্য দেওয়ার নাম রেশোয়াত। যেমন, একটু সুপারিশ করিয়া দেওয়ার বিনিময়ে বা একটু দোয়া করিয়া দেওয়ার বিনিময়ে বা আল্লাহর কাছ থেকে মকছুদ হাছিল করাইয়া দেওয়ার বিনিময়ে বা মেয়ে বা ছেলে বিবাহ ইত্যাদি দেওয়ার বিনিময়ে দেওয়া নেওয়া রেশওয়াত; বা কেরানী, পুলিশ, অফিসার, মিনিষ্টারদের দ্বারা কাজ করাইয়া নেওয়ার জন্য তাদের বেতনের অতিরিক্ত নগদ টাকা, ভেট, পার্টি দাওয়াত ইত্যাদি দেওয়া রেশওয়াত, নেওয়া রেশওয়াত। এইসব হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য বিশেষ করিয়া দুনিয়ার কাজকে যেমন, তাবিজ লেখাকে দ্বীনের নামে চালু করা হইতে এবং দ্বীনের কাজকে যেমন– ওয়াজ, তাবলীগ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদিকে খালেছ নিয়্যত ব্যতিরেকে, দুনিয়া করার নিয়তে করা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে আমি আমার আল-আওলাদ, আত্মীয়গণকে, শাগরেদ মুরীদানকে এবং আলেম তালেবে-এলেম ভাইদিগকে অছিয়ত করি। দ্বীনের নামে ধোকা দেওয়ার চেয়ে বড় পাপ আর নাই।

১২। আমি তাছাওওফ ও তরীকতের কায়েল। আমি তাছাওওফ শিখিয়াছি মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হইতে। আমার জ্ঞান বিশ্বাসে মাওলানা থানবী (রহঃ) তরীকত ও তাছাওওফের ইমাম ছিলেন- মোজাদ্দেদ ছিলেন। তাছাওওফ অর্থে শরীয়তের বিরুদ্ধে কিছু করা নহে বা তাছাওওফ অর্থে ইলমে-গায়েব নহে বা তাছাওওফ অর্থে আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছু করা নহে বা তাছাওওফ অর্থে কতগুলো লোককে অকর্ম করিয়া দেওয়া বা কর্মশক্তি খর্ব করিয়া দেওয়া নহে। আজকাল কুরআন হাদীসের বিদ্যার স্বল্পতার কারণে অবশ্যি, কতগুলো লোকে তাছাওওফকে মনে করিতেছে- কেহ মনে করিতেছে তাছাওওফ অর্থে শরীয়তের বিরুদ্ধে কতগুলো কথা এবং কাজ, কেহ মনে করিতেছে তাছাওওফ দ্বারা কতগুলো গায়বী কথা জানা যায় বা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহকে রাজী না করাইয়া নিজেই কিছু করাইয়া নেওয়া যায়। কেহ কেহ ভুল ধারণা বশতঃ সত্যিই তাছাওওফের নাম করিয়া কতগুলো কাজের লোককে অকেজো বানাইয়া দিতেছে, বা সত্যি সত্যিই কর্মশক্তিকে চিন্তাশক্তিকে খর্ব করিয়া দিতেছে, তাই দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন, সত্যিই বুঝি তাছাওওফ কাজের লোককে অকর্মা করিয়া দেয় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা, চিন্তাশক্তি এবং কর্মশক্তিকে খর্ব করিয়া দেয়। মাওলানা থানবী (রহঃ) আমাদেরকে এইসব ভুল ধারণা থেকে আলোর পথ দেখায়েছেন। তিনি বলেছেন- আর শুধু তিনি বলেন নাই- তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী তাছাওওফের এবং তরীকতের ইমামগণের থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন- তাছাওওফ অর্থে تعمر الظاهر والباطن অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে দৃশ্য এবং অদৃশ্য আত্মা, অদৃশ্য বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং দৃশ্য কর্মশক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উভয়কে শুধু এককে নহে- 'যে বিদ্যা এবং যে অনুশীলনের দ্বারা সজীব, সতেজ, সবল এবং দৃঢ় করা যায় ও রাখা যায় এবং মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই উভয়বিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ সচেতন করে এবং রাখে তাহাকেই বলে তাছাওওফ বা তরীকত।' অতএব দেখা যায় যে, তাছাওওফ অর্থে সম্পূর্ণ কুল শরীয়ত এবং কুল ইসলাম বুঝায়। মানুষ যেমন পায়ের একটি আঙ্গুলে কিছু গোবর লইয়া নামায পড়িলে নামায শুদ্ধ হইবে না- দেলের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, পরের ক্ষতির চিন্তা, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার-অবিচার করিবার ইচ্ছা, আল্লাহর বিরুদ্ধে, রাসূলের বিরুদ্ধে আইন রচনা করিবার ভাব লইয়া- সুদ, ঘুষ, চুরির টাকার ভাত খাইয়া, কাপড় পরিয়া নামায পড়িলে তাহার নামায যে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তদ্রুপ, আমি জিকির করি, ছয় লতিফা বা দশ লতিফার শোগল করি কিন্তু যদি নামায না পড়ি, রোজা না রাখি তাহলে আমাকে যেমন তরীকতপন্থী বলা যাইবে না, তদ্রুপ যদি আমি নামাযের জাহেরী ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাব এবং মনের বাতেনী

জাগ্রতা হুজুরে-কলব, খুশু-খুজু, একাগ্রতা, নিবিষ্টতা, ইখলাছ পালন না করি বা কৃষিকাজ করিতে গিয়া পরের ক্ষতি করি, পরের আইল ভাঙ্গি, পরের খন্দ খাওয়াই, গরুকে কষ্ট দেই বা শিল্পকাজ করিতে গিয়া, জনমজুরির কাজ করিতে গিয়া মানুষকে ঠগাই, বা চাকুরী করিতে গিয়া কর্তব্য কাজ না করি, দায়িত্ব পালন না করি, ঘুষ খাই, জনসাধারণের কাজে তাদেরকে কষ্ট দেই, তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার না করি, তাদেরে ঘুরাঘুরি করি, টাল-বাহানা করি, তাদের থেকে খোশামোদের ঘুষ, পান মিঠাইয়ের ঘুষ বা নগদ টাকার ঘুষ গ্রহণ করিয়া কাজ করিয়া দেই বা স্ত্রীর সঙ্গে খারাব ব্যবহার করি, আওলাদ-সন্তানের হক— তাদেরে শুধু খাওয়াইলে হইবে না, তাদেরে মানুষ বানাইতে হইবে। আল্লাহ রাসূলকে চিনাইতে হইবে, আল্লাহর দ্বীন নবীর তরীকা সম্বন্ধে তাদেরকে সচেতন করিতে হইবে। হালালভাবে রুজী-রোজগার করিবার উপায় তাদেরে শিখাইতে হইবে। তাদেরে চরিত্রবান করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই হক যদি আদায় না করি, মা-বাপের খেদমত যদি না করি, পাড়া প্রতিবেশীকে যদি কষ্ট দেই, পাড়া-প্রতিবেশীর হক আদায় না করি, মেহমানের হক যদি আদায় না করি, বোন—ভাগ্নে, ভাই ভাতিজা, চাচা, ফুফু, দায়াদি, আপনজনের হক যদি আদায় না করি, বা ব্যবসার ক্ষেত্রে হালাল-হারাম না বাছি, সুদের কারবার করি, মালে মিশাল দেই, মাপে কম দেই, গ্রাহককে ধোকা দেই, গ্রাহকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করি, টাকা থাকা সত্ত্বেও যাকাত না দেই; গরীব-দুঃখীর, ধর্ম কাজের সাহায্য সহায়তা না করি, গরীবদেরে মন-তোড়া কথা বলিয়া, এতীম, বিধবা, দরিদ্র, ধার্মিকদের মনে ব্যথা দেই, শাসনকর্তা হইয়া দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন না করি, যোগ্যতা, শিষ্ঠতা, সততা না দেখিয়া—আত্মীয়তা দেখিয়া বা পক্ষ টানিয়া নমিনেশান বা এপয়েন্টমেন্ট দেই, বিচারকর্তা হইয়া ন্যায় বিচার না করি, অবিচার করি বা অন্যায় বিচার করি, বা নিজের, আত্মীয়ের বা নিজের দলের পক্ষ টানিয়া বিচার করি, বা ডিউটির সময়ে অজিফা পড়িয়া, মামলা ওয়ালাদের তারিখ ফেলাইয়া দিয়া হয়রান করি বা নিজের Jurisdiction এর মধ্যে পূর্বেকার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ব্যতিরেকে অন্য কাহারও দাওয়াত খাই— এই দাওয়াত খাওয়াও এক প্রকার ঘুষ— অন্য ঘুষেরত কথাই নাই— ভোটার হইয়া যোগ্যতা, সততা, বিশ্বস্ততা না দেখিয়া বা কোন হীনস্বার্থে ভুলিয়া ভোট দেই, আইন পরিষদের বা গণ-পরিষদের মেম্বার হইবার কালে নিজের জন্য সত্য ক্যানভাস করি—মিথ্যা ক্যানভাসের ত কথাই নাই এবং মেম্বর বা মিনিষ্টার হইয়া সারিয়াও গরীব জনসাধারণের খবরগিরী না করি, ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ ও ইসলাম বিরুদ্ধ আইন নিজে করি বা অন্যেরটা সমর্থন করি বা জনগণের প্রকৃত সেবায় লিপ্ত না হইয়া শুধু গরীব-দরদীর প্রোপাগাণ্ডা করি বা নিজের কুর্সী গদি রক্ষা করার জন্য সাজবাজ করি তবে আমার না ধর্ম ঠিক হইবে,

না তাছাওওফ ও তরীকত ঠিক হইবে, না ইসলাম ঠিক হইবে। অবশ্য এর মধ্যে বড় ছোট আছে এবং উপরের তলায় না উঠিতে পারিলেও নীচের তলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব না-নীচের তলা হাতে রাখিয়া উপরের তলায় চড়িতে চেষ্টা করিব। এই তাছাওওফেরই আমি কায়েল এবং এই তাছাওওফেরই আমি অছিয়ত করি।

১৩। তাছাওওফ বা তরীকত পীরের ছেলেকে পীর বানাইতে বলে নাই বা পীরকেও আপন ছেলেদের পীর বানাইবার, গদ্দীনেশীন করিবার জন্য মুরীদানকে অছিয়ত করিয়া যাইবার বলে নাই- ইসলামের বিধান পীর হইবার জন্য-নায়েবে রাসূল হইবার জন্য-খলীফা হইবার জন্য যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা চাই এবং কে কাকে পীর অর্থাৎ ধর্মগুরু অর্থাৎ রুহানী ওস্তাদ বানাইবে সে জন্য তাকে এখতেয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়া হইয়াছে। হযরত আলীকে তাঁহার সুযোগ্য ও পূর্ণ বিশ্বস্ত ছেলে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তাঁহাকে আমরা খলীফা বানাইতে চাই, তখন হযরত আলী চুপ ছিলেন- কিছুই বলিয়া যান নাই-শুধু বলিয়াছিলেন- সেটার ভার তোমাদের উপর অর্থাৎ আমার ছেলে বলিয়া তাকে খলীফা করিবে না, আবার আমারে ছেলে হওয়াটা তার অযোগ্যতার সনদও হইবে না। তোমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসে যদি তাকে যোগ্য ও বিশ্বস্ত পাও তবে তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছায়-আমার ছেলে হওয়ার খাতিরে নয়-খলীফা বানাইতেও পার। সুতরাং আমি হযরত আলীর সুন্নতের উপর আমল করিতেছি। খবরদার! খবরদার!! আমার ছেলেকে, আমার ছেলে বলিয়া যেন পীর না বানান হয়- অবশ্যি তাকে মানুষ বানাইবার জন্য কেউ চেষ্টা করিলে তাতে আমার রূহ খোশ হইবে এবং যদি প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ হয় তবে তাকেও আমি দ্বীনের খেদমত- দ্বীনের খেদমতের জন্য এক আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূলের রূহকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে করিতে অছিয়ত করি। ব্যবসা হিসাবে বা রছম হিসাবে বা মিরাছ সূত্রে পীর-মুরিদী করিতে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করি এবং হাদিয়া-তোহ্‌ফা নজরানা পাওয়া যাইবে বা পাওয়া যাউক এই আশা করিতে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করি। বিনা আশায় আসিলেও দেনেওয়ালা রছমের কারণে বা পীরের ছেলেকে দিতেই হইবে, এই ধারণায় দিতেছে না ত? ইহার তাহ্‌কীক করিয়া, খালেছ আল্লাহর মহব্বতের টা লইতে এবং রছম-রেওয়াজ ও মিরাছ সূত্রের টানা লইতে তাকীদের সহিত অছিয়ত করি। কখনো পরেরটা খাওয়ার আশা করা চাই না বরং নিজ হাত-পায়ের দ্বারা, বুদ্ধি-বিবেকের দ্বারা উপার্জন করিয়া নিজে খাওয়া এবং অপর দশজনকে খাওয়ানোর নিয়্যত করা চাই।

১৪। ইসলাম ধর্মের অর্থ আল্লাহর বাণী এবং আল্লাহর রাসূলের জীবনী অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ। ইহা আমাদিগকে শুধু জ্ঞান ও আইন দান করিয়াই ক্ষান্ত হয়

নাই, অধিকন্তু মানুষের মুক্তি ও উন্নতির জন্যে যে সব সদগুণাবলী, আখ্‌লাকে হাসানা ও সত্যিকার আল্লাহর প্রেমের প্রেরণার প্রয়োজন ছিল তাহাও দান করিয়াছে, অর্থাৎ মানুষের জাহের ও বাতেন এবং বিজ্ঞানের বিকাশ ও আইন জারির পর যাতে স্বার্থ লোলুপতা, ক্ষমতা লোলুপতা, অর্থ লোলুপতা, ও জড় সর্ব্বস্বতায় সব জ্ঞান ও আইনের ভান্ডারকে পন্ড না করিয়া দিতে পারে এই উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছে। এই সামগ্রিক শিক্ষার নামই ইসলাম ধর্মের শিক্ষা। ইসলাম ধর্মের সামগ্রিক শিক্ষা ও প্রচার ব্যতিরেকে ইসলাম ধর্ম বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অথচ শিক্ষা ও প্রচারের জন্য হুকুমতের প্রয়োজন যতটা না, তার চেয়ে অধিক প্রয়োজন অর্থের। এইজন্য বোধ হয় আল্লাহ তায়ালা প্রথম থেকেই যাতে হুকুমতের মুখাপেক্ষী না হইয়াও ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারের কাজ কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিতে পারে তাহার অত্যন্ত দৃঢ় সুবন্দবস্তো করিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে طلب الحلال واجب على كل مسلم. অর্থাৎ হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ নির্ধারিত করিয়াছেন। অন্যদিকে সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা এবং তেজারতের মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, সেচের পানির শস্যের বিশ ভাগের একভাগ এবং বর্ষার পানির শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহর দ্বীন জারীর উদ্দেশ্যে দান করা ফরজ করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহর দ্বীন জারি রাখার প্রচেষ্টার বর্তমানে পাঁচটি তরীকা, প্রণালী প্রচলিত আছে, ভবিষ্যতে আরও হয়ত কোন নূতন তরিকা বাহির হইতে পারে। মোটকথা প্রত্যেক মুসলমানের জেম্মায় ফরয-হুকুমতের সাহায্য না পাইলেও নিজেরা দান করিয়া যে কোন উপায়ে ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারকে হামেশা জারি জীবন্ত রাখিবে। পাঁচটি তরীকা এইঃ- (১) যে সব মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্মের আইন শিক্ষা দেওয়া হয়, (২) যে সমস্ত খাঁটি আল্লাহর ওলীগণ খানকায় বসিয়া লোকদেরে আল্লাহর মারেফত ও আল্লাহর এশ্‌ক শিক্ষা দেন এবং লোকদের নৈতিক চরিত্র গঠন করিয়া দেন। (৩) যে সমস্ত খাঁটি আলেম ও বুযুর্গ ওয়ায়েজগণ স্বদেশে বিদেশে লোকদেরে কোন মাহফিলে একত্র করিয়া কুরআনের, হাদীছের, ইসলামের, ইতিহাসের এবং রাসূলুল্লাহর জীবনীর ও অন্যান্য নবীগণের জীবনীর এবং খোলাফায়ে রাশিদীনের, আছহাবগণের, আউলিয়াগণের জীবনীর আলোচনা করিয়া লোকদের ধার্মিক হওয়ার, আল্লাহর প্রেমিক হওয়ার, কর্তব্য পরায়ণ, সৎকর্মী হওয়ার, দানশীল-গরীব-দরদী ধনবান হওয়ার, ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও শাসক হওয়ার, চরিত্রবান সৈনিক, জাতি-ধর্ম ও দেশের সেবক হওয়ার প্রেরণা দান করেন, (৪) যে সমস্ত আল্লাহওয়ালাগণ বাড়ীতে বাড়ীতে, দোকানে, দেশে বিদেশে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকদেরে দ্বীন শিক্ষা দেন, (৫) যে সমস্ত লোক শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরআন ও সুন্নাহ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের হিতের জন্য বিতরণ করেন।

এই পাঁচ দলের মণীষীগণই এই পাঁচ প্রণালীতে ইসলামের খেদমত করিতেছেন। ইহাদের খেদমত করা মুসলমানগণের উপর ফরজ। কারণ, এই উপায়েই ইসলাম জিন্দা থাকিতে পারে। সুতরাং আমি আমার তরীকতের ভাইদেরে বিশেষ করে অছিয়ত করিতেছি- তাঁহারা যেন এই ফরজ পালনে কিছুতেই ত্রুটি না করেন। ইহা ইসলামের তৃতীয় রোকন। যদি কোন ব্যক্তি বা দল কোন সময় ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য চেষ্টা করে তবে তাহার বা তাহাদের সাহায্য করাও এরই অন্তর্ভূক্ত বরং উহাই ইসলাম সৌধের সর্বোচ্চ শিখর। অবশ্যি উচ্চস্তর না পারলে যে নিম্নস্তর ছেড়ে দিতে হবে তাহা নহে, ছেড়ে দিলে কাজ চলবেনা, সেই জন্যই এই পাঁচ মর্তবার দরকার। যদি উচ্চস্তরের সুযোগ আল্লাহ দেন তখনও এই পাঁচ মর্তবার দরকার কমবে না।

১৫। কিন্তু বাছনি করিতে হইবে, খাঁটি অখাঁটি বাছনি না করিলে সব বরবাদ হইবে। মাদ্রাসা হউক, পীর হউক, ওয়ায়েজ হউক, জেহাদের জন্য অর্থাৎ হুকুমতে ইসলামীর চেষ্টার জন্য উদ্যোক্তা হউক, সর্বক্ষেত্রে তাদের গোপন জীবন, Private Life পর্যবেক্ষণ করিয়া বাছনি করিয়া খাঁটিকে ভক্তি ও সাহায্য করিতে হইবে, অখাঁটি ও মিথ্যাকে, ধোকাবাজকে বর্জন, সামাজিক শাসনের দ্বারা হেয় করিতে হইবে, অখাঁটির প্রাচুর্যের কারণেই অখাঁটির প্রতি কড়া নজর, শাসন না থাকার কারণেই শেষে খাঁটির কদর থাকে না, দ্বীনের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা আসিয়া যায়। ইহাকেই বলা হয়েছে মোমেনের ছেফাত শুধু নরম হয়- কঠোরও اشداء على الكفار رحماء بينهم আয়াতের ইহাই তাৎপর্য- খাঁটি ঈমান, আখলাক ও ঈমানদারদের প্রতি কুসুমের ন্যায় কোমল, খোদাদ্রোহীতা, খোদাদ্রোহীতার কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার ও খোদাদ্রোহীদের প্রতি বজ্রের ন্যায় কঠোর। আমি আমার তরীকতের ভাইদেরে বিশেষ করে অছিয়ত করি-এক ঘেয়ে নরম না হতে বরং তাতে যা কিছু কষ্টের, বিপদের, দুঃখের, যন্ত্রণার, দূর্ণামের, দারিদ্রের, জেলের, ফাঁসির মুছিবত আসতে পারে তা হৃষ্টচিত্তে হাসিমুখে সহ্য করিতে- না ঘাবড়াইতে, না ফরিয়াদ করিতে, না শেকওয়া শেকায়েত করিতে এবং না প্রতিশোধের ইচ্ছা বা চেষ্টা করিতে। ইহাই আমার অছিয়ত। ইহাই পালন করিয়াছি আমি সারাজীবন এবং ইহাই পালন করিতে অছিয়ত করি প্রত্যেক মুসলমান ভাইদেরে।

নাচিজ-শামছুল হক
২-১১-৬৭ইং

হযরত যাফর আহমাদ উসমানী (রহঃ)–এর অভিমত

বিংশ শতাব্দীর কুতুবে জামান, বাতিলের হৃদকম্পন হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী ছাহেব (রহঃ) মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)–এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে মাটির দিকে মাথা ঝুকিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ পরে মাথা উঠিয়ে বললেন, হায়! বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আলেমে দ্বীন, দুনিয়া থেকে আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন। মাওঃ শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)–এর মত উদার, তেজস্বী, মানব প্রেমিক, দুনিয়াত্যাগী, কুরবানী করনে ওয়ালা আলেম সারা দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তিনি আমার থেকে অনেক অনেক বড় আলেম ও আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী

মুজাহিদে আযম, সংস্কারক পুরুষ, হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব হুযুর (রহঃ)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, তাঁর হক কথা উচ্চারণ ও স্পষ্টবাদিতার বর্ণনা দিয়ে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের বিচারক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, গবেষক, আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী বলেন–

ইখলাছ ও হীতাকাঙ্খার সাথে হক কথা বলা এবং স্পষ্ট কথা বলার বিশেষ গুণটি তাঁর ছিল। সমকালীন শাসকদের সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। সাধারণভাবে তাঁর সঙ্গে শাসকরা সম্পর্ক বজায় রাখত। কিন্তু যখন দ্বীনের কোন মুআমালা এসে যেত এবং শাসকদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বিধানের কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে দেখতেন, তখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাষায়, স্পষ্টবাদিতা, সাহস ও দৃঢ়তার সাথে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে বিন্দুমাত্রও শংকাবোধ করতেন না। এই স্পষ্টবাদিতার সূত্রে তাঁকে বিভিন্ন শাসকের পক্ষ থেকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে, গালমন্দ শুনতে হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাঁর বেদনা ও ক্রোধ, ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে প্রকাশ পেত। তাই সাধারণভাবে শাসকরা এটা উপলব্ধি করতে পারত যে, তাঁর সহযোগিতা ও বিরোধিতার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা নোংরা রাজনৈতিক লক্ষ্য সংযুক্ত থাকত না। তিনি যা কিছু বলতেন, আল্লাহর ওয়াস্তেই

বলতেন। শাসকদের এই উপলব্ধির ফল হয়েছিল এই যে, বহু বিষয়ে শাসকদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও কেউ তাঁকে নির্যাতন করার দুঃসাহস দেখায়নি এবং কেউ তাঁকে নিজের দুশমনও মনে করেনি।

মাওলানা মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বা পৃথিবী বিখ্যাত আলেম, মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহঃ)-এর সঙ্গী হয়ে এক সফরে ঢাকায় এসে হযরত ছদর সাহেব (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় তিনি হযরত ছদর সাহেব হুযূর (রহঃ)-এর অনাড়ম্বর জীবনের একটি ঝলক দেখে বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন–

মুহূর্তটি ছিল অতি ব্যস্ততার। আমি মাওলানা (রহঃ)-এর কামরায় প্রবেশ করেই কিছুক্ষণ পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এটি ছিল মসজিদের এক কোনায় একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরা। চারদিক থেকে আবদ্ধ, মাঝখানে ছিল একটি পার্টিশান। সেই পার্টিশানের ছায়ায় ছোট্ট একটি চৌকি বিছানো ছিল। এই চৌকিটিই ছিল মাওলানা (রহঃ)-এর বিশ্রামের বিছানা। চৌকির নিচে একটি চাটাই মেলানো ছিল। মাওলানা (রহঃ) সেই চাটাইয়ে বসেই খানা খাচ্ছিলেন। খানা কী ছিল? একটি বড় সাইজের পেয়ালায় ডাল ও ঝোল মেশানো তরকারী, আর দু'একটি তন্দুর রুটি এবং মাত্র এতটুকুই।

এর আগে মাওলানা (রহঃ)-এর খাছ কামরা দেখার সুযোগ ঘটে নাই। এর পূর্বে সব সময় মাদরাসার দফতরেই সাক্ষাৎ হত, যা ছিল প্রশস্ত এবং পরিপাটি।

আজকে জানতে পারলাম, যেই ব্যক্তি মাদরাসা ও মসজিদের এত বড় ও প্রশস্ত ইমারত বানালেন, স্বয়ং তিনি থাকেন এভাবে। আমি বিস্ময়াভিভূত হচ্ছিলাম। হাঁপানী ও'হৃদরোগে আক্রান্ত সেই রোগী কি করে এই কামরায় এই সহায়-সম্বলহীনতার সাথে অতিবাহিত করতে পারছেন, যাকে সকাল-সন্ধ্যায় হৃদ যন্ত্রনা সহ্য করতে হচ্ছে? সাথে সাথে মস্তিষ্কে হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শব্দাবলী গুঞ্জরিত হয়ে উঠল–

كن فى الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل

[দুনিয়ায় বসবাস কর এমনভাবে যেন, তুমি প্রবাসী কিংবা পথিক]

আমার জীবনে ছদর সাহেব (রহঃ)

–আজিজুল হক

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব হুযূর (রহঃ)-এর গোটা জীবনটাই ছিল ইখলাছে পরিপূর্ণ। হযরতের বাড়ী ঘর দেখলেই

যে কেউ অনুমান করতে পারবে তিনি কোন পর্যায়ের মুখলিছ বান্দা ছিলেন। গোটা দেশে তাঁর এত বিপুল পরিমাণ ভক্ত অনুরাগী ছিল, যদি কোনদিন তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি সামান্যতম ইশারাও করতেন, তবে বাদশাহী হালে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। গওহরডাঙ্গাতে তাঁর বাড়ী ছিল এত বেশী সাদামাটা যে, এটা যে ছদর সাহেব হুযূরের বাড়ী তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে অবস্থানকালেও তাঁর বাসার অবস্থা ছিল তদ্রুপ। ব্যক্তি হিসাবে তাঁর অবস্থান এত উর্ধ্বে ছিল কিন্তু চাল-চলন ছিল অতি সাধারণ একজন মানুষের মত। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, চাল-চলন সব কিছুই ছিল একেবারে সাধারণের চেয়ে সাধারণ। আমি জীবনে অনেক মানুষ দেখেছি কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ মানুষ দ্বিতীয়টি পাইনি।

ছদর সাহেব হুযূরের অমূল্য কীর্তি হক্কানী তাফসির বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে এক অমূল্য অবদান।

তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে হুযূরের অবদান তো সকলেরই জানা। ইসলাম ও মুসলমানদের যে কোন দুর্দিনে হুযূর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। খৃষ্টান মিশনারী এবং পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুযূর প্রচার প্রচারণা এবং সভা-সমাবেশ করে মুসলমানদের সতর্ক ও সজাগ করেছেন।

হযরত ছদর সাহেব হুযূরের জীবনী আলোচনা করতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ফুরিয়ে যাবে কিন্তু তার বর্ণনা সামান্যতম হবে না। শুধু এতটুকুই বলা যায়, হুযূর ছিলেন সুন্নতে নববীর বাস্তব নমুনা।

[আজিজুল হকঃ শায়খুল হাদীস, বুখারী শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদক, উস্তাযুল আসাতিয়া, মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস জামিআ' রাহ্মানিয়া ও মালিবাগ জামিয়া, ইসলামী রাজনীতিক, চেয়ারম্যান-শরীয়া কাউন্সিল আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক]

মাওলানা আব্দুল মান্নান

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহঃ)-এর উঁচু আখলাক সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর জামাতা, গওহরডাঙ্গা মাদরাসার শাইখুল হাদীস ও মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব কাশিয়ানী হুযূর প্রথমেই একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন–

হযরত একবার কৃষি কাজ করার জন্য কিছু লোক নিলেন। কাজ শেষে তাদের একজন এসে টাকা চাইলে ছদর সাহেব হুযূর সবার টাকা হিসাব করে তার হাতে

দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তাদের মধ্যে আরেকজন এসে বলল-'হুযুর! আমারি টাকা দিন। ছদর সাহেব কিছু না বলে তাকে টাকা দিলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, 'হুযূর! সবার টাকা তো একবার দিয়ে দিলেন। আবার . . . .।' জবাবে তিনি বল্লেন- 'তাতে কি হয়েছে? কোন অসুবিধা নাই। সেও গরীব মানুষ।'

হযরতের সাধারণ জীবন যাপনের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন-

একবার বাদশাহ ফয়সলের আমলে সৌদী আরবে 'রাবেতা আলমে ইসলামী'-এর পক্ষ থেকে 'বিশ্ব উলামা সম্মেলন' ডাকা হল, তখন মুনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র হযরত ছদর সাহেব হুযুর-ই দাওয়াত পেলেন। আমি এবং হযরতের খাদেম নায়েব আলী সফরসঙ্গী হলাম। রওয়ানা হওয়ার সময় আম্মা হুযূর হযরতের জন্য বড় একটা মাছ ভাজী করে কিছু খাবার দিলেন। কোন ঝোলের তরকারী ছিল না। ষ্টিমারে অনেক দূর যাওয়ার পর হুযুর বললেন- "আমি গোসল সেরে এসে খেতে বসব।" হুযূর গোসল করতে গেলে আমরা দু'জন তরকারী গরম করার জন্য বাবুর্চী খানায় গেলাম। উদ্দেশ্য হল, বাবুর্চীদের কিছু পয়সা দিয়ে পিয়াজ-মরিচ নিয়ে ভাজী মাছটা দিয়ে ঝোলের তরকারী পাক করব। ভাবলাম হযরতের হয়ত ভাল লাগবে। নায়েব আলী আমাকে বারণ করা সত্ত্বেও আমি ঝোল পাক করলাম। এগুলো করতে গিয়ে অনেক দেরী হয়ে গেল। ফিরে এসে দেখলাম থালা-বাটি এলোমেলো হয়ে আছে। অর্থাৎ হযরত ইতিমধ্যে খেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু লবন ছাড়া খাওয়ার মত আর কিছুই ছিল না। হযরত তাই দিয়ে খেয়েছেন। আমাদের দেখে হুযূর বললেন- 'গোসলের পরই আমার ক্ষুধা লাগে। তাই খেয়ে নিয়েছি। তোমরা খাও।' হযরতের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে কোন দিন কোন ব্যাপারে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিব না।

হযরতের দায়িত্ব সচেতনার দূর্লভ গুণের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন-

আমি তখন হযরতের মাদরাসার শিক্ষক। জরুরী কাজে হযরত আমাকে উত্তরবঙ্গে পাঠালেন। এদিকে শাওয়াল মাস পর্যন্ত মাদরাসা বন্ধ। তাই আমি কাজ শেষ করে বাড়ী গিয়ে ঈদ করলাম। বিশেষ কিছু কাজের জন্য ৮ই শাওয়াল বাড়ী থেকে রওয়ানা হলে ষ্টেশনে এসে দেখি কিছু ছাত্র মাদরাসায় যাচ্ছে। তাদের কাছে জানতে পারলাম যে, হুযূর এখন বাড়ীতে আছেন। আর ঐ ষ্টেশনটাও ছিল হযরতের বাড়ীর কাছেই। তখন আমি সরাসরি মাদরাসায় না এসে হযরতের বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীতে যাওয়ার পর হুযূর আমার সঙ্গে অতি স্নেহভরে কথা বললেন। কুশলাদি চানতে চাইলেন। মাদরাসায় এসে শুনতে পেলাম উস্তাদদের মধ্যে যারা ৬ তারিখের পর মাদরাসায় এসেছেন, ছদর সাহেব হুযূর তাদেরকে

শাসন করেছেন। বাড়ীতে আমার সাথে এত ভাল ব্যবহার করার কারণে আমার মনে কোন ভয় বাসা বাঁধতে পারেনি। এমন অবস্থায় আমি ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। তখন হযরতের খাদেম এসে বলল- 'হুযূর এক্ষুণি আপনাকে ডাকছেন।' খাদেমের আওয়াজের কাঠিন্য আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। এমনভাবে তো কখনো আমাকে ডাকেন নি। দুরু দুরু মনে হযরতের খেদমতে হাজির হলে আমাকে দেখে কড়া ভাষায় শাসন করলেন এবং বললেন- 'মাদরাসার আইন-কানূন মেনে চলতে পারলে থাক, নইলে চলে যাও।' ঐ মজলিসে অন্যান্য লোকজনও বসেছিল। কিন্তু এতো রাগের সময়ও তাদের সাথে অতি স্বাভাবিকভাবে নম্রস্বরে তিনি কথা বলছিলেন।

শৈশবেই তাঁর ভিতর বড় হওয়ার নিশানা ছিল পুরোমাত্রায়, তারই ইঙ্গিতবাহী একটি ঘটনার উদ্বৃতি দিয়ে কাশিয়ানী হুযূর বললেন-

হযরত শৈশবে যে স্কুলে পড়তেন, ঐ স্কুলের শিক্ষকমন্ডলী বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক হযরতকে খুব ভালবাসতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গেই প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের সামনে বললেন- 'তোমাদের মধ্যে আমি শামছুল হককে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। তাঁর আমানতদারী সম্পর্কে আমার এতটুকু আস্থা আছে যে, যদি স্কুলের সমস্ত প্রশ্নপত্র তাঁর কাছে রেখে দেই, তাহলে সে কাউকে প্রশ্ন বলা তো দূরের কথা নিজেরটা পর্যন্ত দেখবে না।'

ছদর সাহেব (রহঃ)-এর অধ্যবসায় নিয়ে আলোচনায় তিনি বললেন-

ছদর সাহেব হুযূর সাহারানপুর মাদরাসায় ছাত্র থাকাকালীন একবার মুফতী আব্দুল মু'ঈয (রহঃ)-এর পিতা মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব মাদরাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে যাওয়ার পর নাযেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এখানে বাংলাদেশের কোন ছাত্র পড়ে কি না? নাযেম সাহেব ছদর সাহেবের কামরা দেখিয়ে দিলেন। মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেব বলেন যে, আমি তাঁর কামরার সামনে গিয়ে দেখতে পাই যে, এমনভাবে কিতাব মুতায়ালা' করছেন যে মাথা উঁচু করা বা এদিক ওদিক তাঁকানো তো দূরের কথা, একটু নড়া-চড়াও করছেন না। মুতায়ালা'র ক্ষতি হবে এজন্য আমি তাঁকে ডাক দিলাম না এবং কোন কথা না বলে ফিরে আসলাম। হযরত রুটিন মোতাবেক মুতায়ালা শেষ করার পর ছাত্ররা প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার তোমার না দেশের লোক এসেছে? সাক্ষাৎ হয়েছে? জবাবে বললেন, কই না তো! আমার কাছে তো কোন লোক আসেনি? ছাত্ররা জানাল এসেছিলেন, হয় তো চলে গেছেন। এ কথা শুনে দৌড়ে হযরত ষ্টেশন পর্যন্ত আর তাঁর সাক্ষাৎ পাননি।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুযুর (রহঃ)

—ফজলুল হক আমিনী

বাংলাদেশের সর্বত্র 'ছদর সাহেব' নামে সর্বাধিক খ্যাত ও পরিচিত মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন, পাক ভারত উপমহাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম, মুসলিম জাতির পথপ্রদর্শক, আধ্যাত্মিক রাহ্‌বার, অভিজ্ঞ রাজনীতিক, উঁচুস্তরের লেখক, গবেষক, হাদীস ও তাফসীর বিশারদ। তাঁর জীবনের শেষ আট বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে বিষয়গুলো আমি তাঁর খুব কাছে থেকে উপলব্ধি করেছি, তা হল—তাঁর ইখলাছ ও নিষ্ঠা, দ্বীনের জন্য দরদ ও আন্তরিকতা, মানুষ গড়ার সার্বক্ষণিক চিন্তা ও উম্মতের কল্যাণ কামনায় আজন্ম ব্যাকুলতা।

যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট দিয়ে মহান ব্যক্তিদের প্রেরণ করে থাকেন। যে যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে তাঁরা প্রত্যেকেই জগৎবাসীর কাছে মহিয়ান হয়ে বেঁচে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা এই মহান ব্যক্তিদের কাউকে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে আবার কাউকে ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করে বিশ্ববাসীর সামনে তাঁদের মহান ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলে থাকেন। জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানের সমন্বয় একই ব্যক্তির মাঝে পাওয়া খুবই বিরল। মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন এমন একব্যক্তি, যাঁর মাঝে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল পূর্ণমাত্রায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইল্‌মের পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তি। অহংকার বা গর্ব কি তা তিনি জানতেন না। খোদাভীতি, তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারীর মূর্তপ্রতীক এই মহান ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ অনুগত এবং যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে আজীবন সাধনায় ব্রতী ছিলেন। প্রকাশ্যে-গোপনে, সরবে-নিরবে, আনন্দে-বেদনায়, সুখে-দুঃখে, সুস্থতায়-সবলতায়, ভ্রমণে-বাসস্থানে মোটকথা জীবনের প্রতিটি স্তর ও ক্ষেত্রে হযরত ছদর সাহেবের তাক্‌ওয়ার কোন তুলনা হয়না। ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য এই মহান ব্যক্তিত্বের তাক্‌ওয়া অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। তাক্‌ওয়ার এই মহান গুণাবলীর প্রভাবেই শত্রুত বটেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলত। দূর থেকে তাঁকে যতই বাঁকা চোখে দেখুক, তাঁর সামনে দাঁড়ালে শত্রু-মিত্র সকলেরই শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে মাথা নূয়ে আসত।

হযরত ছদর সাহেব (রহঃ) আমাকে স্নেহ করতেন, আদর করতেন, মায়া-মমতার বন্ধনে জড়িয়ে রাখতেন। নিজের ছেলের চেয়ে অধিক ভালবাসতেন। তাঁর সুদৃষ্টি আমাকে এগিয়ে যেতে সাহস যুগিয়েছে। সব সময় তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখতেন। আমি তাঁর দৃষ্টির আড়াল হলেই তিনি আমার খোঁজ নিতেন, খবর নিতেন। আমিও হযরত ছদর সাহেবকে কিছুক্ষণ না দেখলে স্বস্তি পেতাম না, শান্তি পেতামনা। মাদরাসা ছুটি হলেও তিনি আমাকে বাড়ী যেতে দিতেন না। এমনকি একবার আমার দাদার ইন্তেকালের সংবাদ আসলে আমি অস্থির হয়ে বাড়ী যাওয়ার জন্য হযরত ছদর সাহেবের কাছে দরখাস্ত করি। ছদর সাহেব (রহঃ) এসময় গওহরডাঙ্গা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমারও তাঁর সাথে গওহরডাঙ্গা যেতে হবে এমন সিদ্ধান্ত পূর্ব হতেই ছিল। কিন্তু আমার অস্থিরতা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– ফজলু! বাড়ী গিয়ে কি তুমি তোমার দাদার জানাযায় শরীক হতে পারবে? তখন যাতায়াতের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। কোনক্রমেই দাদার জানাযায় শরীক হওয়া যাবে না, একথা আমি ভাল করেই জানতাম। তাই আমি উত্তরে বললাম, না। তখন ছদর সাহেব হুযূর বললেন, জানাযায় যখন শরীক হওয়া যাবে না, তবে গিয়ে লাভ কি? বরং এখানে থেকেই তাঁর জন্য দুআ' করতে থাক। যা তোমার দাদার কাজে আসবে। এখন তুমিই চিন্তা কর, বাড়ী যাবে, না আমার সাথে গওহরডাঙ্গায়? আমি বললাম, হুযূর! আমি আপনার সাথেই যাব। যাহোক ছদর সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক এতই গভীর ছিল যে, তিনি যখন গওহরডাঙ্গায় চলে যেতেন তখন আমাকেও তাঁর সাথে নিয়ে যেতেন। সার্বক্ষণিক তাঁর সাথে সাথে রাখার অর্থ এই নয় যে, তিনি আমার দ্বারা তাঁর ব্যক্তিগত কাজ করাচ্ছেন। বরং মানুষ গড়ার স্বার্থে প্রয়োজনে কোন কোন সময় আমাকে তাঁর থেকে দূরেও সরিয়ে রেখেছেন। লালবাগের লেখাপড়া শেষ হলে তিনি আমাকে হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহঃ)-এর কাছে বুখারী শরীফ পড়ার জন্য পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেন। যে কারণে হযরতের ইন্তেকালের সময় তাঁর পাশে থাকার সৌভাগ্য এই অধমের হয়নি।

আল্লামা ইউসুফ বিন্নুরী (রহঃ) হযরত ছদর সাহেবকে যে কত উঁচুস্তরের মানুষ মনে করতেন, তা তাঁর একটি মন্তব্য থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন–

"পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ আলেমদের মাঝে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা, আলেমে রব্বানী, শায়খুল হাদীস মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহঃ) ছিলেন একজন বড় মুখলিছ, নিষ্ঠাবান মানুষ। সত্য ভাষণে তিনি ছিলেন অকুতোভয়ী, নির্ভীক। সত্য ঘোষণায় কারো তিরস্কার বা চোখরাঙ্গানীর পরোয়া তিনি করতেন না কখনও। সিদ্ধান্তে স্থীরতা, দৃঢ়তা,

যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনা এবং সত্য প্রকাশে এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের ফারেগ এবং তাযকিয়ায়ে নফ্স ও আধ্যাত্মিকতার মূলকেন্দ্র থানা ভবন থেকে ইলমে মা'রিফাতের উঁচু মাক্বাম অর্জন করেছিলেন। খুবই তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, সুচিন্তাশীল ও সুশৃংখল কর্ম ব্যবস্থাপক ছিলেন। অধিকাংশ সময় অসুস্থতার মাঝে থাকলেও ইসলামের খেদমতে সার্বক্ষণিক নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর সাহস মনোবল ও কর্মপন্থায় কোনদিন কমতি দেখা যায়নি।"

[ফজলুল হক আমিনী ঃ মুফতী, চিন্তাবিদ আলেম, মুফাস্সিরে কুরআন দেশবিখ্যাত বাতিল বিরোধী সোচ্চারকণ্ঠ, প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস-লালবাগ জামেয়া]

মাওলানা আব্দুল হাই

মুজাহিদে আযম, সংস্কারক আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহঃ)-এর তাক্ওয়া ও বুযুর্গী সমৃদ্ধ জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লালবাগ জামেয়ার প্রবীণ মুহাদ্দিস, প্রখ্যাত মুফাস্সিরে কুরআন হযরত মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব বলেন–

অর্থ বিত্তের প্রতি হযরত ছদর সাহেব হুযূর (রহঃ)-এর নিস্পৃহতা ও নিরাগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন–

একজন সাচ্চা নায়েবে নবী এবং জাতির নিঃস্বার্থ, পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে যতগুলো মহৎ গুণ থাকার প্রয়োজন, তার সবগুলোই অতি জ্বলন্তভাবে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এর কোনটাকে আমি উল্লেখ করব। তবে তাঁর যে মহৎ গুণটি আমাকে সমধিক প্রভাবিত করেছে, তা হল–তাঁর ইখলাস ও আত্মোৎসর্গ। তিনি এতবড় ত্যাগী পুরুষ ছিলেন যে, আমাদের জানামতে দুনিয়ার কোন মোহ তাঁকে বিন্দু পরিমাণও স্পর্শ করতে পারেনি। সারাজীবন তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করেছেন অথচ পার্থিব ভোগ-বিলাসের উপায় উপকরণ তাঁর একেবারে নাগালের মধ্যে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দুনিয়া থেকে অতি সতর্কতার সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে জীবনযাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনা বলছি।

আমার ছাত্রজীবন। একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর হযরতের নিকট আসলেন এবং নিজেকে বাংলা সাহিত্যের প্রফেসার বলে পরিচয় দিলেন।

কথা প্রসঙ্গে হযরতকে বললেন "আপনার লেখা ইসলামী বইগুলো সমাজে অতি সমাদৃত এবং আমাদের বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এই বইগুলোর কপিরাইট যদি আপনি নিজে রাখতেন, তবে অল্পমূল্যে আরো অধিক সংখ্যক পাঠক পড়ার সুযোগ পেত। কপিরাইট আপনার না থাকায় বই ব্যবসায়ীরা চড়া মূল্যে বিক্রি করার কারণে অনেক সাধারণ পাঠক আপনার বই পড়ে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকছে। কিন্তু হযরত প্রতি উত্তরে চুপ রইলেন কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক হযরতের নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন। "বুঝলাম ধর্মীয় বই বিক্রি করে আপনি কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিল করতে চান না কিন্তু বই-এর মূল্য যদি আপনি নিজ হাতে রাখতেন, তবে আরো অধিক ধর্মীয় কাজে উহা ব্যয় করতে পারতেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা সদকা করার ছাওয়াব পেতেন। হযরত ঐ সময় কাত হয়ে শোয়া ছিলেন, সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন– 'বাবা! টাকার গরমী এত ভয়ংকর যে, লক্ষ লক্ষ টাকা যদি আমার হাতে আসে, তবে তখন যে আমি শামছুল হক এখনকার শামছুল হক থাকব এই আত্মবিশ্বাস আমার নিজের উপরে আমার নাই, তাই ঐ টাকা হাতে ধরার সাহস আমার নাই।'

পাঠক ভাইয়েরা! হযরতের শেষ উক্তিগুলোর দ্বারা অনুমান করুন যে, আল্লাহপাক তাঁকে কত বড় পবিত্র আত্মার অধিকারী করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, হযরত (রহঃ) নিজ রচিত, অনুদিত, সংকলিত কোন বই পুস্তকেরই কপিরাইট রাখেননি এবং বিক্রিলব্ধ টাকা পয়সা থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেননি। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)-এর সুযোগ্য অনুসারী হযরত ছদর সাহেব (রহঃ) তাঁর শায়েখের উক্ত সুন্নত আজীবন পালন করে গেছেন।

হযরত ছদর সাহেব (রহঃ)-এর ইল্‌মপ্রীতি সম্পর্কিত অবস্থা নিয়ে তিনি বলেন–

তাঁর ইল্‌মের গভীরতা ও প্রশস্ততার পরিমাপ করা আমার মত ক্ষুদ্রজনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁর ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে কোন দ্বৈত অবস্থার লেশমাত্র ছিল না, বরং তিনি কুরআনে পাকের এই আয়াত–

انما يخشى الله من عباده العلماء এর মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

কেননা কুরআন ও হাদীসের ভাষায় প্রকৃত আলেম তাকেই বলা হয়, যার ইল্‌ম ও আমল তথা বাস্তব জীবনের মধ্যে বৈপরিত্য নাই অর্থাৎ যার ইল্‌ম তার আমলকে প্রত্যাখ্যান করে না এবং তার আমল ইল্‌মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।

হযরতের আমলী জীবন এতই বৈচিত্রময় যে, তার জন্য একটি স্বতন্ত্র বইয়ের প্রয়োজন। তবে তাঁর কর্মজীবনের সর্বাধিক উজ্জল দিক হল ইল্‌মে দ্বীনের খেদমত। জীবদ্দশায় যেখানে যেখানে তাঁর পদচারণা হয়েছে আজ সেখানে একটি

মক্তব আকারে হলেও ইল্‌মে দ্বীনের খেদমত চালু রয়েছে। আর তিনি কথায় ও কাজে ইল্‌মে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতেন। কেননা কুরআন ও হাদীসের সঠিক ইল্‌মের উপরই সমস্ত আমলের বুনিয়াদ রচিত হয়। অথচ আজ প্রায় সর্বস্তরের মুসলমানদের নিকট ইলমে দ্বীনই সর্বাধিক উপেক্ষিত ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে আছে। আল্লাহ পাক এহেন গোমরাহী হতে আমাদেরকে নাজাত দান করুন।

হযরত ইল্‌মে দ্বীনের উপর (অতি বিনয়ের সঙ্গে) এতই গৌরব করতেন যে, সাত রাজার ধন পেয়েও সম্ভবত এত আনন্দিত কেউ হতে পারেনা। হযরত একবার বলেছিলেন- 'যখন আমরা "হিদায়াহ" কিতাব পড়তাম, তখন মনে হত যে, ব্যরিষ্টাররা আমাদের সামনে কি আর জানে।' হযরত কসম করে বলতেন- 'আল্লাহ তায়ালা ইলমে দ্বীনের ছিটাফুটা যা দান করেছেন, তার বিনিময়ে যদি কেউ আমার এক হাতে চাঁদ আর একহাতে সূর্য এনে দিয়ে বলে- আপনার ইল্‌ম আমাকে দিয়ে দিন, তবে খোদার কসম আমি কিছুতেই রাজী হব না।

অতুলনীয় বিনয়ী হওয়া সত্ত্বেও হযরত যখন ইলমে দ্বীনের কথা আলোচনা করতেন, তখন মনে হত গৌরবে যেন তাঁর বুকখানা ফুলে উঠছে।

হযরত ছদর সাহেব হুযূর (রহঃ)-এর উঁচু আখলাক সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বলেন-

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন- 'আমি ১০ বছর নবীয়ে করীম (সাঃ)-এর খেদমত করেছি, কিন্তু দীর্ঘ এই দশ বছরের মধ্যে কোন দিন তিনি আমাকে একথা বলেন নাই যে, এই কাজটা কেন করেছ বা কেন কর নাই।' এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর (সাঃ) এত বড় সহনশীল এবং মেহেরবান ছিলেন যে, অধীনস্থ লোকের দ্বারা তাদের কোন ভুলত্রুটির কারণে কোন কষ্ট পেলে তিনি কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। আখলাকে নবুওয়তের এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের হযরত মাওলানা শামছুল হক সাহেব ফরিদপুরী (রহঃ) নবী চরিত্রের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন।

দীর্ঘ দিন আমার অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, গোটা মাদরাসার মধ্যে হযরত আমাকে সর্বাধিক ভালবাসেন, কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমি জামেয়ার ছাত্র-ওস্তাদ যার সাথেই আলোচনা করেছি, তিনিও দেখি তার নিজের সম্পর্কে আমার মতই ধারণা পোষণ করেন যে, হযরত আমাকে অধিক ভালবাসেন। পাঠকবৃন্দ নিঃসন্দেহে ইহাও আখলাকে নবুওয়তের এক অনন্য দিক। যার এক বিরাট অংশ আল্লাহ পাক আমাদের হযরতকে দান করেছিলেন।

সমাপ্ত

সূচিপত্র

সূচিপত্র